বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 599. July, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৯ সংখ্যা। } আষাঢ়, ১৩২০। জুলাই, ১৯১৩ { ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

আমি কে?

১

কেবা আমি! কেন আমি এসেছি ধরায়?
ভাবি তাই মনে মনে, কি জানি কি প্রয়োজনে,
কোন মহা শক্তিমান্ পাঠা'লে হেথায়?
ভাবি সদা, কেন আমি এসেছি ধরায়।"

২

কেবা আমি? কে বলিবে? কা'রে বা সুধাই।
কি কার্য্য সাধনতরে, এই নর মূর্ত্তি ধ'রে,
কেন বা এখানে আসি কেনই বা ফিরে যাই?
কেন আসি কেন যাই, ভেবে নাহি পাই।

৩

আমার রহস্য কেবা বুঝাবে আমায়
এই যে সুন্দর দেহ, সবে যার করে স্নেহ,
অবশ হইলে কেহ নাহি ছোঁবে তায়,
অযতনে এই দেহ লুটা'বে ধূলায়।

৪

দু'দিনের খেলা আহা! দু'দিনে ফুরায়।
এত ভাল বাসাবাসি, এত যে আনন্দ হাসি
দুই দিন পরে কিছু না রহিবে হায়!
দু'দিন খেলিতে কেন এসেছি ধরায়?

৫

এক যাবে আর এক আসিবে আবার।
সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে, এই ভাবে এ জগতে
কালের কুটিল চক্র ঘুরে অনিবার
ভাবিয়া না পাই কিছু সার তত্ত্ব তা'র।

৬

কুসুম-কোমল এই শরীর আমার,
সূচির আঘাত হায়!' লাগিলে সহেনা তায়,

জ্বলন্ত অনলে পুড়ি' হ'বে ছারখার'
তখন বেদনা কোথা রহিবে তাহার ?"

৭

ভাবিতে ভাবিতে শুধু দিন চ'লে যায়।
মীমাংসা হ'লনা তা'র, কেবা আমি ?
কে আমার ?'
আসিয়াছি কোথা হ'তে যাইব কোথায়?"
'আমার স্বরূপ তত্ত্ব কে ক'বে আমায় ?"

৮

কেন আমি আসিলাম জগত মাঝার,
পাঠাইল কোন জন, সাধিতে কি প্রয়োজন,
কেমনে জানিব কিবা উদ্দেশ্য তাহার,
ঘুরিতে ঘুরিতে দিন গেল যে আমার"

৯

ব্রহ্মাণ্ডের পতি তুমি র'য়েছ কোথায় ?
ভেঙ্গে দাও মোহ ঘোর, দারুণ সন্দেহ
মোর,
দেখা'য়ে বুঝা'য়ে প্রভু দাও হে আমায়'
কে আমি, কোথায় যাব ? কেন এ
ধরায় ?"

শ্রীমতী হেমাঙ্গিণী ঘোষ।
বারুইপাড়া খুলনা

উদাসীনের চিন্তা।

(গল্প)

আমাদের বাড়ীতে এক সময়ে এক পাগল আসিয়াছিল। সে প্রকৃত পাগল কি না পাঠক পাঠিকা বুঝিয়া লইবেন, কিন্তু তাহার বাহিরের বেশ ও ব্যবহার ঠিক পাগলের মত। মাথায় আলুলায়িত কেশ, তাহাও তৈলাভাবে রুক্ষ। পরিধানে শত-ছিদ্র একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র। তাহার শরীরের দিকে বড় লক্ষ্য ছিল না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ধূলিতে পরিপূর্ণ। দৃষ্টির স্থিরতা নাই, চক্ষু দুইটি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কি দেখিতেছে, কি ভাবিতেছে। পাগলকে দেখিবামাত্র একটু দয়ার আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম ইহার কত দুঃখ, সংসারে একাকী বেড়াইতেছে, আত্মীয় স্বজনের প্রেমের আলিঙ্গন ও সহানুভূতি ইহার ভাগ্যে ঘটিতেছে না। সময় মত আহার মিলিতেছে না, শীতাতপ হইতে রক্ষিত হইবার একটা স্থান নাই, লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্রাভাব। ইহাকে দুইটি মিষ্টি কথা বলিয়া নিকটে ডাকে এমন লোক দেখি না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পাগলের নিকটস্থ হইয়া তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু পাগলের উত্তর শুনিয়া অবাক্ হইলাম। সে একটু হাসিয়া বলিল আমার নাম ত আমি জানি না। আমি বুঝিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম সে কেমন ? তোমার বাপ মা কি তোমার কোন নাম রাখেন নাই, কাহাকেও কি

the time being but for the future, bringing blessings upon posterity. But sin is barren.

কেবল ধর্ম্মই অত্যুৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করে। তাহার দ্বারা যে কেবল সেই সময়ের লোক উপকৃত হয় তাহা নহে, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ের লোকেরও প্রভূত উপকার সাধিত হয়। ইহা ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের উপরও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করে। কিন্তু পাপের দ্বারা কোন ফললাভ হয় না।

(৩) O, men of grace! He who sees his master's face will not in his prayer recall that he is chastised at all.

হে ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তিগণ, যে প্রভুর মুখ দেখিতে পায়, সে কিছুমাত্রও শাসিত হইতেছে এমন কথা প্রার্থনার সময় স্মরণ করিবে না।

(রাবেয়া)

(৪) Cast thy burden upon the Lord and he shall sustain thee.

প্রভুর উপর সকল ভার অর্পণ কর, তিনি তোমার ভরণ পোষণ করিবেন।

(৫) He satisfieth the longing soul.

তিনি আকাঙ্ক্ষিতের আশা পূর্ণ করেন।

(৬) সংত্যজ্য হৃদ্গৃহেশং দেবমন্যং প্রার্থয়ন্তি যে।

তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্তহস্তকৌস্তভাঃ॥

যাহারা হৃদয় গৃহের অধীশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার আশ্রয় লয়, তাহারা হস্তস্থিত কৌস্তভ মণি পরিত্যাগ করিয়া অন্য রত্ন লাভের ইচ্ছা করে।

(৭) Trust and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him.

বিশ্বাস করিয়া দেখ ঈশ্বর মঙ্গলময়। সেই ব্যক্তিই ধন্য, যে তাঁহাতে নির্ভর করে।

(৮) Examine all things, and hold fast to that which is good.

সব পরীক্ষা কর, যাহা ভাল তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণ কর।

(সেণ্ট পল)

Duty is devotion. Duty is salvation. Duty is our final rest in heaven.

কর্ত্তব্যসাধনই ভগবানের আরাধনা, কর্ত্তব্যসাধনই মুক্তির উপায়, এবং কর্ত্তব্যসাধনই পরলোকের একমাত্র বিশ্রামস্থল।

নবজাত ভ্রাতুষ্পুত্র। *

আমরা যে পিতৃহীনা
আমরা যে বড় "একা"
পুরাইতে সে অভাব
তুমি কি গো দিলে দেখা?

---

* স্নেহের ভ্রাতা শ্রীমান্ সুকুমারের নবকুমার।

২

অই নীলপদ্মনেত্র
যখন দেখিনু চেয়ে,
কি আশা ভরসা যেন
জাগিল পরাণ পেয়ে !

৩

না জানি কাহার পুণ্যে
দয়াল বিধির বরে,
তরুণ অরুণ আলো
উজলে আঁধার ঘরে !

৪

কে বুঝি করিলা তপ
স্বরগ মাণিক আশে,
তাই এলে যাদুমণি
সহসা এ গৃহবাসে ?

৫

এ ধন রাখিব কোথা
আমরা তা নাহি জানি,
সাধ হয় প্রাণে রাখি
চিরিয়া হৃদয়খানি।

৬

চাঁদের জ্যোছনা দিয়ে
গঠিত ও দেহটুক,
দ্বিতীয়ার শিশু শশী
আমরি ও সোণামুখ !

৭

অধম দরিদ্রে এ যে
বিধির অমূল্য দান,
হেরিলে ফিরে না আঁখি,
পরশে অবশ প্রাণ !

৮

এস এস প্রাণাধিক,
এস আঁধারের আলো,
মা বাপের কোল যুড়ি
নিত্য নব সুধা ঢালো।

৯

চির-জীবী চির-সুখী
হও বাছা দেববরে,
কুলের গৌরবরূপে
জাগ চির দিন তরে।

১০

স্বর্গ থেকে পিতামহ
সদা দিন শুভাশিষ,
তাঁর বংশে জন্ম তব
মনে রেখ অহর্নিশ।

১১

চাঁদমুখে চুমো দিয়ে
চাঁদটুকু বুকে তুলে,
আমরা যে পিতৃহীনা
আজি তা গিয়েছি ভুলে !

আশীর্ব্বাদিকা—পিসীমাগণ।

প্রাচীন আর্য্যমহিলাদিগের অঙ্গাভরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পত্রপাশ্যা ও ললাটিকা এই দুইটী ললাটভূষণের পর্য্যায়। (পত্র+পশ্+ঘণ্) পত্রাকারে বন্ধন করা হয় বলিয়া ইহার নাম পত্র-পাশ্যা। এই অলঙ্কার ললাটের পক্ষে অত্যধিক উপযুক্ত বলিয়া ইহার নাম ললাটিকা।

কর্ণিকা তালপত্রং স্যাৎ কুণ্ডলং কর্ণ-বেষ্টনম্।

কর্ণিকা ও তালপত্র এই দুইটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত কর্ণালঙ্কারবিশেষের একার্থবাচক পর্য্যায় শব্দ। কর্ণের অলঙ্কার বলিয়া (কর্ণ+কন্) ইহাকে কর্ণিকা এবং তালপত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে তালপত্র (তাড়পত্র) কহে। কর্ণ বেষ্টন অলঙ্কারের নাম কুণ্ডল, (কন্ড+কর্ত্তৃবাচ্যে কন্চ) কর্ণের শোভা দান করে বলিয়া ইহার নাম কুণ্ডল। অমর-কোষের টীকাকার মহেশ্বর পণ্ডিত বলেন, কর্ণিকা অলঙ্কার কেবল স্ত্রীলোকদিগের ধার্য্য এবং কুণ্ডলাভরণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই ধার্য্য। প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় এই জাতীয় অলঙ্কারকে টেঁড়ি বা ঢেঁড়ি কহে। বঙ্গদেশে এক্ষণে ঐ অলঙ্কারের প্রচলন প্রায় রহিত হইয়া আসিতেছে।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার কর্ণ-ভূষণের নাম পাওয়া যায়। পুষ্পাকৃতি কর্ণভূষণবিশেষকে কর্ণফুল কহে। উহা বর্ত্তমান সময়ের চাঁপা ঝুম্‌কা প্রভৃতি অলঙ্কারের সদৃশ। কর্ণের পৃষ্ঠদেশে কর্ণেন্দু নামক আর এক প্রকার আভরণ পূর্ব্বে ধার্য্য ছিল। বোধ হয় উহা বর্ত্তমান সময়ের ব্যবহৃত কাণপাতার সদৃশ হইবে। বাহিরের দুই দিকে মুক্তাপংক্তি, মধ্যে নলক ঝুলান এবং অনেক হীরকবিশিষ্ট কর্ণভূষণ বিশেষ বজ্রগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বোধ হয় উহা এখনকার চৌদানির অনুরূপ হইতে পারে।

গ্রৈবেয়কং কণ্ঠভূষা লম্বনং স্যাল্ললম্বিকা।
স্বর্ণৈঃ প্রালম্বিকাথোরঃসূত্রিকা মৌক্তিকৈঃ কৃতা॥

হারো মুক্তাবলী দেবচ্ছন্দোঽসৌ শতযষ্টিকা।
হারভেদা যষ্টিভেদা গুৎস গুৎসার্দ্ধগোস্তনা।
অর্দ্ধহারো মানবক একাবল্যেকযষ্টিকা।
সৈবনক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈঃ॥

কণ্ঠের ভূষণবিশেষকে গ্রৈবেয়ক বলে। গ্রীবাকে ভূষিত করে বলিয়া ইহার নাম গ্রৈবেয়ক। বোধ হয় এই গহনাকেই বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানে গুনিপাত কহে। লম্বমান কণ্ঠভূষণকে সাধারণতঃ লম্বন ও ললম্বিকা কহা যায়। ললম্বিকা স্থানে ললন্তিকা পাঠও কোন

কোন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। "আনাভিলম্বিকা ভূষা লম্বনঞ্চ ললন্তিকা" অর্থাৎ নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত কণ্ঠভূষণই লম্বন ও ললন্তিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ লম্বমান কণ্ঠভূষণ স্বুবর্ণনির্ম্মিত হইলে তাহাকে প্রালম্বিকা এবং মুক্তা-নির্ম্মিত হইলে তাহাকে উরঃসূত্রিকা বলে। হার ও মুক্তাবলী শব্দে মুক্তার মালা বুঝায়। ঐ হার শতযষ্টিকা অর্থাৎ শতগুণ বা এক-শত-লহর হইলে তাহাকে দেবচ্ছন্দ কহে। দেবগণ আদরপূর্ব্বক উহা পরিধান করেন বলিয়া উহার নাম দেবচ্ছন্দ। যষ্টির গুণের অর্থাৎ লহরের বা লতার ভেদানুসারে গুৎস, গুৎসার্দ্ধ, গোস্তন, অর্দ্ধহার, মানবক, একাবলী প্রভৃতি নাম ভেদ হয়। (গুধ্+কর্ত্তৃবাচ্যে স) গ্রীবা বেষ্টন করে বলিয়া গুৎস এই নাম হইয়াছে। কোন কোন পুস্তকে গুৎস ইহার পরিবর্ত্তে গুচ্ছ এইরূপ পাঠ আছে। উক্ত গুৎস বা গুচ্ছ বত্রিশ লতাযুক্ত। চব্বিশ লতাযুক্ত হারকে গুৎসার্দ্ধ কহে। যে হার দেখিতে গোস্তন সদৃশ এবং চারি লহরযুক্ত তাহাকে গোস্তন কহে। অর্দ্ধহার কত লহরযুক্ত ছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন "অর্দ্ধহারস্তু চতুঃষষ্টিসারমতঃ" অর্থাৎ চৌষট্টিগুণ হারকে অর্দ্ধহার কহে। কিন্তু অমরকোষের অন্য টীকাকার মহেশ্বর পণ্ডিত বলেন "দ্বাদশযষ্টিকোর্দ্ধহারঃ" অর্থাৎ বার লহরযুক্ত হার অর্দ্ধহার নামে খ্যাত। ঐ দুই মতের মধ্যে কোনটী প্রামাণিক তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা কঠিন। বিশ লহর যুক্ত হারের নাম মানবক। এক গুণ হারকে একাবলী কহে। সাতাইশটী মুক্তাহার দ্বারা গ্রথিত একাবলী হারকে নক্ষত্রমালা কহে।

উল্লিখিত প্রকারের লহরযুক্ত হার এক্ষণে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যেমন দুর্গা প্রতিমাকে থাকে থাকে রাঙ্গের মালা দিয়া সাজান হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকালে সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থগণের মহিলাদিগকেও ভূষিত করিবার জন্য বহু থাকে বিভক্ত মণিমাণিক্যখচিত মালা দেওয়া হইত। এতদ্ভিন্ন পুষ্প-নির্ম্মিত অনেক প্রকার মালা বিলাসী পুরুষ ও বিলাসিনী নারীদিগের ব্যবহার্য্য ছিল। প্রাচীন হিন্দু সম্রাট্‌দিগের সময়ে এরূপ অনেক থাকে বিভক্ত বহুমূল্য মালা ছিল, উহা নাভি পর্য্যন্ত বা পাদ পর্য্যন্ত লম্বমান থাকিত। উপরে যে কয়েকটী কণ্ঠ-ভূষণের উল্লেখ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার কণ্ঠভূষণ যে লহরের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ছিল না, এরূপ বলা যায় না। বোধ হয় সেগুলির পৃথক্ নাম ছিল না, নাম থাকিলেও আমরা সেই নাম সম্বন্ধে কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই।

আবাপকঃ পরিহার্য্যঃ কটকো বলয়স্ত্রিয়াম্।
কেয়ূরমঙ্গদং তুল্যো অঙ্গুলীয়কমূর্ম্মিকা।
সাক্ষরাঙ্গুলিমুদ্রা সা কঙ্কনং করভূষণম্॥

আবাবাপক পরিহার্য্য কটক ও বলয়

এই কয়েকটীতে প্রকোষ্ঠের (কফুরের অধোভাগের) আভরণ বুঝায়। হস্তে বপন করা যায় বলিয়া উহাকে আবাপক বলে। উহা হস্তে পরিধানের বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া সম্ভবতঃ উহাকে পরিহার্য্য বলে। হস্তকে সম্বরণ বা আচ্ছাদন করে বলিয়া উহাকে কটক বলা যায়।

কেয়ুর ও অঙ্গদ এই দুইটী বাহুভূষণ একার্থবাচক। কেয়ুরের লক্ষণ যথা—
সিংহবক্ত্রমুখাকারং নানারত্নবিনির্ম্মিতম্
সুসূক্ষ্মলম্বনং যুক্তং কেয়ুরং বাহুভূষণম্।

সিংহমুখাকৃতি নানারত্নবিনির্ম্মিত সুসূক্ষ্ম লম্বনযুক্ত বাহুভূষণকে কেয়ুর কহে। উহার হিন্দুস্থানী নাম বাহুবট বা বাজুবন্ধ। বাহুর উপরে থাকে বলিয়া উহার নাম কেয়ুর।

অঙ্গুলীয়ক ও উর্ম্মিকা শব্দে অঙ্গুলির ভূষণ বুঝায়, ইহাকে প্রচলিত ভাষায় অঙ্গুরী, আংটী ও আঙ্গুট বলে। অক্ষর-যুক্ত অর্থাৎ নাম-খোদা-অঙ্গুরীকে অঙ্গুলি-মুদ্রা কহে।

কঙ্কন একপ্রকার করভূষণ। কং অর্থাৎ সুখের নিমিত্ত শব্দ করে বলিয়া উহাকে কঙ্কন (কং+কন্+অচ্) কহে। ঐ অলঙ্কারের ঝন্ ঝন্ শব্দ শ্রবণকারীদিগের নিকটে ভাল লাগে বলিয়া শব্দবিৎ পণ্ডিতগণ উহার ঐ নাম রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কঙ্কন অলঙ্কারের প্রচলন ছিল, আমরাও প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের আমলের ঐ আভরণ দেখিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশীয় মহিলাদিগের মধ্যে ঐ অলঙ্কারের প্রচলন নাই। কিন্তু হিন্দুস্থানের অনেক প্রদেশে কঙ্কণের বিশেষরূপ প্রচলন আছে।

স্ত্রীকোট্যাং মেখলা কাঞ্চী সপ্তকী রসনা তথা।
ক্লীবে সারসনং চাথ পুংস্কোট্যাং শৃঙ্খলং ত্রিষু॥

মেখলা, কাঞ্চী, সপ্তকী, রসনা ও সারসন এই পাঁচটী শব্দে স্ত্রীলোকদিগের কোটীভূষণবিশেষ বুঝায়। (মি+খল্) মাজায় উহা ক্ষেপণ করা যায় বা রাখা যায় বলিয়া উহাকে মেখলা কহে। "মেখলাত্বষ্টযষ্টিকা" আট লহরযুক্ত কাঞ্চীকে মেখলা কহে। বোধ হয় উহা বর্ত্তমান সময়ের কোমরপাট্টা বা চন্দ্রহার বিশেষের সদৃশ ছিল। (কঞ্চ্+ই) অত্যন্ত দীপ্তি পায় বলিয়া ইহাকে কাঞ্চি বলে। "একযষ্টি ভবেৎ কাঞ্চী" একগুণ কোটী-ভূষণবিশেষকে কাঞ্চী (কাঞ্চি) বলে। ইহাকে অনেকে বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত গোট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "বিংশতিঃ সপ্তকী জ্ঞেয়া" বিশলহরযুক্ত কোটীভূষণকে সপ্তকী কহে। (রস্+কর্ত্তৃবাচ্যে ন) শব্দ করে বলিয়া রসনা কহে। "রসনাষোড়শ জ্ঞেয়া" ষোললহরযুক্ত কাঞ্চীকে আভিধানিকেরা রসনা বলেন। ইহার নামান্তর সারসন। আরসনের অর্থাৎ শব্দের সহিত বর্ত্তমান এই সমাসে সারসন হইয়াছে। পুরুষের কোটী-আভরণকে শৃঙ্খল বলে। উহা দেখিতে শৃঙ্খল বা শিকলের ন্যায়। উড়িষ্যা ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি কোন কোন

পুরুষ উক্ত আভরণ ধারণ করিয়া থাকেন।

এতদ্ভিন্ন আরও দুই একটি কোটীভূষণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। "কলাপঃ পঞ্চবিংশকাঃ" পঞ্চবিংশতি লহরযুক্ত কোটীভূষণকে কলাপ কহে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন কাব্যে কাঞ্চীদামের নাম দেখা যায়। উহা সুবর্ণাদিরচিত ও শব্দায়মান ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাদাঙ্গদং তুলাকোটিঃ মঞ্জীরোনূপুরোঽস্ত্রিয়াম্।
হংসকঃ পাদকটকঃ কিঙ্কিণী ক্ষুদ্রঘণ্টিকা॥

পাদাঙ্গদ, তুলাকোটী, মঞ্জীর, নূপুর, হংসক ও পাদকটক এই কয়েকটী পাদভূষণ। তন্মধ্যে পাদাঙ্গদ ও পাদকটক এই দুইটী আভরণের শব্দ হয় না, অন্য গুলির শব্দ হয়। উক্ত চরণালঙ্কারদ্বয়কেই হয়ত বাঙ্গালা ভাষায় খেড়ো (খাড়ুয়া) ও মল্ কহে। কেহ কেহ বলেন, হংসকেরও শব্দ হয় না। হস্তে যেমন অঙ্গদ নামক আভরণ ধারণ করা হইত, তেমনি পাদদেশে অনেকটা ঐ আকারের আভরণ পরিধান করা হইত বলিয়া উহার নাম পাদাঙ্গদ ছিল। (মঞ্জ্+ইর) চরণকে মুঞ্জ (মঞ্জ) অর্থাৎ মনোহর করে বলিয়া উহার নাম মঞ্জীর। ন্যূনতা পূরণ করে বলিয়া ইহার নাম নূপুর। নূপুরের ঐরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইবার কারণ ঠিক বলা যায় না। শরীরের সর্ব্ববিধ অলঙ্কার থাকিলেও যদি পায়ে নূপুর না থাকে তাহা হইলে ভাল হয় না, এই অভিপ্রায়ও উক্তবিধ ব্যুৎপত্তির কারণ হইতে পারে। যাঁহারা বলেন হংসকনামক পাদাভরণের শব্দ হয়, তাঁহারা হংসকশব্দের এইরূপ অর্থ করেন যে, হংসের ন্যায় শব্দ করে বলিয়া ইহার নাম (হংস+কৈ+ক) হংসক। যাঁহাদের মতে হংসকের শব্দ হয় না তাঁহারা বলেন রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত হয় বলিয়া ঐ আভরণ দেখিতে রাজহংসের বা শ্বেত হংসের ন্যায় শুভ্র, এই জন্য উহার নাম হংসক। অমরকোষের টীকাকার মহেশ্বর পণ্ডিত বলেন, উহার প্রচলিত নাম পৈজন। উহাই হয়ত স্থানবিশেষে পাইজোড় নামে প্রসিদ্ধ। কিঙ্কিণী ও ক্ষুদ্রঘণ্টিকাকে চলিত ভাষায় ঘাগর, ঘুংরা ও ঘুংঘুর প্রভৃতি কহে। উহা কুৎসিৎ অর্থাৎ অল্প ও অনতি-উচ্চ শব্দ করে বলিয়া উহার নাম (কিম্+কণ্+ইন্) কিঙ্কিণী। উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হয় বলিয়া উহার নাম ক্ষুদ্রঘণ্টিকা।

কাব্য পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠে বোধ হয় সমস্ত পাদাভরণের মধ্যে নূপুরই অধিক আদরণীয় ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনানুসারে বঙ্গদেশীয় মহিলাদিগের মধ্যে হস্তে কঙ্কণাভরণের ব্যবহার অপ্রচলনের ন্যায় পাদেও নূপুরাভরণের ব্যবহার অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের নিকটে

শুনিয়াছি, তাঁহাদের সময়েও নূপুরের বেশ প্রচলন ছিল। হিন্দুস্থানের অন্তর্গত অন্যান্য অনেক স্থলে পূর্ণভাবেই নূপুরের ব্যবহার আছে। যদি বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন যাত্রাদির দলে নূপুর না থাকিত, তাহা হইলে পূর্ব্বে নূপুরের আকৃতি কিরূপ ছিল, তাহাই আমরা জানিতে পারিতাম না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কালিপুরাণে লিখিত নিয়মানুসারে পায়ে সোণার গহনা ধারণ করিতে নাই। অতি প্রাচীন কালে সকলেই এই নিয়ম পালিয়া চলিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেক প্রদেশেই লোকে পাদদেশে স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করা দোষ বলিয়া বিবেচনা করেনা। হয়ত মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণে ভারতবর্ষের অন্তর্গত মাড়বার প্রভৃতি স্থানে পায়ে স্বর্ণালঙ্কার ধারণের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

এই প্রবন্ধে যে যে অঙ্গাভরণের নাম সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, সে গুলির অধিকাংশই স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গাভরণ। মুকুট, অঙ্গদ, কুণ্ডল, শৃঙ্খল প্রভৃতি কয়েকটী মাত্র অঙ্গাভরণ পুরুষের ধার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূপতিদিগের বেশভূষা বর্ণনা উপলক্ষে উক্ত প্রকার কয়েকটী ভূষণের নাম পাওয়া যায়। তাহাতে বোধ হয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহৃত কতিপয় আভরণ কিছু কিছু রূপান্তরিত ও নামান্তরিত হইয়া পুরুষদিগের ধার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

প্রাচীন আর্য্যমহিলাদিগের আভরণের মধ্যে নাসিকায় ধারণ করিবার কোন আভরণের নাম আমরা এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। যদি প্রকৃতই পুরাকালে কোন নাসিকাভরণের ব্যবহার না রহিল, তবে কোন্ সময় হইতে এ দেশে উহা প্রচলিত হইল, তাহা বলা কঠিন। নাকে ছিদ্র করিয়া বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে আভরণ ধারণের রীতি আছে, তাহা হয়ত মুসলমানদিগের সময় হইতে অথবা মুসলমান রাজত্বের কিছু পূর্ব্ব হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম, কাব্যতীর্থ
ও পুরাণতীর্থ।

চোখের ভাষা।

তখন গ্রীষ্মকাল। অপরাহ্ণের অন্ধকার চারি দিকে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তখনও উত্তাপের হ্রাস হয় নাই। দিল্লীনগরীর প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহগুলি তখনও তীব্র তাপ বিকীর্ণ করিতেছে। সম্মুখের পথ হইতে তখনও তপ্ত বায়ুতাড়িত ধূলিকণা পথচারী পথিকের দেহ দগ্ধ করিতেছে।

সন্ধ্যার বিলম্ব নাই দেখিয়া লাবণ্যবালা হস্তস্থিত পুস্তকখানি টেবিলের উপর

রাখিয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। সমস্ত গৃহটা ধূলার আবরণে যেন ঢাকিয়া রহিয়াছে। মেজে ত ধূলিতে পরিপূর্ণ, টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারী প্রভৃতি কিছুই বাদ নাই। ঝাঁটা লইয়া লাবণ্য তাড়াতাড়ি ধূলির সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই বালিকা বিরক্ত হইয়া উঠিল। সম্মার্জ্জনী বার বার তাহার কোমল হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। গৃহকাজ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। একটা অজানা ভাবনা তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বালিকার বড় অপরাধ ছিল না। গৃহকর্ম্মে সে একেবারেই অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ। এ পর্য্যন্ত তাহাদের সংসারে পরিচারিকার অভাব ছিল না। বিশেষতঃ তাহার পিতা সাহেবী ধরণের লোক এবং ঘোর সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তিনি কন্যাকে শৈশব-কাল হইতেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া-ছিলেন। তাহার বাল্যকাল স্কুলে ও গৃহে শিক্ষকের নিকটেই অতিবাহিত হইয়া-ছিল। গৃহকাজ শিখিবার তাহার অবসর, অভিলাষ বা অনুমতি ছিল না।

কিন্তু চিরদিন অবস্থা কাহারও সমান যায় না। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইল। পিতার ব্যবসায় ফেল হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। ঋণের দায়ে তাঁহার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি, এমন কি বসতবাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গেল।

কৃতান্ত তাঁহাকে সমুদায় ভাবনা ও চিন্তা হইতে মুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু দারিদ্র্য তাঁহার পুত্র কন্যাকে ছাড়িল না। যতীন ও লাবণ্যবালা দুঃখের ভাবনায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। দাসদাসীদের বিদায় দিয়া তাহারা এক ভগ্ন কুটীরে কোন প্রকারে দিন কাটাইতে লাগিল।

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পিতার সময় হইতেই দূরসম্পর্কীয়া এক পিসি-ঠাকুরাণী তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন। লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার বরাবরই ঘনিষ্ঠতা, সুতরাং এ পরিবর্ত্তন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সময়ে অসময়ে আধুনিক দুর-বস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেন, ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার আক্ষেপ বিলাপের জ্বালায় লাবণ্য নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। অধুনা পিসি-মাতার একান্ত অভিলাষ যে, লাবণ্যবালা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া তাহাদের এ দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পায়। যতীনের উন্নতির আশা তিনি একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ ঝন্‌ঝন্ শব্দে শয়নকক্ষটী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পিসিমা ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, মূল্যবান্ আয়নাখানি লাবণ্যের হস্তচ্যুত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

"লাবণ্য কি করলি রে? এমন আর্শি কি আর পাবি? সে কাল কি আর আছে বাছা, যে একখানা ভেঙ্গে গেলে আর একখানা নূতন আসবে?"

লাবণ্য নীরবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভৎসনা বৃথা বুঝিয়া লাবণ্যের পিসিমাতা অন্য কথা পাড়িলেন, "হাঁরে, যোগেশ বাবু এখন আর আসেন না কেন? আগে ত তিনি রোজই এ বাড়ীতে আস্‌তেন। ক'র না বাপু, তাঁকেই বে' ক'র না। তোদের এ অবস্থা দেখ্‌লে যে বুক ফেটে যায়।"

এমন সময় যতীন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি, পিসিমা! সেই যোগেশ বাবুর কথা! আমি ত অনেক দিন বলেছি, যোগেশ বাবুর সঙ্গে লাবণ্যের বে' হ'তে পারে না। তিনিই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছেন।"

"কেন রে, তিনি তোদের সর্ব্বনাশ কর্‌লেন কি ক'রে? বরং তোর বাপ্‌কে টাকা ধার দিয়ে যোগেশ বাবু তোদের উপকারই করেছেন।"

"বটে, তিনিই আমাদের ফাঁকি দিয়ে এখন আমাদের বাড়ীটি ভোগ কর্‌ছেন।"

"সে কি কথা রে? তোদের বিষয়-আশয় সব বিক্রী হ'য়ে গেল, যোগেশ বাবু তাই বাড়ীটা কিনে নিলেন। তোদের কি ও বাড়ী থাকৃত? যোগেশ বাবু না নিলে অন্য কেহ নি'তই নিত, তখন কি হ'ত ব'ল্ দেখি? এখন যদি কেবল তোরা মত করিস্, তবে লাবণ্যের বাড়ী লাবণ্য আবার ফিরিয়ে পায়।"

লাবণ্যের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তর্ক নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া যতীন বাহিরে চলিয়া গেল। পিসিমাতা বলিতে লাগিলেন, "আহা! যোগেশ বাবু আমার কাছে তোর কত সুখ্যাতি কর্‌তেন। তাঁকে বে' কর্‌তে তোরা অমত কর্‌ছিস্ কেন?"

লাবণ্য এবার বলিল "পিসিমা; তুমি আমাকে বিক্রী করিবে না কি?"

পিসিমাতা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোদের যেমন কথা! রূপে, গুণে, ধনে, বিদ্যায় যোগেশ বাবু কিসে কম? এমন বর পাওয়া তোর ভাগ্যের কথা।"

লাবণ্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। গৃহ-কর্ম্ম তাহার আর ভাল লাগিল না। অধীর হইয়া সে বারান্দায় পাদচারণা করিতে লাগিল। তখন বায়ুর লেশমাত্র ছিল না, গাছের পাতাগুলি স্থির নিস্তব্ধ হইয়া যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই বায়ুহীন, সঙ্গিহীন, নীরব সন্ধ্যা বালিকাকে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিল। পিতার সেই সুন্দর রাজপ্রাসাদ সদৃশ অট্টালিকা, সেই প্রশস্ত পুষ্পসমন্বিত উদ্যান, সেই শ্যামশষ্পমণ্ডিত বিস্তৃত প্রান্তর, সেই স্নিগ্ধ-বায়ু-কম্পিত বটবৃক্ষ, তাহার মনে পড়িল। হায়! ইহা অন্যের ভোগ্য, এখন যোগেশ বাবু সেই প্রশস্ত বৃক্ষতলে সুশীতল সমীরণ উপভোগ করিতেছেন! হঠাৎ একটা প্রশ্ন তাহার মনে আসিল 'সত্যই কি যোগেশ বাবু আমাকে ভালবাসেন?'

'কখনই নয়। তাহা হইলে তিনি কি আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেন, না আমাদের বাড়ী কাড়িয়া লইতেন? আর কেনই বা তিনি আমাকে ভালবাসিবেন? কত রূপবতী ধনিকন্যা তাঁহার জন্য লালায়িত

আমি কে? আর আমিই বা আমার শত্রুকে বিবাহ করিব কেন? আমরা গরীব বটে, কিন্তু অর্থের প্রত্যাশী নই?'

ভাবিতে ভাবিতে বালিকা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। সহসা লাবণ্য দেখিল, অদূরে রাজপথে যোগেশ বাবু আসিতেছেন। তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। লজ্জায় ও ঘৃণায় লাবণ্য ছুটিয়া পলাইল।

যোগেশ বাবু ধীরে ধীরে তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। পিসিমাতা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

পিসিমা! আপনারা এই বাড়ীতেই আছেন? আমি কত খুঁজেছি, কিন্তু আপনাদের কোন সন্ধান পাই নি'। যতীন লাবণ্য সব কোথায়?"

"যতীন বেড়াতে গেছে। আমি লাবণ্যকে ডাক্‌ছি।"

যতক্ষণ সম্ভব লাবণ্য বিলম্ব করিল। কিন্তু যখন পিসিমার ঘন ঘন চীৎকারে ভগ্ন গৃহটী কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন আর লাবণ্য অধিক বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল না। আপনাকে সমাহিত করিয়া লাবণ্য বসিবার গৃহে প্রবেশ করিল।

লাবণ্য আসিলে যোগেশ বাবু সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। লাবণ্য করস্পর্শ না করিয়া কেবলমাত্র গ্রীবা অবনত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

মর্ম্মাহত হইয়া যোগেশ বাবু বলিলেন, "আপনি কি আজ আমার সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ডও করিবেন না?"

উপায়ান্তর নাই দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাবণ্য হস্ত প্রসারণ করিয়া যোগেশ বাবুর সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করিল। অবসর বুঝিয়া পিসিমা সরিয়া পড়িলেন।

"আপনি আমার উপর রাগ ক'রেছেন কেন? আমি কি কিছু দোষ ক'রেছি?" যোগেশ বাবু শুনিয়াছিলেন যে, ভ্রাতা ও ভগ্নী উভয়েই তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের রাগের কারণ তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

লাবণ্য কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখে হাসি আসিল না। অগত্যা বেচারাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

"আমি অনেক দূর হইতে আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি। অনেক দিন ধরে আপনাদের সন্ধান ক'রেছি। কেন আপনি আমার উপর বিরক্ত হ'লেন?"

লাবণ্য প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার সজীবতার বড় লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। কেবলমাত্র তাহার বিস্ফারিত আরক্ত লোচন হইতে বিদ্যুদগ্নি বিস্ফুরিত হইতেছিল। সংশয়ে ও আবেগে বালিকার অন্তর কাঁপিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, যোগেশ বাবুর ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ের কপটতা অনেক দিন প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। তাহারা দরিদ্র বলিয়া আজ তিনি অসহায় দীন বালিকাকে কি পরিহাস করিতে আসিয়াছেন? এই দারুণ

কল্পনা তাহাকে প্রস্তরমূর্ত্তির মতই বিবর্ণ করিয়া তুলিল।

"আমি কি হিংস্র পশু? কেন আপনি আমাকে অমন করে দেখ্ছেন? আমাকে যদি আপনার এতই মন্দ মনে হয়, তবে আমি এখনই যাচ্ছি। কেবল বলুন, আপনি আমার উপর রাগ করিলেন কেন?"

লাবণ্য তথাপি নীরব, বাক্যহীন। কম্পিত-কণ্ঠে যোগেশ বাবু বলিতে লাগিলেন, "আপনার আশায় আমি এত-দিন এখানে আছি। আপনাদের বাড়ীতে আপনি থাক্‌বেন বলেই আমি বাড়ীটা কিনে রেখেছি। মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন সেই শূন্য বাড়ীটা আপনাদের জন্য আকুল হ'য়ে কাঁদ্‌চে?"

লাবণ্য আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না। সে বলিল "আমরা গরীব বটে, কিন্তু আমরা লোভী নই। আপনি কি মনে করেন, বাড়ীর জন্য, টাকার জন্য, আমি আপনাকে বিবাহ করিব? আমাকে কি আপনি এতই নীচ, তুচ্ছ মনে করেন? আপনাকে আমি ভাল বাসিতে পারিব না। সুতরাং বিবাহ অসম্ভব।" তীব্র উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

"আপনারা গর্ব্বিত, সে আমি বেশ্ জানি। কিন্তু আশা করিয়াছিলাম, আপনারা অবুঝ নন। যাক্ সে কথা। আজ আপনার নিকট শেষ বিদায় লইয়া চলিয়া যাইব।"

বারিবর্ষণের পর মেঘ যেমন অনেকটা লঘু হইয়া আসে, হৃদয়ের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া লাবণ্য সেইরূপ অনেকটা শান্ত হইল। ধীরে ধীরে কহিল, "কেন, আপনি এখান থেকে যাচ্চেন না কি?"

"আমি সুন্দরবনে যাচ্চি। আমরা ক'জন বন্ধু মিলে সুন্দরবনে বসবাস কর্‌ব, ঠিক করেছি।"

"সত্যি? কিন্তু শুনেছি সে বনে বড় ম্যালেরিয়া। অনেক হিংস্রজন্তুও সেখানে আছে।"

"হাঁ, এর মধ্যেই আমার বন্ধুর দুইজন লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে।"

"তবে, হঠাৎ আপনারা সেখানে যাচ্চেন কেন?"

"দেখি যদি আমরা সে দেশের উন্নতি কর্‌তে পারি। আর যদি এ চেষ্টায় আমাদের জীবন যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি?"

কেন, এখানেই ত আপনাদের অনেক কাজ আছে। দূরদেশে গিয়া আপনাদের মূল্যবান্ জীবন বিপদগ্রস্ত করবেন কেন?"

বিপদ! বিপদ ত আমা দের আমোদ। একটা ত কিছু চাই?"

"আপনাদের অভাব কি?"

"অভাব—কি নাই বলুন। সে যা'ক, তাহ'লে আপনি সুখে থাক্‌বেন। আপনাকে আর আমি বিরক্ত কর্‌ব না। আর আমার ফিরিবার আশা করবেন না।" তাঁহার স্বরে আবেগের আভাস ছিল।

লাবণ্যের মনে আবার সেই সমস্যা ঘুরিয়া আসিল। যোগেশ বাবু কি যথার্থই আমাকে ভালবাসেন? তিনি কেন সহসা স্বদেশ, আত্মীয়, পরিজন পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসনে যাইতেছেন? কেন তাঁহার সুখময় জীবনকে তুচ্ছ করিয়া তিনি বিপদকে বরণ করিতেছেন? এতটা আত্মত্যাগ কি কেহ কখন বিনা কারণে করিতে পারে?

তাহার মনে হইল, হয় ত সে যোগেশ বাবুকে ভুল বুঝেছে! যদি সত্যই তাঁহার কথার ভিত্তি না থাকে, তবে তিনি তাহার সন্ধানে এ বাড়ীতে আসিবেন কেন, এমন করে তাহার স্তবস্তুতিই বা করিবেন কেন? যোগেশ বাবুর প্রতি তাহার বিশ্বাস অনেকটা ফিরিয়া আসিল। তাহার অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক হইল। সে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "আপনারা কবে যাবেন? আবার ফিরিবেনই বা কবে?"

"ফিরিবার বড় আশা নাই। আমার জন্য আপনার কি কোন কষ্ট হবে?"

কষ্ট যে তাহার হইবে না, এ কথা বলিতে লাবণ্যের এবার বাধিয়া গেল, সে নিরুত্তর রহিল।

কুহেলিকাচ্ছন্ন সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিক সূর্য্যের প্রথম রশ্মি দেখিলে যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, ব্যর্থ-মনোরথ যোগেশ বাবু লাবণ্যের সেই লজ্জাবনত মুখ দেখিয়া তেমনি প্রফুল্ল হইলেন।

"আমি চ'লে গেলে ত আপনার সুবিধাই হবে। আপনাকে আর বার বার বিরক্ত করিতে আস্‌ব না।"

"না, না, আপনি মিছামিছি দেশত্যাগী হবেন কেন?"

"এখানে থেকেই বা কি কর্‌ব বলুন? এ ব্যর্থ জীবন কেমন করে কাটাব।"

লাবণ্য কোন কথা কহিল না। যোগেশ বাবু বলিতে লাগিলেন, "আপনি যদি আশা দেন, আপনি যদি আমাকে সুখী করেন, তবেই আমি এখানে থাকি।"

লাবণ্য পূর্ব্ববৎ বাক্যহীন। যোগেশ বাবু সাহসে ভর করিয়া লাবণ্যের হাতখানি ধরিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন, "কি বলুন?" লাবণ্য অস্ফুটস্বরে কি বলিল তাহা বড় কিছু বুঝা গেল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের ভাব যোগেশ বাবুর নিকট অবিদিত রহিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "তাই ত আমার বন্ধুকে আমি কথা দিয়েছি। আমি ভাব্‌ছি, সে যদি আমাকে না ছাড়ে, তবে আমাকে সুন্দরবনে ত যেতেই হবে।"

লাবণ্য এতক্ষণে ধরা দিল। বলিল, "কোন রকমে কি এ দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না?"

"আপনি যদি বলেন ত তাকে এখনি টেলিগ্রাম করে দিই।"

"বেশ্‌ ত, তাই করুন না।"

যোগেশ বাবু হাসিয়া কহিলেন "কিন্তু আমার পুরস্কার চাই।" (ক্রমশঃ)

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।

দুই বৎসর পূর্ণ হইল ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। এই দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় স্ত্রী-মহামণ্ডলের মেম্বরগণের অনেক নূতন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হইয়াছে। আমাদের দেশের অন্তঃপুর-বাসিনীদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক শুধু তাহা নহে, উহা এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকালকার স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বকার নারীদের অনেক-গুলি গুণ হারাইয়াছেন, আর এখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষারও সারটুকু ধরিতে পারেন নাই। কাজেই অজ্ঞতা, বিশৃঙ্খলা, সময়ের অপব্যবহার প্রভৃতি দোষ আসিয়া অনেক সংসারে ঘোর প্রমাদ ঘটায়। আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে যেরূপ শিক্ষার উন্নতি ও সুযোগ হইয়াছে, মেয়েদের মধ্যে সেইরূপ না হওয়াতে উভয়ে একত্র সংসারপথে চলিবার সময় পরস্পরের সঙ্গে সেরূপ সামঞ্জস্য বা মিল হয় না। আমাদের অনেক উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহারা নিজ নিজ স্ত্রীকে কেবল সন্তানের ধাত্রী (nurse) স্বরূপ ভাবিয়া থাকেন—তাঁহাদের সঙ্গে না কোন একটা সাধারণ বিষয়ের কথা, না একটা জ্ঞানের কথা বলিয়া সুখ পান। এটা কি আমাদের ভাবিবার ও মাথা হেঁট করিবার কথা নহে? বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে যুবকদের মনে অনেক নূতন ভাব আসিয়াছে, নিজ নিজ স্ত্রীকে পুরাকালের ন্যায় যথার্থ সহধর্ম্মিণী করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতরূপে শিক্ষিতা স্ত্রী না পাইলে তাহাদের সে বাসনা পূর্ণ হইবার আশা কোথায়?

ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের স্থাপয়িত্রী শ্রীমতী সরলা দেবী বর্ত্তমান কালের এই সমস্যার কিরূপে মীমাংসা করিবেন, বহুদিন ধরিয়া তাহা চিন্তা করিয়া এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতি এখন বাড়ীতে বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রী পাঠাইয়া বিবাহিতা মেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই সুযোগ পাইয়া কন্যা ও বধূদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। কলিকাতার সর্ব্বত্রই এই স্ত্রী-মহা-মণ্ডলের শিক্ষয়িত্রীগণ পড়াইতেছেন। বৎসর বৎসর এই সমিতির কার্য্যক্ষেত্রের কিরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত বার্ষিক রিপোর্ট পড়িলে পাঠকপাঠিকাগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন।

বিগত ১২ই জানুয়ারী এই সমিতির কলিকাতাস্থ শাখার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মহিলারা সভায় উপস্থিত

ছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩০০ শত জন মেম্বর ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে স্থানীয় সেক্রেটরী কর্ত্তৃক ১৯১২ সালের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পঠিত হয়, উহার মর্ম্ম এই—যদিও এখনও সমিতির অঙ্কুর অবস্থা মাত্র তথাপি ইহা গত বৎসর সুচারুরূপে অন্তঃপুর-শিক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছে। প্রথম বৎসর ২১৯৪ টাকা আয় হইয়াছিল, কিন্তু বিগত বৎসর ৬৫০১৲ টাকা আয় হইয়াছে। প্রথম বৎসর সমিতির ২৮৪২৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, গত বৎসর ৭৩৭৯৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সমিতি আট শতাধিক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসর আয় প্রায় তিন গুণ হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, সমিতি স্বীয় কার্য্যকলাপে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার সভাসংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসরের মধ্যে প্রায় ১২৫ জন ছাত্রীকে ২২ জন শিক্ষয়িত্রী দ্বারা অন্তঃপুরে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। বৎসরান্তে যাহাতে নিয়মিতরূপে ছাত্রীগণকে পরীক্ষা করা হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাঁহারা সমিতির সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে কোন প্রকার সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সেক্রেটারী রিপোর্ট সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য অন্তঃপুর-শিক্ষার ন্যায় বালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষাও যে অতি প্রয়োজনীয়, তাহা সমিতির মেম্বরগণের উপলব্ধি হওয়ায় ছোট ছোট মেয়েদের জন্য 'স্ত্রী-মহামণ্ডল বালিকা-বিদ্যালয়' নামে একটী স্কুল খোলা হইয়াছে। ইহা ১৪নং শ্রীনাথ দাসের লেনে স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির কয়েকজন সভ্য টেবিল, ঘড়ী, বোর্ড, মানচিত্র, বাক্স প্রভৃতি স্কুলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি দান করিয়াছেন। একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার পূজার দালানে স্থান ও চেয়ার বেঞ্চ প্রভৃতি দিয়া স্কুল স্থাপনের সাহায্য করেন। এক বৎসরে ৬০টী বালিকা ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাদের বয়স ৪ হইতে ১০ পর্য্যন্ত। সকল ছাত্রীকে উৎসাহ দিবার জন্য এ বৎসর প্রত্যেককেই পুরস্কার বা উপহার দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ২টী বালিকা ২টী রৌপ্য-পদক পাইয়াছে। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সমিতির কতিপয় মেম্বর প্রাইজের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। মহোদয়া সেক্রেটারী স্কুলের রিপোর্ট পাঠ করিবার পর কতকগুলি ছোট ছোট বালিকা গীতাভিনয় করিল, তাহা দেখিয়া সভাস্থ সকলে অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীমতী সরলা দেবী একটী সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন এদেশীয় স্ত্রীজাতির মধ্যে যে একটা কাজ করিবার উৎসাহ জন্মিয়াছে, ইহার সুফল এই স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্য্য এত দ্রুত বিস্তার দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। ইনি

সমিতির দ্বারা আহূত হইয়া অল্প দিনের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। সভানেত্রী মহাশয়া পারিতোষিক বিতরণ করিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার ভার পুরুষদের উপরই ন্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন স্ত্রীজাতি যে নিজেদের শিক্ষার ভার নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন ও ইহার যে এত শীঘ্র এরূপ উন্নতি হইয়াছে, ইহা আমাদের দেশের ও নারীজাতির অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের স্বাস্থ্যলাভ—শুনা যাইতেছে, ডেরাডুনের জলবায়ুর গুণে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। এ সংবাদে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। ভগবান্ অচিরে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করুন।

ছোট লাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার বাহাদুরের পরলোক গমন—বিগত ২৮শে মার্চ্চ আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী চেল্টেনহাম নগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পশ্চিম বঙ্গের ছোট লাটের কার্য্য গ্রহণ করেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশ ও সম্মান প্রদর্শনার্থ বাঙ্গালার অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি বন্ধ করা হইয়াছিল।

কারাগারে রোগীর ব্যবস্থা—মিঃ ম্যাকেন্না এক নূতন বিধানের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কারাবরুদ্ধ কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে তাহাকে প্রয়োজন মত নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুক্তি দেওয়া আবশ্যক। এই বিধান মঞ্জুর হইলে কয়েদিদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার্থ দান—কানপুরের পরলোকগত সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জানকী বাই কানপুরে একটী প্রথম শ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এরূপ সৎকার্য্যে সম্পত্তি দান অতীব প্রশংসনীয়।

সম্রাটের কৃষিকার্য্যে আগ্রহ প্রকাশ—শুনা যাইতেছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতি ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া একটী ভূমি ক্রয় করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আবাদ করিবার ব্যবস্থা

করিতেছেন। বঙ্গের জমীদারবৃন্দ সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের এই সংকার্য্যের অনুকরণ করিলে ভারতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে দান—শুনা যাইতেছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিবেন।

সন্ধি—তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ সন্ধি করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনের দেহত্যাগ—আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ১৯শে চৈত্র সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় তিনি ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যান। সহসা একখানি বেঞ্চে বসিয়া ঢলিয়া পড়েন, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। এরূপ মৃত্যু অতি শোচনীয়। ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান ও পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন।

নববর্ষের নিবেদন

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন বামাবোধিনী প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ইহার স্বর্গীয় প্রবর্ত্তককে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা এবং উপকারিতা বিষয়ে কত কথাই লিখিতে হইয়াছিল! আজিকার দিন এবং সেই দিনে কত প্রভেদ! সুশিক্ষিত লোকদিগের মুখে এখন আর স্ত্রীশিক্ষার প্রতিকূলে বড় অধিক কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না। অতি অল্পমাত্র-শিক্ষিত ব্যক্তিরাও আপনাদের স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতিকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। যে অন্তঃপুর-চারিণীগণ আমাদের ভক্তি, স্নেহ, আদর প্রভৃতির পাত্রী, তাঁহারা শিক্ষিতা না হইলে আমরা নিজেরাই অসুবিধায় পড়ি, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে না পারিলে আমরা এখন লজ্জিত হই এবং যেখানে তাঁহারা সুশিক্ষিতা, সেখানে গার্হস্থ্য সুখ অধিকতর বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি। মহিলাদিগের জন্য পরিচালিত একখানি মাসিক পত্র স্থায়ী করিবার জন্য এক সময়ে কত চেষ্টা এবং কত সাধনাই করিতে হইয়াছিল! কিন্তু এখন ঈশ্বর-কৃপায় স্ত্রীপাঠ্যরূপে অনেক পত্র ও পত্রিকা স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে। যে সেবাব্রত লইয়া বামাবোধিনীর জন্ম, সে সেবাব্রত আজ

অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দিত হই বটে, কিন্তু তাহাতে বামা-বোধিনীর কর্ত্তব্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

সুশিক্ষালাভের জন্য যে সকল নারীর মন উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, এখন তাঁহাদিগের যথোচিত শিক্ষা এবং উন্নততর মনের ভাবের অনুরূপ সাহিত্য উপহার দেওয়া বড় সহজসাধ্য কর্ম্ম নহে। এখন এক দিকে স্বদেশীয় ভাষা প্রভৃতিতে সু-শিক্ষিতা অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ, অন্য দিকে বহুবিদ্যায় সুশিক্ষিতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অলঙ্কারস্বরূপিণী নারীগণ—এই দুই শ্রেণীর, অথবা বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিতা বহুশ্রেণীর মহিলাদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য মাসিক সাহিত্য প্রচার করা নিতান্ত সহজ নয়। যে শ্রেণীর সাহিত্য এখন সুশিক্ষিত পুরুষদিগের জন্য সৃষ্ট হইতেছে, সেই শ্রেণীর সাহিত্য রমণীদিগের জন্যও উপস্থাপিত করিতে হইলে, তাহাতে সহজ-বোধ্য বিবিধ জ্ঞানের কথা সঙ্কলিত করিতে হইবে, তাহা না হইলে তদ্দ্বারা সকল শ্রেণীর পাঠিকাদিগের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে পারা যাইবে না।

গত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আমি এই পত্রিকার লেখকশ্রেণীতে প্রথম অন্তর্নিবিষ্ট হই। সে আজ ৩২ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কাজেই বলিতে পারি যে, বামাবোধিনীর বর্ত্তমান লেখকবর্গের মধ্যে আমি প্রাচীনতম না হইলেও উহার একজন প্রাচীন লেখক বটে। সেই প্রাচীনতাটুকুর বলে এই নব বর্ষে আমি এই পত্রিকার লেখক এবং পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, পরিবর্ত্তিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সুপ্রবর্ত্তিত সাহিত্যসেবার পথে অগ্রসর হউন।

এখনও যখন বামাবোধিনীর একটা বিশিষ্টতা এবং বিশেষত্ব রক্ষা করিবার আছে, তখন তাহার অনুরূপ উপাদান-সংগ্রহে আগেকার মত উৎসাহই প্রবল রাখিতে হইবে। দৈনন্দিন গৃহকর্ম্মে ও সন্তানপালন প্রভৃতিতে এত জ্ঞাতব্য তথ্য জানিবার আছে যে, তাহা কোন উন্নত যুগেই উপেক্ষিত হইতে পারে না। বিজ্ঞান শাস্ত্রের বড় বড় আবিষ্কার এবং তাহা লইয়া আলোচনা অতি বড় শিক্ষিত-দিগের অদৃষ্টেও ঘটিয়া উঠে না। আমরা যদি সেই প্রকার বড় বড় তত্ত্বের কথার দোহাই দিয়া ক্ষুদ্র বলিয়া প্রয়োজনীয় তথ্যকে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত প্রতারিত হইব। গৃহস্থের জীবন যাপনের জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার কথা অনেক মহিলার অভিজ্ঞতা হইতে এত সংগৃহীত হইতে পারে যে, বড় বড় বিজ্ঞানাচার্য্যেরাও তাহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারেন। প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের এ দেশের সমাজ এত-দিন যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক অনেক বিষয়েরই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান নারীসমাজে আবদ্ধ রহিয়াছে। নারীকে অবলা বলিলেও এ সকল বিষয়ে চির-কালই "পৌরস্ত্রীণাং প্রগল্ভতা" মাত্র

হইয়া আসিয়াছে। ক্ষুদ্র কথা বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া মহিলারা যাহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের কথা দশ জনের উপকারের জন্য প্রচার করেন, তাহার জন্য আমরা সাগ্রহে সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

সাহিত্য কেবল মার্জ্জিত ভাষার বাছা-বাছা শব্দের সংযোজনপ্রণালী নহে, কেবলমাত্র বচনরচনার বাহাদুরি লইয়া সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। যে জ্ঞান আমাদিগের গৃহধর্ম্মের সহায়, চরিত্র-গঠনের অনুকূল, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এই সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে নারীর যে বিশেষত্ব আছে, তাহাই বিশেষ করিয়া বিকশিত করিবার জন্য এই পত্রিকায় নারীরচনা বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হয় এবং তাহার জন্য একটি বিশেষ স্থান রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যাহাতে ঐ স্থানের লেখা কেবলমাত্র দুই চারিটি কবিতা রচনায় পর্য্যবসিত না হয়, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে লেখিকাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।)

অষ্টম অধ্যায়।

লাটিনদিগের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধ।

১। ৪১৪ রোমাব্দে লাটিনদিগের সহিত রোমক জাতির দ্বিতীয় সংগ্রাম হয়।

২। প্রথম যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি লাটিনেরা রোমের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। রোমের সমুদায় সৈন্যের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ লাটিন ছিল এবং তাহারা নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমকদিগের মহিমা বর্দ্ধন করিয়াছিল। অতএব তাহারা রোমের নগরবাসী ও সেনেটরদিগের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য রোমকদিগের নিকট প্রার্থনা করিল। কিন্তু সেনেটরেরা সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন, সুতরাং লাটিনেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল (ক)।

৩। প্রথমে দুই জাতিতেই তুল্য বলে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু পরে ভিসুভিয়স পর্ব্বতের নিকট যে সংগ্রাম হয়, তাহাতে লাটিনেরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া রোমের অধীনস্থ হইল।

(ক) বিগত ১৮৫৭ ও ৫৮ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধে ইংরাজ রাজপুরুষেরা যেরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন, সুশিক্ষিত লাটিন সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে রোমকেরাও সেইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়।

সামনাইটদিগের সহিত যুদ্ধ।

১। খৃঃ পূঃ ৩৪২ অব্দে এবং রোম-স্থাপনের ৪১০ বৎসর পরে,সামনাইটদিগের সহিত রোমকদিগের প্রথম যুদ্ধ হয়।

২। ইটালীর অন্তঃপাতী কাম্পেনিয়া দেশের লোকেরা সামনাইটদিগের ভয়ে রোমকদিগের শরণাপন্ন হয় এবং তাহারাই রোমকদিগকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে।

৩। এই যুদ্ধ ক্রমাগত ৫০ বৎসর চলিয়াছিল। প্রথমে দুই বৎসর যুদ্ধ হইয়া সন্ধি হয়। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে দ্বিতীয় বার যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে রোমীয় সেনাগণ পার্ব্বতীয় যুদ্ধে অশিক্ষিত থাকাতে সামনাইট-সেনাপতি পোন্টিয়সের হস্তে পরাভূত ও অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিল।

৪। কিন্তু রোমীয় সেনাপতি মহাবীর পপিরিয়স কর্সর সামনাইটদিগকে বারম্বার পরাভূত করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন।

দশম অধ্যায়।

টরেন্টিয়দিগের সহিত যুদ্ধ।

১। টরেন্টিয়েরা রোমকদিগের জাহাজ সকল লুট করিয়াছিল। ইহাতে রোমকেরা এই উপদ্রবের কারণ জানিতে পারিয়া তাহাদিগের নিকট এক দূত পাঠাইয়া দেন। অত্যাচারীরা কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া দূতকে নানা প্রকারে অপমান করে। ইহাতেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

২। টরেন্টিয়েরা সাহায্যের জন্য গ্রীসের অন্তর্গত ইপাইরসের রাজা পিরহসকে আহ্বান করিল। তিনি খৃঃ পূঃ ২৮০ অব্দে ইটালীতে আসিয়া পাণ্ডোসিয়া ও আস্কুলমের রণক্ষেত্রে রোমকদিগকে বারম্বার পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বেনিভেণ্টমের শেষ যুদ্ধে তিনি এককালে নিঃসৈন্য ও পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

৩। তৎপরে রোমানেরা টরেন্টিয়, সলেণ্টাইন ও ইটালীর দক্ষিণস্থ অন্যান্য জাতিকে জয় করিল। ইহার অনতি-বিলম্বেই সুবিখ্যাত পিউনিক মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

একাদশ অধ্যায়।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ।

১। রোমনগরস্থাপনের ৪৯০ বৎসর পরে এবং খৃষ্টের জন্মের ২৬৪ বৎসর পূর্ব্বে, "পিউনিক যুদ্ধ" অর্থাৎ কার্থেজের সহিত রোমের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কার্থেজের বর্দ্ধমান ক্ষমতা দেখিয়া রোমের হিংসা প্রবল হয় এবং ইহাই এই সংগ্রামের মূলীভূত কারণ।

২। সিসিলির লোকেরা এই যুদ্ধের সূচনা করিয়া দেয়। প্রথমে মেসিনার লোকেরা ও সিরাকুজের রাজা হায়রোর পক্ষ হয়। এই যুদ্ধ অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিতেছিল। পরে রোমীয় সেনাপতি আপিয়স ক্লডিয়স আসিয়া মেসিনা অধিকার করিলেন। ইহাতে রোমক-দিগের সহিত হায়রোর যুদ্ধ ঘটিল। কিন্তু

তৎপরে হায়রো রোমের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং রোমের সহিত তাঁহার সকল বিবাদ ঘুচিয়া গেল। তৎপরে কার্থেজে ও রোমে সিসিলি লইয়া মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

৩। যুদ্ধের পঞ্চম বর্ষে রোমের কন্সল জুলিয়স ১৬০ খানা জাহাজের সহিত সুসজ্জিত হইয়া কার্থেজের সমুদ্রপোত সকল আক্রমণ করিল। ইহাতে রোমকদিগের জয়লাভ হইল এবং তাহারা বিপক্ষদিগের জাহাজ সকল কতক হস্তগত করিল ও অবশিষ্ট জলমগ্ন করিয়া দিল।

৪। এই প্রথম পিউনিক যুদ্ধ ২৩।২৪ বৎসর চলিয়াছিল। পরে কেয়স লুটেসস দ্বিতীয় সামুদ্রিক যুদ্ধে কার্থেজের জাহাজ সকল ধ্বংস করাতে কার্থেজের পোতাধ্যক্ষ হানো সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

৫। রোমকেরা তাহাতে সম্মত হইয়া ধার্য্য করিল যে, সিসিলি, সার্ডেনিয়া এবং ইটালী ও আফ্রিকার মধ্যস্থ সমস্ত দ্বীপ রোমকদিগকে দিতে হইবে, এবং যুদ্ধের ব্যয় পূরণার্থে কার্থেজিয়ানেরা ২০ বৎসর প্রতি বৎসর ১২০০ টেলন অর্থাৎ ২৪ লক্ষ টাকা রোমের রাজকোষে প্রদান করিবে (ক)।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ।

১। প্রথম যুদ্ধ শেষ হইবার ২৪ বৎসর পরে (খৃঃ পূঃ ২১৭ অব্দে) দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ হয়। কার্থেজ-সেনাপতি হানিবলের উচ্চাভিলাষ এবং রোমের প্রতি তাঁহার তাচ্ছিল্য ভাবই ইহার কারণ। তিনি স্পেন দেশের অন্তর্গত সেগুণ্টম-নামক রোমকদিগের একটী নগর অধিকার ও ধ্বংস করাতে এই যুদ্ধ ঘটে।

২। রোমকেরা আপনাদিগের মিত্ররাজ্যের দুরবস্থার কথা শুনিয়া কার্থেজীয়দিগের অত্যাচারের ও সন্ধিভঙ্গের কারণ জানিতে দূত পাঠাইল, তাহাতে কার্থেজিয়ানেরা যুদ্ধ করিব এই উত্তর দিল।

৩। কার্থেজ সেনাপতি অদ্বিতীয় বীর হানিবল তৎপরে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক পাইরেনিস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া রোন নদী পার হইলেন। পরে আল্পস্ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া অসীম উৎসাহের সহিত রোমাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং টেসিনস, ট্রেবিয়া, থ্রাসিমনি ও কানি এই চারি স্থানে সম্মুখ সংগ্রামে মত্ত হস্তীর ন্যায় রোমীয় সৈন্য সকল দলন করিয়া জয়লাভ করিলেন। ইহাতে রোমে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উঠিতে লাগিল এবং সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল যে, অবিলম্বে রোমের পতন হইবে, সন্দেহ নাই।

৪। কিন্তু রোমের সৌভাগ্যবশতঃ হানিবল আর অধিক কাল জয়শিখরে উত্থিত হইতে পারিলেন না। রোমানেরা স্বীকার করেন যে, হানিবল জয় করিতে

(ক) প্রথম পিউনিক যুদ্ধের ৬ বৎসর পরে কোন জাতির সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ না থাকাতে জেনস দেবের মন্দিরের দ্বার একেবার রুদ্ধ হয়।

যেরূপ জানিতেন, যদি সেই জয় রক্ষা করিতে এবং তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সেইরূপ জানিতেন, তাহা হইলে রোমের সমূলোচ্ছেদ নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য ছিল না।

৫। ফেবিয়স, মাক্সিমিয়স এবং কনিষ্ঠ সিপিও এই তিন বীরপুরুষের দক্ষতায় রোম এ যাত্রা রক্ষা পাইল। হানিবলের নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণেও রোমের অনেক সুবিধা হইয়াছিল বলিতে হইবে। তিনি আপনার জয়পতাকা অবিশ্রান্ত উড্ডীয়মান না রাখিয়া সৈন্য-গণকে আমোদ আহ্লাদ করিতে অনুমতি দিলেন, সুতরাং রোমকেরা আপনাদিগের নিস্তেজ বল পুনরুদ্দীপ্ত করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইল।

৬। হানিবল ইটালীতে ষোড়শ বর্ষ ছিলেন। পরে সিপিও তাঁহাকে ইটালীর বহির্ভূত করিবার মানস করিয়া বহু সংখ্যক সৈন্যের সহিত আফ্রিকাতে উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে যাহা পাইলেন ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ইহাতে হানিবল স্বদেশ রক্ষার জন্য আফ্রিকায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

৭। হানিবল আফ্রিকায় প্রত্যাগত হইলে জামা-নামক স্থানে খৃঃ পূঃ ২০১ অব্দে তাঁহার সহিত সিপিয়োর এক ঘোরতর যুদ্ধ হইল, তাহাতে হানিবল সম্পূর্ণ-রূপে পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি স্বীয় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে নিরাশ হইয়া আসিয়ায় পলায়ন করিলেন। ইহাতেই যুদ্ধ শেষ হইল এবং রোমকেরা সন্ধিপ্রস্তাবে যে যে আপত্তি করিল, কার্থেজিয়েরা তাহাই স্বীকার করিল।

৮। আফ্রিকার এই মহাযুদ্ধে জয়ী হওয়াতে সিপিও আফ্রিকেনস্ অর্থাৎ আফ্রিকাজিৎ এই উপাধি পাইলেন।

আদর্শরমণী স্বর্গগতা শ্রীমতী নীলমণি দত্ত চৌধুরী।

হিন্দুর গৃহে হিন্দুকুললক্ষ্মীদিগের কর্ম্মক্ষেত্র পরিমিত হইলেও সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের কার্য্য ও প্রভাব সমাজের উপর এত আধিপত্য স্থাপন করে যে, উহা লিপিবদ্ধ না হইলে সামাজচিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এইরূপ চিত্রাঙ্কনে আমাদিগের দেশে শিল্পী অতি বিরল। বোধ হয় হিন্দুরমণী-গণ চিরকাল অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ায় বহির্জ্জগতের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধের অভাবে এ কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিবার অবকাশ বড় শীঘ্র পাওয়া যায় না। আজ যাঁহার জীবনগাথা লিখিতেছি, তিনি ২৯এ চৈত্র, ১২৬৫ সালের নীলষষ্ঠীর দিনে

কোন্নগরে স্বর্গীয় ডাক্তার হরলাল মিত্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুভ দিনে কন্যার জন্মগ্রহণ হইল বলিয়া তাঁহার নাম হইল নীলমণি। সেকালে কোন্নগরে অভয়চরণ মিত্রের খুব প্রতিপত্তি ছিল। কুলে, শীলে, ধনে ও মানে সকলদিকেই অভয়চরণের 'বোলবোলার' ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বসমেত সাতটি ভাই। চতুর্থ দিগম্বর মিত্র নিমকমহলের দারোগাগিরি করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অবাধে তাঁহার প্রতাপে বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খাইত। শুনিয়াছি, পূজার সময় তাঁহাদের বাড়ীতে প্রতিমার সাজসজ্জা স্বর্ণ রৌপ্য মণ্ডিত হইত ও কয়দিন ধরিয়া বহু দরিদ্র প্রতিপালিত হইত। যে প্রতাপ কেবল অর্থে আবদ্ধ থাকে, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না, কিন্তু হৃদয়ের বিশালতায় যাহা সম্বদ্ধ তাহা প্রায়ই বংশপরম্পরায় চলিয়া আসে। জ্যেষ্ঠ অভয়চরণের প্রতাপ অনেকটা সেই শ্রেণীর ছিল। অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও তিনি অর্থের জন্য কোন কার্য্যে কার্পণ্য প্রকাশ করিতেন না। যাহা শুভ, যাহা মঙ্গলকর, যাহা সাধারণের উপযোগী তাহা হইতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি দানে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত, যোগ্যপাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কখনও বিমুখ হইত না। সাতটি ভাই সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ, নির্ম্মলস্বভাব, অহঙ্কারবর্জ্জিত ও পরোপকারী। সর্ব্বকনিষ্ঠ হরনাথ রূপে ও গুণে সংসার আলোকিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার মেডিকেল কলেজে উপর্য্যুপরি উচ্চবৃত্তি পাইয়া যখন শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তিনি সরকারী কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালায় স্বাস্থ্য মিউনিসিপালিটি বা লোকাল বোর্ডের পর্য্যবেক্ষণে ছিল না, এজন্য জ্বরের প্রকোপ সর্ব্বত্রই অনুভূত হইত। কাজেই এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াইয়া, নানা ঘাটের জল খাইয়া, হরনাথের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দীর্ঘাবকাশ লইয়া গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু নিয়তির নির্ব্বন্ধ কে অন্যথা করিতে পারে? কিছুদিন রোগশয্যায় থাকিয়া দুইটি পুত্র ও একমাত্র কন্যাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি শেষ বিদায় লইলেন। সংসারে তখন কেবলমাত্র তিনটি ক্ষুদ্র জীবন লইয়াই শোকাতুরা মাতা বাঁচিয়া রহিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আর কেহ কোথাও নাই। এ দুর্দ্দিনে সন্তান পালন কার্য্য সামান্য এক নিরক্ষরা হিন্দু বিধবার পক্ষে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু মাতার কোমল স্নেহ এমনি করিয়া ছেলেগুলিকে আর্দ্র করিয়া ফেলিল যে, তাহারা সেই কোমলতার মধ্য দিয়া উচ্চ জীবনের আদর্শগুলি স্বল্পায়াসেই বাছিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। শৈশবে কচি কচি হৃদয়ের ভাষা পরিস্ফুট করিতে মাতা যেমন দক্ষ, এমন আর কেহ নহেন। সন্তানের শিক্ষায় মাতা যে উচ্চ স্থান

অধিকার করেন, সে বিষয়ে আর কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। হরনাথের বিধবাপত্নী প্রখর বুদ্ধিচাতুর্য্যে সন্তানদিগকে সংশিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। কমলকোরক যেমন সূর্য্যদেবের স্নেহ-দৃষ্টিতে অল্পে অল্পে নয়ন মেলিয়া চাহে, এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূতা আমাদের পূজনীয়া নীলমণিও তেমনি করিয়া মাতৃশিক্ষা-প্রভাবে জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ভালবাসিতে হয় কি করিয়া, পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয় কি করিয়া, দয়াধর্ম্মে অতুলনীয়া হওয়া নারীর সাধ্যায়ত্ত কি না, এ সমস্তই তিনি ক্রমশঃ মাতার নিকট শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সংসারে সকলের অপেক্ষা কনিষ্ঠা বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ আদর করিত। পাছে তাঁহার অসুখ হয় এইজন্য তাঁহাকে ভাল জিনিস ভিন্ন কিছুই খাইতে দেওয়া হইত না। এখানে একটি গল্প মনে পড়িতেছে, সেটি বলিবার লোভসংবরণ করিতে পারিতেছি না। মিত্র-পরিবারের আর এক ঘরে তাঁহার জনৈক নিঃস্ব আত্মীয়া থাকিতেন। তাঁহার এক পুত্র ছিল, সে বয়সে প্রায় নীলমণির সমান, কাজেই তাহারা দুই জনে এক সঙ্গে খেলা-ধূলা করিত। দয়ার্দ্রচিত্তা বালিকা খাবার পাইলে মুঠার ভিতর লুকাইয়া লইয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে তাহাকে খাওয়াইত। প্রায় নিত্যই এইরূপ হইত। এ যে কেবল খেলার সাথী বলিয়া তাহা নহে, বাড়ীর দাসদাসীদের মেয়েছেলেদিগকেও তিনি এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাহাদের ক্ষুধার উদ্রেক হইলে দৌড়িয়া গিয়া মাতার নিকট হইতে যাহা কিছু পাইতেন তাহাই আনিয়া তাহাদিগকে দিতেন। তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের লক্ষণ অতি শৈশব হইতেই পরিস্ফুট হয়। বস্তুতঃ নীলমণির শিক্ষা এইরূপ না হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি পরকে আপন করিয়া লইতে পারিতেন না।

কুমারী জীবনে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াই-বার যথেষ্ট সময় থাকিলেও কঠোর সমাজ-শাসনে হিন্দুর তাহা হইবার যো নাই। দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই তাঁহার বিবাহের চেষ্টা হইতে লাগিল। বঙ্গের নানা সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধও আসিল। কিন্তু তাহার কোনটাই মনোমত নহে বলিয়া কিছুই স্থির হইল না। এদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নীর উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু সম্ভ্রান্তবংশীয় ও শিক্ষিত পাত্র না পাইলে বিবাহ দিবেন না তাহাও মনঃস্থ করিলেন। কন্যার রূপলাবণ্য ও বংশমর্য্যাদায় আকৃষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে অনেক সাধ্যসাধনাও আরম্ভ হইল। কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। শেষে আন্দুলের চৌধুরীবংশীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক উচ্চ-শিক্ষিত, সুদর্শন ও চরিত্রবান্ যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিল। উভয় পরিবারের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই জানা শুনা থাকায় খোঁজ খবর লইবার আবশ্যক হইল না। সম্বন্ধ

আসিতেই কর্ত্তৃপক্ষ দেখিলেন এ উপযুক্ত অবসর। তখনকার দিনে চৌধুরীবংশের তেমন অর্থস্বাচ্ছল্য না থাকিলেও ছেলেটি যে "হীরার টুক্‌রা" সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। শুভ দিনে শুভ মুহূর্ত্তে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। পাত্রটির নাম শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত চৌধুরী। ইনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স ও এফে পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ও উচ্চ বৃত্তি পাইয়া ১৮৬৯ সালের বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার মত শান্ত, সুবোধ, পবিত্রহৃদয়, নির্ম্মলচিত্ত, সুপুরুষ তখনকার দিনে অল্পই পাওয়া যাইত। যাহাহউক, বাঙ্গালা ১২৭৬ সালের ২৩এ আষাঢ় তারিখে আনন্দহিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে দুইটী উন্মুক্ত হৃদয় সংসারশৃঙ্খলে বাঁধা পড়িল, "রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন"—মণি কাঞ্চনের যোগ হইল।

বিবাহের পরেই স্বামীর হস্তে তাঁহার শিক্ষা আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। সীতার বনবাস, টেলিমেকস্, রামায়ণ, মহাভারত, নীলদর্পণ প্রভৃতি যে সমস্ত পুস্তক তাঁহাকে একবার পড়িতে দেওয়া হইত, তাহা প্রায় সবই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। এই সঙ্গে আর্য্যদর্শন, বামাবোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি অনেক মাসিক সাহিত্যও তাঁহার পাঠ্য ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রখর স্মরণ-শক্তির সাহায্যে ভাল ভাল প্রবন্ধগুলি স্বল্পায়াসেই তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যাইত। যাহা তিনি একবার পড়িতেন, জীবনে তাহা কখনও ভুলিতেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বামীর উপদেশবাক্যগুলি শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া ক্রমে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার অসীম স্বামিভক্তি ও অন্যান্য সদ্‌গুণরাশির পরিচয় পাইতে কাহারও অধিক বিলম্ব হইল না। স্বামীরও হৃদয় স্বতঃই নবপরিণীতা স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইল।

(ক্রমশঃ)

প্রভাত।

গিয়েছে আঁধার কালো, এসেছে দিনের আলো,
নিশি অবসান,
প্রভাত দেখিয়ে রাতি, বিহগ তুলিছে গীতি,
সুমধুর তান।
সাজিয়ে সোণার ছবি, উঠেছে নবীন রবি
আকাশের গায়,
কুসুমের তরুরাজি রয়েছে কুসুমে সাজি
সুচারু শোভায়।
তুলিয়া মধুর তান অলি:করে মধু পান
গুন্ গুন্ রবে,
সুশীতল বায়ু আসি, ছড়ায়ে সৌরভরাশি,

মাতাইয়া জীবে,
মৃদু মন্দ সঞ্চালনে ছুটিছে আপন মনে
কাঁপায়ে তলায়।
পাইয়া শিশিরজল সুশোভিত তরুদল
মণিমুক্তায়,
কুলু কুলু ধ্বনি করে, তটিনী বহিছে ধীরে
তুলিয়া লহরী,
ফুটন্ত কমলদলে হেলে দুলে কুতুহলে
প্রেমভরে মরি!
ঊর্দ্ধ মুখে আঁখি তুলে হেরিছে গগনকোলে
প্রাণ-দেবতায়,
সলাজে কুমুদরাশি, নিবায়ে মধুর হাসি
নয়ন লুকায়।
সুন্দর শ্যামল মাঠে রাখাল চলেছে গোঠে
লয়ে ধেনু পাল,
কেমন প্রফুল্ল মনে কৃষক মজেছে গানে
ধরে নিজ হাল।
প্রভাতের চারু হাসি স্বর্গীয় অমিয়রাশি
সুধার লহরী,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, কেবলি সৌন্দর্য্য দেখি
দুনয়ন ভরি।
মধুর সময় যেই সৃজন করেছে এই
পবিত্র উষায়,
ভক্তিভরে জুড়ি হাত কর জীব প্রণিপাত
সেই বিধাতায়।

শ্রীমতী মনোরমা রায়, পুরুড়া।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষ গুণ কি?

কোন্ সময় হইতে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। আদিম আর্য্য-জাতির মধ্যেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রচলন শুনিতে পাওয়া যায়, এবং বৈদিক যুগেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন হিন্দুসমাজেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা প্রতি গৃহেই বিদ্যমান ছিল।

বর্ত্তমান কালে কেবল ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রচলন আছে কিনা জানি না।

বর্ত্তমান সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অবনতির কারণ ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা, এবং আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতার অভাব। প্রত্যেকেই স্বার্থ ত্যাগ করিতে না পারিলে, প্রত্যেকেই অপরের সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে, প্রত্যেকেরই উদার সরল অন্তঃকরণ না হইলে, একত্র বাস করা কষ্টকর বলিয়া মনে হয় এবং একত্র বাস করিলেও নানা প্রকার অশান্তিতে সংসার সুখশান্তিহীন হইয়া উঠে। একান্নবর্ত্তী পরিবার সকল প্রায়ই রমণীদিগের প্ররোচনায় পৃথক্ হইতে শুনা যায়। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে এবং কুশিক্ষার ফলেই নীচতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নানা দোষে সংসারে এরূপ বিপ্লব ঘটে। অন্যান্য কতকগুলি কারণেও

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে জীবিকার জন্য কর্ম্ম উপলক্ষে পুরুষদিগকে বিদেশে গমন করিতে হইত না, নিজেদের কৃষিকার্য্য আদি যাহা থাকিত তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, এখনকার মত সকল দ্রব্যই মহার্ঘ ছিল না, অতএব একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা ঘরে ঘরে বিদ্যমান ছিল। অধুনা জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত পুরুষদিগকে বাধ্য হইয়া বিদেশে গমন করিতে হয়। একা একা বিদেশে বাস অত্যন্ত কষ্টকর, সুতরাং বাধ্য হইয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। বিশেষতঃ, রেলাদির বিস্তার জন্য গমনাগমনের সুবিধা হওয়াতে সকলেই সহজে বিদেশে স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া যাইতে পারেন। স্বতন্ত্রভাবে বিদেশে বাস করিতে করিতে এমনই কু-অভ্যাস হইয়া যায় যে, দীর্ঘকাল বিদেশ-বাস অন্তে যখন সকলে আবার একত্রিত হয়েন, তখন দূরে বাসের অভ্যাসে নানা অসুবিধা বোধ করেন এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে একান্নবর্ত্তী পরিবার লুপ্ত হইয়া যায়। মানব-চরিত্রগঠনে একান্নবর্ত্তী পরিবারের যেরূপ প্রভাব দেখা যায়, মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে, আত্মত্যাগ, সংযম, নিঃস্বার্থতা শিক্ষা দিতেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের তদ্রূপই প্রভাব। যাঁহারা ভিন্ন হইয়া একা একা বাস করেন, তাঁহাদের সে শিক্ষা আদৌ হয় না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতের পুত্রকে আপন ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতের কন্যাকে আপন সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় মনে করিয়া স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখা একত্র বাস ভিন্ন পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে হইতেই পারে না। একত্র না থাকিলে প্রীতি ও মমতা আসাও অসম্ভব! একান্নবর্ত্তী পরিবারের একত্র থাকার নানা দোষ এবং অসুবিধা থাকিলেও ইহার কয়েকটি প্রধান গুণ আছে। মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণরাজি নিঃস্বার্থতা, উদারতা, আত্মত্যাগ ও স্বাধীন ইচ্ছা দমনের ক্ষমতা, সংযম, পর-সেবা, পরের প্রতি দয়া। এই সদ্‌গুণ-রাশি একান্নবর্ত্তী পরিবারে বিকশিত হইবার যেরূপ সুযোগ, অন্যত্র তদ্রূপ নাই। ইংরাজীতে একটী কথা আছে—"রাজার কখনও মৃত্যু নাই।" সেইরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবারও কখন সমূলে বিনষ্ট হয় না। একের অবর্ত্তমানে অপরে সেই পরিবারের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিধবা ভগ্নী, মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা প্রভৃতি আত্মীয়াদিগকে বৃদ্ধবয়সে জীবিকার জন্য অপরের দ্বারে যাইতে অথবা কোনরূপ কার্য্য গ্রহণ করিতে হয় না।

জগতে একাকী কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা যায় না। কেবল একার শক্তিতে কোন উন্নতির চেষ্টা করিলে অনেক সময় তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়, আর সফল হইলেও অধিক সময় লাগে, কিন্তু সকলে মিলিয়া একত্রীভূত হইয়া যে কার্য্য করা যায়, তাহা অতি শীঘ্র এবং সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হয়। একা একা থাকায় অনেক সময় রোগশোকাদিতে

নানা প্রকার অসুবিধা এবং কষ্ট ভোগ করিতে হয়। অনেকের দেখিয়াছি বহুকাল একত্র থাকায় তাহাদের পক্ষে 'একা' থাকা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারই আমাদের দেশে জীবনবীমার অভাব দূর করিত বলিয়া বোধ হয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষ এই যে, যদি বাড়ীর মধ্যে একজন উপার্জ্জনশীল হইলেন, তাহা হইলে অপর সকলে আত্মনির্ভরশীলতা ভুলিয়া যান। তাঁহাদের যে পুত্র কলত্র প্রভৃতির জন্য অর্থ উপার্জ্জনের আবশ্যক, ইহা একবারও মনে না করিয়া উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির উপরই সংসারের দায়িত্ব দিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকেন। অনেকে উপার্জ্জন করিলে তাহা সংসারে দেওয়া আবশ্যকই মনে করেন না, সুতরাং কালে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। আলস্য যে কত দোষের, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। উপসংহারে বর্ত্তমান সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের আবশ্যকতা আছে কি না, সে বিষয় আলোচনা করিতে চাহি না; তবে আমার মনে হয়, যাঁহারা একান্নবর্ত্তী-পরিবারভুক্ত, তাঁহারা যদি প্রত্যেকেই অলস ও নিশ্চেষ্ট না হইয়া কর্ম্মক্ষম হয়েন এবং প্রত্যেকেই সংসারের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরল ও উদারচিত্তে আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই একান্নবর্ত্তী পরিবারে শান্তি ও সুখ আছে। ইহাতেও স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যক, কারণ গৃহরাজ্য রমণীদিগের দ্বারাই পরিচালিত। অতএব তাঁহারাও সেইরূপ আদর্শ রমণী হইলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতি গৃহেই অক্ষুণ্ণ শান্তি বিরাজিত থাকিবে।

শ্রীচারুমতি দেবী।

নূতন সংবাদ।

১। এড্রিয়ানোপল তুরস্কের অধিকারচ্যুত হইয়াছে। তুরস্কের এই বিপদে সমগ্র মুসলমানসমাজ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছে।

২। হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অবকাশ লইয়াছেন। তাঁহার স্থানে ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায় মহাশয় নিয়োজিত হইয়াছেন।

৩। আমরা বঙ্গভূমির আর দুইজন কৃতী পুরুষকে হারাইলাম। সুবিখ্যাত গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় গত ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণে ৬৯ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী লোক অতি বিরল। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ

সেন মহাশয়ও প্রায় এক বৎসর কাল দুরারোগ্য রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ১২ই এপ্রিল শনিবার প্রত্যূষে ৪৮ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অমরধামে গমন করিয়াছেন। ইঁহাদের লোকান্তরে বঙ্গবাসী সকলেই মর্ম্মাহত।

৪। তিব্বতদেশের চারি জন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পুত্র শিক্ষালাভার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিব্বত-দেশীয় আর কেহ শিক্ষালাভার্থে বিদেশ গমন করেন নাই।

৫। শুনা যাইতেছে, দিল্লীতে ১৯১৩ ও ১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সৈন্যাবাস নির্ম্মাণ করা হইবে। এই ১৬ লক্ষের মধ্যে ১১ লক্ষ টাকায় ভূমি ক্রয় করা হইবে এবং অবশিষ্ট ৫ লক্ষ টাকা গৃহাদিনির্ম্মাণে ব্যয় করা হইবে।

৬। শুনা যাইতেছে, আসাম গবর্ণমেণ্ট গৌহাটী হইতে সদিয়া পর্য্যন্ত এক নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। সম্ভবতঃ এই রেলপথ চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

৭। ময়মনসিংহের অন্যতম জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলি খাঁ। হিন্দু-শ্মশান-ঘাট বাঁধাইয়া দিবার জন্য ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৮। চাইল্ডার প্রণীত পালিভাষার অভিধানে যে সকল শব্দ বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা লইয়া একখানি অভিধান লিখিবার জন্য শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রকে এক বৎসরের নিমিত্ত মাসিক ১০০৲ টাকার বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

৯। কলিকাতার আউটরাম রোডের উত্তরাংশে ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড কার্জ্জনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লর্ড কারমাইকেল এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

১০। মূকবধির বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ শ্রীমান্ অটলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মূক-বধিরদিগের শিক্ষাপ্রণালীতে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি মূক ও বধিরদিগের শিক্ষাপ্রণালীতে অভিজ্ঞ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বামারচনা।

নব বর্ষ।

কেন এলে নব বর্ষ ! কে তোমারে ডেকেছে ?
কেউ কি আদর করে
ডাকিয়াছে প্রেমভরে,

বল বল কার তরে তব প্রাণ ছুটেছে ?
পলে পলে ধীরে ধীরে
ক্রমশঃ আসিলে ফিরে,

"এস বলে" তোমারে কি কেউ
দিব্য দিয়েছে?
দিন রাত অবিরত
কলুর ঘানির মত
কেন বা ঘুরিছ এত, কে ঘুরিতে
বলেছে?
প্রণয় নিগড় দিয়া
কেউ কি তোমার হিয়া
যতনে সোহাগভরে চির তরে
বেঁধেছে?
কার তরে আত্মহারা
যেনরে পাগল পারা
কার প্রেম সুধা পানে তব মন
মেতেছে!
হে নব বরষ তব এ কেমন ধারা,
নব বেশে বার বার
কর ধরা অধিকার,
সুখের হিল্লোলে কারো সতত
ভাসাও রে,
নিদারুণ দুখ দিয়া
কাঁদাও কাহারো হিয়া
কা'রে শোকানল তাপে জর জর
কর রে।
ভীষণ দুর্ভিক্ষ লয়ে এলে ধরা-
মাঝে রে;
এবার অন্নের তরে
কত লোক যাবে মরে
এখনি ভরেছে দেশ হাহাকার
রবে রে।
হরি, হরি, কিবা হবে,
কেমনে সকলে রবে,
কি খেয়ে বাঁচিবে সবে তাই ভেবে
মরিয়ে।

শ্রীকুসুমলতা বসু।

নব বর্ষ

নবীন বরষ এসেছে ফিরিয়া,
ধরিয়ে নবীন সাজ।
নবীন হরষে সবার হৃদয়
মাতিয়ে উঠেছে আজ॥
যে দিকে নিরখি, দেখি বিশ্বময়
নবীন সুষমা ভরা।
কোটী প্রণিপাত, চরণে তাঁহার,
যাঁহার সৃজিত ধরা॥
কিন্তু একি ভাব? দয়াময় তিনি,
তাঁর রাজ্যে অবিচার!
কেহ ভাসে সুখে, কারো বা নয়নে
বহে শোক-অশ্রু-ধার!!
তিনি কৃপাসিন্ধু, কি দোষ তাঁহার?
আপন কর্ম্মের ফলে
কেহ থাকে সুখে, আনন্দে হাসিতে
কেহ ভাসে আঁখি জলে॥
তাই আজ প্রভো! কাতরা তনয়া
মাগিছে শরণ তব।
দূর কর তা'র, মনের সন্তাপ,
করুণায়, ভবধব!

শান্তিদাতা তুমি, দাও শান্তি প্রাণে,
মুছাও নয়ন জল।
তব নাম স্মরি, বিপদে বিষাদে,
পাই যেন হৃদে বল॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ, মাগুরা, খুল্না।

চট্টলা জননী।

(১)

সুন্দর জনমভূমি চট্টলা আমার,
বিধির অপূর্ব্ব দান সৌন্দর্য্যভাণ্ডার।
প্রাকৃতিক দৃশ্যে আহা! জুড়ায় নয়ন,
সৌন্দর্য্য সম্পদে যেন চির অতুলন।

(২)

কোথাও সুমেরুশ্রেণী সারি সারি শোভে,
তরু গুল্মে, ফুল ফলে ঘিরি নানাভাবে,
তারি প'রে ছোট বড় বিরাজে কুটীর,
শান্তিরূপা জননীর স্নিগ্ধ স্নেহ নীড়।

(৩)

কোথাও বিরাজে মঠ সাধু সন্ন্যাসীর,
সুকুমার ছায়াবৃত তরুবল্লরীর,
কপোত কপোতী তথা বসি নিরজনে,
মিলায় আপন গীতি সাধু স্তুতি সনে।

(৪)

কোথাও সুমেরুশিরে বহিছে নির্ঝর,
গভীর নিনাদে তার পুলকে অম্বর,
তারি তালে নাচে শিখী কলাপচ্ছটায়,
বারিপান আশে মৃগ কৌতুহলে ধায়।

(৫)

কোথা বা বিপিন ঘোর নিবিড় আঁধার
শ্বাপদ, পন্নগ আদি করিছে বিহার,
মধুর ঝঙ্কারে পাখী মাতায় কানন,
কুসুম সুষমা বাসে করিছে মোহন।

(৬)

কোথা ছুটে গিরিসুতা সাগরের পানে,
এঁকে বেঁকে নানারূপে কুলু কুলু তানে,
তরঙ্গিণী সনে নাচে বক্ষ প'রে তার,
কত শত জলযান কত যে প্রকার।

(৭)

কোথা বা শস্যের ক্ষেত নয়নরঞ্জন,
পথের দুধারে আহা! করি সুশোভন,
নানা বৃক্ষে সুশোভিত দীঘি সরোবর,
সকলি সুন্দর মরি! সকলি সুন্দর।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

১৩।৪ নং মথুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 597. June, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৭ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। জুন, ১৯১৩ | ১০ম কল্প ২য় ভাগ।।

ঈশ্বর।

১

প্রেমময়!
ত্রিভুবনমাঝে নাথ বিশ্ব সুমঙ্গল
কি সুধা ঢেলেছ আহা,
বিমল করুণা-মাখা,
যখন যে দিকে চাই নিরখি কেবল।

২

তোমার আদেশে রবি পাইয়া কিরণ
কতই স্নেহের ভরে,
দেয় আলো চরাচরে,
জীবের জীবন রাখে তোমারি পবন।

৩

তোমারি গগনকোলে উজল আভায়
তোমার ইঙ্গিতবলে,
শশী তারা শূন্যে চলে,
বিমল কৌমুদী ঢেলে ধরণীর গায়।

৪

হে বিভো মঙ্গলময় করুণা সাগর!
তোমার প্রেমের ধরা,
কেবল সৌন্দর্য্যভরা,
গাহিছে তোমার জয় সাগর ভূধর।

৫

তোমারি নন্দনবনে ভোমরায় গায়
তুমি নাথ দয়া করি,
কুসুমেতে সুধা ভরি,
সাজায়ে রেখেছ বনে কনকলতায়;

৬

ঢেলেছ মাধুরীরাশি বিমল উষায়
নিতি ফুটে ফুলদল,
বন করে সমুজ্জ্বল,
(যবে) তরুণ অরুণ ফুটে সোনালি
ছটায়।

৭

ছড়াইয়া সুধারাশি বসিয়ে শাখায়
বিহঙ্গ ললিত তানে,
উচ্ছ্বসিত প্রেমগানে,
তোমারি মহিমা বিভো! মানবে শোনায়।

৮

যখন বরষে মেঘ মুকুতা ধারায়
নাচে শিখী ভেকদল,
পাইয়ে নবীন জল,
আকুল কাকলি তুলি তব গুণ গায়।

৯

উথলে তটিনী সুখে ঘন বরষায়
তোমারি বসন্ত-বায়,
কোকিল পাপিয়া গায়,
প্রকৃতি ধরেন সাজ শ্যামল পাতায়।

১০

ছড়ায়ে কনক-ধারা সাঁঝের গগনে
শারদ কৌমুদী এলে,
হাসাও কুমুদ দলে,
নাচাইয়ে তালে তালে শ্বেত কাশবনে।

১১

অনন্ত তোমার পিতঃ! মহিমা অপার
কত যে যতন ক'রে,
রাখিয়াছ ক্ষুদ্র নরে,
বিলাইছ অকাতরে সুখের ভাণ্ডার।

১২

প্রণমি তোমার পদে জগৎ-পাবন!
যে কদিন থাকে প্রাণ,
এই করো ভগবান্,
জীবনের নিত্য ব্রত করি সমাপন
সদা যেন হৃদে হেরি তব শ্রীচরণ।

শ্রীমতী মনোরমা রায়,
পুরুড়া।

বঙ্গ-মহিলা।

(প্রথম প্রস্তাব)

মানবের সকল উন্নতির মূল তাহার জ্ঞানোন্নতি। বঙ্গমহিলা সেই জ্ঞানলাভে বঞ্চিতা। সুতরাং বঙ্গমহিলার ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব জগতে অতি অল্পই আছে।

এই ভারতবর্ষে একদা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সাধ্বীগণ, খনা, লীলাবতী ভারতী* প্রভৃতি বিদুষীগণ এবং পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী, পান্না প্রভৃতি তেজস্বিনী, আত্মত্যাগিনী দেবীগণ বিরাজিতা ছিলেন। আজি সেই সকল মহীয়সী দেবীগণের মহিমা-মণ্ডিত, পদ-ধূলি-রঞ্জিত ভারতবর্ষে, তাঁহাদের জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া জ্ঞানহীনা, কর্ম্মে অসমর্থা, সর্ব্বতোভাবে অক্ষমা বঙ্গ-মহিলাগণ অবস্থিতি করিতেছে, ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই যে, বঙ্গমহিলাগণ জ্ঞানোপার্জ্জনে অশক্তা হইয়া

* ভারতী—পণ্ডিতবর মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী।

জন্ম গ্রহণ করে নাই। অন্যান্য সভ্য দেশের মহিলাদিগের মত, তাহাদিগের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিও অনুশীলন দ্বারা সম্যক্‌-রূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে। তাহা না হইলে বর্ত্তমান কালে খ্রীষ্টান্ এবং ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় উচ্চ-উপাধি-প্রাপ্তা বঙ্গ-মহিলা দেশের মুখোজ্জ্বলকারিণী হইতেন না। হিন্দুসমাজেও রাণী ভবানী, দেবী ভগবতী, দেবী সোণামণি (১) এবং আজিকার সুলেখিকা সুকবি, সুগৃহিণী ও গ্রন্থরচয়িত্রী মহিলাগণও জন্মিতেন না। সেই জন্যই বলিতেছি, হায়! কেবল অনুশীলনের অভাবেই বঙ্গ-মহিলার জ্ঞানোন্নতি সাধিত হইল না।

আজি কালি দেশের উন্নতির জন্য অনেক পুরুষই ব্যগ্র হইয়াছেন। সেই উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশবাসী জন-সাধারণের দেহের সুস্থতা, মনের জ্ঞান, চরিত্রের নির্ম্মলতা এবং ধর্ম্মে বিশুদ্ধ ভক্তি লাভপূর্ব্বক অবস্থা ও উপযোগিতা অনুসারে নিজ নিজ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশে সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই ভ্রান্ত। সেই ভ্রান্তি প্রযুক্তই তাঁহারা স্বদেশের উন্নতিকল্পে সহস্র প্রকার পরিশ্রম করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। উন্নতির যেটি প্রধান সহায় সেইটীতেই তাঁহাদের অমনোযোগ, অবহেলা; সুতরাং দেশের প্রকৃত উন্নতি, প্রতিকূল বায়ু-তাড়িত তরণীবৎ, গম্য পথে পরিচালন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, উন্নতির সেই প্রধান সহায়—বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা।

স্ত্রীজাতি পুরুষের নিত্য-সহচরী। স্ত্রী-লোকের সহায়তা ব্যতীত পুরুষের দিন চলে না। পুরুষ শৈশবে মাতৃহস্তে গঠিত, বাল্যে ভগিনীর সহিত ক্রীড়াসক্ত, যৌবনে ভার্য্যা লইয়া সংসারী, বার্দ্ধক্যে কন্যা, পুত্রবধূর শুশ্রূষায় নির্ভরশীল, এবং চির দিনই বাটীর গৃহিণীর সাহচর্য্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। যাঁহারা চিরকাল এইরূপ মনুষ্যত্বের সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা বুদ্ধি ও বিচারশক্তিহীনা, মূর্খা, হীন-চরিত্রা এবং সর্ব্ববিধ মহৎ কর্ম্মের অযোগ্যা হইলে পুরুষের সুখ, শান্তি, উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতি কোথায় রহিবে? ইহা যে আজিকার দিনে উল্লেখ করিতে হয়, ইহাই আশ্চর্য্য।

প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সংসারে ও সমাজে যে কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা অনেকে বুঝিতেছেন, সন্দেহ নাই। এ দেশে এক প্রবাদ আছে যে, "রমণীই মানবের সকল অনিষ্টের মূল"। অনেক স্থলে যথার্থই দেখা যায় যে, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, গৃহবিবাদ প্রভৃতি পারিবারিক অশান্তি রমণী কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা নারীচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, এ সকল দোষ রমণীর প্রকৃতির দোষ নহে—সহজাত সংস্কার নহে। ইহা

(১) দেবী সোণামণি—মাননীয় স্যারগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জননী।

রমণীর শিক্ষার অভাবে হইয়া থাকে। স্বার্থপরতা মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; কিন্তু স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইলেও ক্রোধ লোভাদি ছয় রিপু দমন করা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, স্বার্থপরতাকেও দমন করা সেইরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবের মনে মহদ্ভাব সকল যত বিকাশ পাইতে থাকে, স্বার্থপরতা-জনিত নীচতা-সমূহ ততই দূর হইয়া যায়। ক্রমশঃ সুপ্রবৃত্তির অনুশীলনে মহত্ত্ব জন্মিয়া মানবকে পরার্থপর করে। যে অবস্থায় আত্মসুখ অবহেলা করিয়া সে পরের মঙ্গলার্থ আত্মোৎসর্গ করিতে সক্ষম হয়। নারী তখন "দেবী" হয়।

জ্ঞানানুশীলনে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত এবং চিন্তাশক্তি পরিস্ফুট হয়। মানব পরিণামদর্শী এবং হিতাহিত বিচার করিতে পারে। এই জ্ঞানানুশীলন পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের ও নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্য সর্ব্বতত্ত্বদর্শী আর্য্য ঋষিগণ বহুকাল পূর্ব্বে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" বলিয়া গিয়াছেন। এ দেশের প্রত্যেক গৃহস্থ, প্রত্যেক রমণীর অভিভাবক এবং প্রত্যেক সমাজের পরিচালক যে দিন বঙ্গমহিলার অজ্ঞানতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া তন্নিবারণার্থ বদ্ধপরিকর হইবেন, সেই দিন বঙ্গ মহিলার প্রধান অভাব বিদুরিত হইবে, দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে।

বর্ত্তমান কালে অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেছেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। আরও আনন্দের কথা এই যে, এ দেশের কতিপয় শিক্ষিতা মহিলা তাঁহাদের জাতীয় ভগিনীগণের অজ্ঞানতা দূর করিতে একান্ত যত্নবতী হইয়াছেন। এই সকল সদিচ্ছা হইতে এখন প্রায় প্রতি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত, মিশনরী মহিলাগণ কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে অন্তঃপুর শিক্ষার চেষ্টা, ঢাকায় বিধবাশ্রম, কলিকাতায় স্ত্রী-মহামণ্ডল প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার আভ্যন্তরিক অবস্থা জানেন, তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, ইহাতেও আশানুরূপ ফল হইতেছে না। পল্লিগ্রাম-বাসিনী শত শত হিন্দু বালিকা ও রমণী বর্ণমালা মাত্র শিখিয়া অথবা নিরক্ষরা হইয়া দিন যাপন করিতেছেন। প্রকৃত-রূপে অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত ইহাঁদিগের অজ্ঞানতা দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। কত মহাত্মা এবং মহাপ্রাণের আত্মোৎসর্গের ফলে যে ইহাঁদিগের জ্ঞানোন্নতি হইবে, ভবিষ্যৎ সে কথার উত্তর দিতে পারে।

লেখিকা—শ্রীমা।

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম বাধ্যতা। ইহা শিশুদিগের বিদ্যা-শিক্ষার একান্ত উপযোগী। শিশুকে শিক্ষা দিবার সময় পিতা মাতা তাহার বাধ্যতা ভিন্ন কিরূপে তাহাকে শাসনে রাখিবেন? কিন্তু উহা পিতা মাতার হৃদয়ের প্রেম ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ হওয়া আবশ্যক। সেই কারণে শিশুকে এরূপে বশীভূত করিতে হইবে যে, অবাধ্যতা কাহাকে বলে তাহা সে জানিবে না। ঐ সুকৌশল শিক্ষা দিবার জন্য ছেলের প্রতি যত আদেশ ও নিষেধ করা হয়, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উহার প্রতি অতিরিক্ত প্রভুত্ব দেখান হইবে না, সকল বিষয়ে নিজেদের সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে।

পিতা মাতার ইচ্ছা ও আজ্ঞা সহজে শিশুর উপর কার্য্য করিতে যেন সক্ষম হয়। তাহা হইলেই সে প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত উহা পালন করিবে। তাহাকে যে আদেশ ও নিষেধ করিবে, তাহা স্পষ্টরূপে মন খুলিয়া তাহাকে বলিবে, তাহাকে মিষ্টকথাপ্রিয় করিবার আশায় অত্যন্ত মধুর কথা বলিয়া তাহার মন বিগড়াইয়া দিবে না। অন্য দিকে দেখা উচিত যে, শিশুর নিজের মন তোমার বিপক্ষে হইলেও, সে যেন তোমার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিজের ইচ্ছাকে দমন করে। শিশুকে ঐরূপ বাধ্যতা শিখাইবার জন্য নিজের ইচ্ছামত অথবা যখন তখন তাহাকে আদেশ করিবে না, কেবল অতি আবশ্যক বিষয়েই তাহাকে আজ্ঞা ও নিষেধ করা উচিত। শিশুকে একটা কোনো আদেশ দিয়া ক্ষণকাল পরে তাহাকে বিরত হইতে বলা অন্যায়। সকল বিষয়ে দৃঢ় হইতে হইবে। আর যদি কখন ছেলের আবদারে বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাহার ইচ্ছামত কাজ করিতে দিতে বাধ্য হও, তাহা হইলে সে ভাবিবে তুমি নিজেই তাহাকে ঐ কাজটী করিতে বলিতেছ। শিশুকে তাহার পুষ্টিসাধনের উপযুক্ত যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। ক্রমাগত তাহাকে আজ্ঞা দিলে বা নিবারণ করিলে ছেলের মনে গোলমাল বাধে, সে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মত চলিতে অক্ষম হয়। অন্য দিকে শিশু উহাতে মনে করে যে, তুমি তাহার প্রতি অবিচার করিতেছ। আর অনেক সময় আদেশ ও নিষেধের কথা এক সঙ্গে বলাতে সে তাহার ক্ষুদ্র মনে কোন্‌টী উত্তম ও কোন্‌টী আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারে না। শিশুর মনে বিচার ও অবিচারের ধারণা এরূপ প্রবল যে, সে পিতামাতার কোন্ আজ্ঞাটী উচিত, কোন্‌টী অনুচিত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে ও অন্যায় আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করে। সুতরাং যতক্ষণ ছেলে নিজের ইচ্ছামত চলিলে তাহার নিজের বা অন্যের কোন অপকারের সম্ভাবনা নাই,

ততক্ষণ তাহাকে বিরক্ত না করিয়া ইচ্ছামত খেলিতে ও চলিতে দেওয়া উচিত। অন্য দিকে তাহার মনে এই ধারণা থাকা উচিত যে, কোন কর্ম্ম করা তোমরা অন্যায় বিবেচনা করিলে সে হাজার আবদার করিলেও কখনও তাহা করিতে অনুমতি পাইবে না। শিশুর যে সকল দোষ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে, কিম্বা বড় হইলে যে সকল বিষয়ে ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে শিখিবে, সে সকল বিষয় লইয়া তাহাকে জ্বালাতন করা উচিত নহে। ইহার মধ্যে শিষ্টাচার একটী। বাল্যকাল হইতে শিশুকে নম্র ও ভক্তিমান্ হইতে শিখাইলে, পরজীবনে উহার ফলে তাহার শিষ্টাচার ও অমায়িকতা প্রকাশ পাইবে। ছেলেকে ছোট বড় সকলকে এরূপ সমান চক্ষে দেখিতে শিখাইবে যে, শিশু উহা স্বর্গীয় আজ্ঞার ন্যায় মানিবে। উহাকে ধনী ও নিঃসম্পত্তির প্রভেদ না শিখাইয়া নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কেবল প্রবীণ, বৃদ্ধ ও জ্ঞানী লোকদিগকে মান্য করিতে শিখাইবে। শিশুর সম্মুখে কখন ঝগড়া, পরনিন্দা বা তর্ক বিতর্ক করিবে না। কোন অশ্লীল ভাব বা বাক্য তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল আত্মাকে যেন মলিন না করে।

ভক্তির পুরস্কার।

এক নগরের প্রান্তভাগে একটী গভীর বন ছিল। সেই বনের মধ্যে একটী সাধু বাস করিতেন। সেই সাধুর সম্মুখভাগ দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইতেছিল। নদীটি কখন শুষ্ক হইত না, বর্ষা ঋতুর ন্যায় সমস্ত ঋতুতেই জলপূর্ণ থাকিত। তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে একটী সুগভীর হ্রদ ছিল। এই হ্রদের মধ্যে শরৎ ঋতুর ন্যায় অন্যান্য ঋতুতেও সুগন্ধ-যুক্ত পদ্মফুল সততই ফুটিয়া থাকিত। চারি দিকে যুঁই, জবা, বকুল, বেল ফুলের অভাব ছিল না। সেগুলি বসন্ত ঋতুর ন্যায় শীত, বর্ষা প্রভৃতি সকল ঋতুতেই বিকসিত হইত। সাধুর চারি দিকে কখন কখন হরিণশিশু এবং কখন বা ব্যাঘ্রশিশু খেলা করিত। সাধু ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না। তিনি আপনার ভাবেই আপনি মগ্ন থাকিতেন। কাহারও প্রতি ফিরিয়া চাহিতেন না। শুধু নদীর শীতল বাতাস ও পদ্মাদি পুষ্পের সুগন্ধ তাঁহার আহারীয় ছিল। তিনি সময় সময় চক্ষু মিলিতেন বটে, কিন্তু বাহ্য বস্তু দেখিবার জন্য নহে, যাঁহার ধ্যানে তিনি ধ্যানস্থ ও সমাধিস্থ ছিলেন, শুধু তাঁহারই কীর্ত্তি দেখিবার জন্য। তাঁহার নিজের শরীর হইতে যে স্বর্গের বাতাস

রহিত, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার গুণেই যে তাঁহার আবাসভূমি স্বর্গতুল্য শোভা ধারণ করিয়াছে, তাহাও তিনি জানিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না তিনি আপনার ভাবেই বিভোর। হঠাৎ এক দিন এক গোয়ালিনী কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন পূর্ণ মধ্যাহ্নকাল, রবির প্রখর উত্তাপে দিগ্‌দিগন্তর দগ্ধপ্রায় হইতেছিল। গোয়ালিনীর হাতে এক ঘটি দুধ ছিল। সে প্রথমে বনের বাহিরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। বনের মধ্যে কতকগুলি শুষ্ক কাঠ রহিয়াছে দেখিয়া সে তাহা আনিবার জন্য বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে তখনও দুধের ঘটিটি ছিল। সে কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে সেই ক্ষুদ্র নদীর তীর দিয়া যাইতে লাগিল। সহসা দেখিল, একটী বিশাল বটবৃক্ষের নীচে একটি সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছেন। সন্ন্যাসীর শরীর এমন তেজোময় যে, দেখিলে বোধ হয় যেন ইহাতে কোন দিন কোনও ব্যাধি ছিল না। তাঁহার বদনমণ্ডল এমনই প্রফুল্ল যে, দেখিলে বোধ হয় তিনি চিরজীবনই সুখে কাটাইয়া আসিতেছেন। গোয়ালিনী ভক্তি-গদগদ-চিত্তে সন্ন্যাসীর দিকে ছুটিয়া চলিল। সম্মুখে একটি ব্যাঘ্র বদন বিস্তার করিয়া তাহাকে গিলিতে আসিতেছিল, সে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। একটি সর্প তাহাকে দংশন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল, সে তাহাতেও ভীত হইল না। সন্ন্যাসীর চরণতলে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ব্যাঘ্র ও সর্প তাহাকে দংশন করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল গোয়ালিনী দেখিল তাহার আর রক্ষা নাই। সে তখন "বাঁচাও বাবা" "বাচাও বাবা" বলিয়া সন্ন্যাসীর শরীরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আর কে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে? হিংস্র জন্তরা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল। তাহারা যেন কতই অপ্রস্তুত, কতই লজ্জিত, কতই দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গেল। গোয়ালিনী তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া অঁচল ভিজাইয়া নদী হইতে জল আনিয়া সন্ন্যাসীর চরণ ধৌত করিল। দুধের ঘটি তখনও সে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল। সেই ঘটি-ভরা দুধ সন্ন্যাসীকে খাওয়াইতে চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসীও আনন্দে তাহার দুধ পান করিলেন। ঘটির দুধ শূন্য হইয়া গেলে সেই শূন্য পাত্র হস্তে গোয়ালিনী গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে হইলে একটী নদী পার হইয়া যাইতে হয়, কিন্তু সে নদীতে পার হইবার নৌকা ছিল না। নিজের নৌকার অথবা অন্য কাহারও নৌকার সাহায্যে পার হইতে হইত। পর দিবস রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই গোয়ালিনী দুধের ঘটী হাতে করিয়া বাহির হইল। তাহার ইচ্ছা হইল যে, সে সন্ন্যাসী বাবার নিকট যাইয়া আবার তাঁহাকে ঐ দুধ পান করাইয়া গাভীর দুগ্ধের এবং নিজের পরিশ্রমের সফলতা

করে। কিন্তু তখন নদী পার হইবার কোনও উপায় ছিল না। অত প্রত্যূষে সেখানে কাহারও নৌকা দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু সে যে নদীর ওপারে না যাইয়া থাকিতে পারে না। সাধুর পবিত্র মূর্ত্তি বার বার তাহার মানসপটে উদিত হইতে লাগিল। সে নদীর তীরে বসিয়া সন্ন্যাসীকে ভাবিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর নিকট যে সাপ ও বাঘ আছে তাহা সে ভুলিয়া গেল। যে পরম নিধি পায়, সে কি আর ঘরে থাকিতে পারে? গোয়ালিনী পাগল হইয়া উঠিল। নদীর মধ্যে যে জল আছে, তাহা সে ভুলিয়া গেল। তাহার বোধ হইল যেন সম্মুখে শুষ্ক মাটী ও প্রশস্ত রাস্তা, সে তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া চলিতে লাগিল। যতদূর সম্ভব দ্রুতগতি হাঁটিয়া সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। কত বাধা, কত বিঘ্ন তাহার গতিরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। গোয়ালিনী সন্ন্যাসী বাবাকে দুগ্ধ পান করাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিল। এই ভাবে দিনের পর দিন চলিল। গোয়ালিনী প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী বাবাকে দুগ্ধপান করায়। কিছুকাল পরে তাহার আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করার প্রয়োজন হইল না। কারণ সে একদিন গৃহে ফিরিবার সময় সেই বনের মধ্যেই তাহার গাভীকে দেখিতে পাইল। সে গাভীকে লইয়া সেই বনের মধ্যেই বাস করিতে লাগিল। সাপ ও বাঘ যে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকও রহিল না। সে এখন দুই বেলা গাভীকে দোহন করিয়া সন্ন্যাসীকে দুগ্ধ পান করায় ও নিজেও কিছু কিছু পান করে এবং বসিয়া বসিয়া মনের আনন্দে সন্ন্যাসীকে দর্শন করে। সে আর গৃহে ফিরিয়া যায় না; গৃহে তাহার স্বামী, পুত্র, কন্যা সকলেই ছিল। প্রথম প্রথম তাহার মন তাহাদের জন্য ব্যথিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে সে বাধা কাটিয়া গেল। প্রথম প্রথম ক্ষুৎপিপাসা তাহাকে কাতর করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে তাহার কাতরতা হ্রাস পাইতে লাগিল। আহা! ভগবান্ যাহার প্রতি কৃপা করেন, তাহার মুক্তি এই ভাবেই হইয়া থাকে, এবং যে যাঁহাকে ভক্তি করে, সে তাঁহার নিকট হইতেই উপকৃত হয়।

চোখের ভাষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

পরদিন প্রভাতকালে লাবণ্যবালার অন্তঃকরণ এক প্রকার অব্যক্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সৌম্য আজ

তেমনি প্রখরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বাতাস তেমনি উত্তপ্ত হইয়াছিল, পাখীরা তেমনি করিয়া কলরব করিতেছিল। কিন্তু লাবণ্যের নিকট আজ সবই নূতন, সবই অভিনব। প্রখর রৌদ্র আজ তাহাকে চরিতার্থ করিল, পক্ষিগণ আজ তাহার কর্ণে সঙ্গীতসুধা বর্ষণ করিতে লাগিল, এমন কি উত্তপ্ত বায়ুও আজ তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিল না। তুচ্ছ বিরক্তিকর দৈনিক গৃহকার্য্যও আজ তাহাকে সন্তোষ দিতে লাগিল।

নিবিষ্টমনে সে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, এমন সময় যতীন ব্যস্ত হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া রূঢ়ভাবে বলিল, "লাবণ্য, এ কি শুন্‌ছি? সত্যই কি তুমি তোমাকে বিক্রয় করেছ?"

সহসা বজ্রপাতে লোকে যেমন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়, লাবণ্য তেমনি স্তম্ভিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সত্যই কি সে তাহাকে বিক্রয় করিয়াছে? সত্যই সে কি অর্থের লোভে আপনার দেহ যোগেশ বাবুকে বিক্রয় করিয়াছে? আপনাদের বংশের মানমর্য্যাদা ও আত্মসম্মান তুচ্ছ করিয়া সত্যই কি সে পিতৃশত্রু যোগেশ বাবুকে বরণ করিয়াছে?

হায়! কে এখন তাহাকে বিশ্বাস করিবে? কে বিশ্বাস করিবে, যোগেশ বাবু তাহাকে ভালবাসেন? কে বিশ্বাস করিবে যে, যোগেশ বাবু তাহারই জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত? কেই বা বিশ্বাস করিবে, অর্থের আকর্ষণে নয়, প্রেমের আহ্বানেই সে যোগেশ বাবুকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে?

সহসা সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। সর্পদষ্ট পথিকের মত মর্ম্মাহত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। যতীন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "লাবণ্য, তুমি শেষে টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে না? কেবল পিসিমার দোষ নয়। ছিঃ ছিঃ, তুমি কি জান না, যোগেশ বাবুই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে? লোকেই বা কি বল্‌বে?"

লাবণ্য অস্পষ্ট ভাবে বলিল, "দাদা আমি ত টাকার লোভে—"

"থাক্, আর মিথ্যা কথার আবশ্যক নাই।"

ভীত, শঙ্কিত, অপমানিত বালিকার ভ্রাতার সেই রূঢ় বাক্যের প্রত্যুত্তর দিবার সামর্থ্য রহিল না। স্নেহময় ভ্রাতার কঠিন ভর্ৎসনা সে কখন শুনে নাই। তাহার দুঃখ, শোক, অভিমান উথলিয়া উঠিল। অতি কষ্টে সে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "দাদা, তুমিও আমাকে বিশ্বাস করবে না? তোমাকে সত্য বল্‌ছি, টাকার লোভে আমি সম্মত হই নাই।"

ঘাড় নাড়িয়া যতীন বলিল, "না, লাবণ্য! এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তুমি মিথ্যা ব'লে আর তোমার পাপের মাত্রা বাড়াইও না।"

লাবণ্য আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল তাহার

গণ্ড-যুগল প্লাবিত করিয়া ঝর্‌ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কক্ষ ত্যাগ করিয়া সে চলিয়া গেল।

যতীন সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। কিরূপে এ বিবাহ বন্ধ করিয়া তাহার ভগ্নীকে লোক-নিন্দা হইতে মুক্ত করিবে, ইহাই সে ভাবিতে লাগিল। সে মনে মনে সংকল্প করিল, যে কোন উপায়ে যোগেশ বাবুকে তাড়াইতে হইবে।

অপরাহ্ণে যতীন বাহির হইল না। ঘরে বসিয়া কি করিবে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় বাহিরে শব্দ হইল। উঠিয়া দেখেন যোগেশ বাবু আসিয়াছেন।

যোগেশ বাবু জানিতেন যতীন তাঁহার উপর বড় সদয় নয়। কিন্তু কল্যকার ঘটনায় তাঁহার আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কাল যখন তিনি ভগ্নীকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার আশা হইল ভ্রাতাকেও জয় করা এবার আর কঠিন হইবে না।

হাসিয়া যোগেশ বাবু বলিলেন, "কি যতীন বাবু, কেমন আছেন?" রুদ্ধ-গভীর-কণ্ঠে যতীন উত্তর করিল, "বসুন।"

কিন্তু যোগেশ বাবু এমনি আনন্দে মাতিয়াছিলেন যে, যতীনের গাম্ভীর্য্যের তাৎপর্য্য তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "লাবণ্য আপনাকে সব বলিয়াছে বোধ হয়। আমি আশাতীত সুখ লাভ করিয়াছি। আমি একেবারে হতাশ হইয়াছিলাম।"

বজ্র-কঠিন-কণ্ঠে যতীন বলিল, "যোগেশ বাবু, বসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আপনার বিশ্বাস লাবণ্য আপনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে আপনার ক্ষমা করিতে হইবে।"

অবাক হইয়া যোগেশ বাবু বলিলেন, "যতীন বাবু, আপনি কি পাগল হইয়াছেন? লাবণ্য কোথায়?"

"লাবণ্যকে ছাড়িয়া দিন্। আমি তাহার হইয়া আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। যদি আপনি লাবণ্যকে ভালবাসেন, তবে তাহাকে মুক্তি দিন।"

"কি বল্‌ছেন যতীন বাবু, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আপনি কি বুঝিতে পারিলেন না যে সে আপনাকে ভালবাসে না, কেবল টাকার লোভে আপনাকে আপনার নিকট বিক্রয় করিয়াছে? সত্য বলিতে কি, সে আপনাকে ঘৃণা করে।"

"কি? আপনি ঠিক্ বলিতেছেন?"

"আপনাকে প্রতারণা করিবার আমার কোন আবশ্যক নাই। টাকার লোভেই লাবণ্য আপনাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।"

ভগ্ন কণ্ঠে যোগেশ বাবু কহিলেন, "তবে তাহাই হউক। আমি তাহাকে মুক্তি দিলাম।"

"লাবণ্যকে ডাকিতেছি? তাহার মুখেই আপনি শুনিবেন।"

না। তাহাকে ডাকিবার আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমি সুন্দরবনেই যাইব। মূর্খ আমি—তাই ভাবিয়া-

ছিলাম সে আমাকে ভালবাসে। যাক্, বিদেশে গিয়া তাহাকে ভুলিতে পারিব বোধ হয়।”

সহসা সশব্দে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল। অশ্রুসিক্তা বিবশা লাবণ্য সঙ্কোচ, বাধা, লজ্জা, সরম ভুলিয়া গিয়া যোগেশ বাবুর নিকটস্থ হইল।

সৈনিক তাহার ছিন্ন পতাকা পুনরুদ্ধার করিয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে শত্রুর সম্মুখীন হয়, যোগেশ বাবু হাতে প্রিয়াকে ফিরাইয়া পাইয়া সেইরূপ গর্ব্বিতভাবে যতীনের দিকে অগ্রসর হইল।

যতীন স্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। শেষে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল “লাবণ্য, সত্যই তুমি যোগেশ বাবুকে ভালবাস?”

লাবণ্য তাহার সেই নিরীহ, বিস্ফারিত সজল চক্ষু দুটী তুলিয়া একবার দেখিল। যতীন এবার আর লাবণ্যকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। কথায় অবিশ্বাস করা যায়, কিন্তু চক্ষুর ভাষার সহিত প্রতারণা চলে না।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।

প্রকৃত জীবন

মানুষ যতদিন জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম না হয়, ততদিন সে অজ্ঞ থাকে, ততদিন তাহার জীবনের বিকাশ হয় না। বিদ্যাশিক্ষা করিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না, কিম্বা রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না, এবং জ্ঞানী না হইলে “প্রকৃত জীবন লাভ করা যায় না। জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত জীবন কিরূপে লাভ করা যায় এ বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক। জ্ঞান অর্থে ভাল করিয়া জানা। যে বিষয় আমরা ভাল করিয়া জানিয়াছি, হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, আয়ত্ত করিয়াছি, সেই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হইয়াছে। জ্ঞানের অর্থ এই। এখন “প্রকৃত জীবন” লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কি করিতে হইবে? শুধু কি যে কোন একটা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলেই জীবন লাভ হইবে? তাহা হইতে পারে না। প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে সকল প্রকার জ্ঞানের আবশ্যক। সাংসারিক জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করা যায় এবং পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, প্রভৃতি পরিজনদিগের প্রতি কর্ত্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য, জনসমাজের প্রতি কর্ত্তব্য ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য

নির্দ্ধারিত হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা নিজ জীবনকে সকল প্রকার সদ্‌গুণ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া আত্মাকে প্রকৃতরূপে জানা যায় এবং পারমার্থিক জ্ঞান দ্বারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ও ভোগ-সুখ-লালসা হইতে বীতস্পৃহ হইয়া পরমাত্মাকে হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে লাভ করা যায়। এই ত্রিবিধ জ্ঞানে ভূষিত হইতে পারিলেই মানুষ প্রকৃত জীবন লাভ করে। বিদ্যালাভ করিয়া যদি কাহারও কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্যক্‌রূপে না জন্মে, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধনী হইয়া যদি কেহ অর্থের সদ্ব্যবহার না করিয়া ও অহঙ্কার বিনাশ না করিয়া স্বার্থের দাস হয়, উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে যদি বিনয়, নম্রতা ও ধীরতা না আসে, ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস না জন্মে, তাহা হইলে সে বিদ্যা, সে ধন বা সে শিক্ষার কোন ফল নাই।

প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে বিদ্বান্‌ হইতে হইবে, নম্র, বিনয়ী ও ধীর হইতে হইবে, পরোপকারী, উদার হৃদয় এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ধার্ম্মিক হইতে হইবে। এই সকল গুণে মানুষ যদি পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি দেবতা হইবেন ও পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে। ধর্ম্ম দ্বারাই মানুষ এই উচ্চ পদ লাভ করিতে সক্ষম হয়। ধর্ম্মই মানুষকে "প্রকৃত জীবন" দান করিতে পারে, আর কিছুতেই পারে না। ভক্ত সাধুগণের জীবনের অনুকরণ করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে। এ বিষয়ে নর-নারীর সমান অধিকার। বরং নারীরই ইহা প্রধান কর্ত্তব্য। যে গৃহের জননী বা ভগিনীগণ ধর্ম্মপ্রাণ, ঈশ্বরভক্ত, উদার-হৃদয়া, দয়াবতী, পরোপকারিণী ও বিদ্যা-জ্ঞানমণ্ডিতা হন, সে গৃহের সন্তানগণ অবশ্যই আপনা হইতে সেই সকল গুণের অধিকারী হইবে এবং তাঁহাদের আদর্শ জীবনের ছায়া পরিবারের প্রত্যেকের উপর পড়িবেই পড়িবে এবং তদ্দ্বারা সংসার ও সমাজ ধন্য হইবে। তাই প্রার্থনা করি, আমাদের ভারতের প্রত্যেক গৃহ এইরূপ জ্ঞানধর্ম্মমণ্ডিত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করুক, রমণী হৃদয়কে আরও সুন্দর করুক, তাহাদের গৃহ ও সংসারকে স্বর্গের শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ করুক। এখানে আসিয়া যেন মানুষের প্রাণ জুড়াইয়া যায়। ইংরাজীতে একটী গান আছে—

Home, Home, sweet Home.

There is no place like Home.

এইরূপে গৃহবাসী সকলে নিজগৃহে যেন অনন্ত সুখের আস্বাদন পাইয়া কৃতার্থ হন। "প্রকৃত জীবনের" ইহাই পরিচয়। যে নিজে সুখী, গৃহবাসী সকলেই তাহা দ্বারা সুখী হয়। জনসমাজ ও দেশবাসী তাহার জীবনের সংস্পর্শে ধন্য হয়।

আদর্শ রমণী স্বর্গগতা শ্রীমতী নীলমণি দত্ত চৌধুরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সমৃদ্ধির ক্রোড় হইতে মানুষ যখন অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্ন পরিবারের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার সকল বিষয়েই একটা অস্ফুট অভাব অনুভূত হয় এবং সে অভাব পূরণ না হইলে মনকে অত্যন্ত বিমর্ষ করিয়া তুলে। এ ক্ষেত্রে নব-পরিণীতা বধূর সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিল। শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার প্রকৃতি এমন সুন্দরভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, তিনি যখন যে অবস্থায় পড়িতেন, তখনই সেই অবস্থায় আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিতেন। কাজেই স্বামিগৃহে আত্মীয়বর্গের নিকট শীঘ্রই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। পারিবারিক কার্য্যে সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করা তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। অবশ্য তাঁহার শ্বশ্রূমাতা তখন বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলা তখনকার দিনে কিছু প্রীতিকর কার্য্য ছিল না। কিন্তু তিনি নিঃশব্দে সকল সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার এমন সহায়তা করিতেন যে, তাঁহাকে কোন কাজে অপ্রস্তুত করা দূরে থাকুক, সকলেই তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। পারিবারিক জীবনে এমন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার শ্বশুরকুলে আত্মীয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু আজীবন এরূপ সমভাবে তাঁহাদিগের সকলকার পরিচর্য্যা করিতে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। বড় মানুষের ঘর হইতে অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্ন পরিবারের মধ্যে আসিয়া পড়িলে সকলেরই মনের মধ্যে একটা দাম্ভিকতা আসিয়া পড়ে। কিন্তু, তিনি এতই অহমিকাশূন্য ছিলেন যে, সে দোষ তাঁহাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নাই।

কুমারী জীবনে পিতৃগৃহে সাংসারিক কার্য্য তাঁহাকে কিছুই দেখিতে হইত না। তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি যে, তিনি রন্ধনকার্য্য পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না, কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে রন্ধন শিখিতে হইয়াছিল। কলিকাতার বাহিরে সকল স্থানেই গৃহস্থের বধূ ও কন্যারা আজও পর্য্যন্ত রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। স্বামিগৃহে আসিয়া তাঁহাকেও রন্ধনকার্য্যে সহায়তা করিতে হইল। একবার তাঁহার এক প্রাপ্তবয়স্কা ননদিনী সাংসারিক অন্য কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাকে শীঘ্র কোন একটি রান্না রাঁধিতে বলিলেন। তিনি তখন সদ্যপরিণীতা কুলবধূ, রন্ধন কার্য্যের কিছুই জানিতেন না। কাজেই তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন, "জানি না" বলিলে তখনকার দিনে সকলেই নিন্দা করিবেন। সৌভাগ্যের বিষয়,

তখন তাঁহার স্বামীগৃহে ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে উহা রাঁধিবার সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া ননাদনীর আদেশ পালন করিলেন। অবশ্য ভোজনসময়ে তাহা যে খুব উপাদেয় হইয়াছিল, এমন কথা বলি না, কিন্তু, এই অপারদর্শিতাই ভবিষ্যতে তাঁহাকে রন্ধনবিদ্যায় একজন বিশিষ্ট শিল্পী করিয়া তুলিয়াছিল।

ইংরাজী ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাস হইতে তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইল। এই সময়ে তাঁহার স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। সেখানে কয়েক মাস অবস্থিতির পর তিনি মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। কিন্তু, মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। কিছু দিনের মধ্যেই মালদহে সরকারী উকীলের পদ শূন্য হইল। ইহাতে প্রিয়নাথ বাবুর আবেদন গ্রাহ্য হইল। তিনি মালদহে সরকারী উকীল হইয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই সেখানে যশস্বী হইয়া উঠিলেন। যে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন, তাহাতেই জয়লাভ হইতে লাগিল ও রাশি রাশি অর্থ নানাদিক হইতে আসিতে লাগিল। এইরূপে একলা সমস্ত দিক লক্ষ্য করিয়া চলা কিছু কষ্টকর ভাবিয়া তিনি ১৮৭৩ সালের গুডফ্রাইডের ছুটীতে পত্নীকে কাছে লইয়া আসিলেন। নিতান্ত বালিকা হইলেও পূর্ব্ব হইতে স্বামীকে ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। স্বামীর নিকট যাইবার জন্য কত অনুযোগ করিতেন, কিন্তু পাছে একলা থাকিয়া কষ্ট অনুভব করেন, এ কারণে প্রিয়নাথ বাবু সহজে তাহাতে সম্মত হইতেন না। শেষে যখন আসিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন, তখন উত্তরে এই মর্ম্মে পত্র আসিল যে "যদি সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ নারীগণ রাজকন্যা হইয়াও সুখ ও সমৃদ্ধির ক্রোড় হইতে উঠিয়া স্বামীর সহিত বনগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সামান্য নারী হইয়া তোমার সহিত থাকিয়া যদি কষ্টও অনুভব করিতে হয়, তাহাও সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিব। নারীর স্বামীই স্বর্গ, স্বামীই সুখ, স্বামীই সর্ব্বস্ব।" এ কথার মূল্য কত অধিক তাহা কেবল এ দেশের লোকেরাই ধারণা করিতে সক্ষম। ইতিহাসে নানা স্থানে নানা জাতির কথা দেখি, কিন্তু কই ভারতের মত এমন আদর্শ স্ত্রীচরিত্র প্রায় চোখে পড়ে না। যাহা হউক, মালদহে স্বামীর যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, সমস্তই স্ত্রীর হাতে আসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হিসাব কে রাখে? বালিশের নীচে, ভাঁড়ার ঘরে হাঁড়ির ভিতর সেই সমস্ত টাকা কড়ি রক্ষিত হইত। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, তাঁহার রাখিবার আধারের অভাব ছিল না, কিন্তু, সরলপ্রকৃতি নীলমণি পৃথিবীর কূটচক্র কিছুই বুঝিতেন না, সকলকেই আপনার মত দেখিতেন, কাজেই তাঁহার নিকট কেহই অবিশ্বাসের পাত্র ছিলেন না। সেখানে পাড়াপড়শী

দুই এক ঘর দুঃস্থ পরিবারের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের জন্যও তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। সকল লোকেই তাঁহাকে মার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত।

কিন্তু এমন সুখের সংসার পাতিয়াও মালদহে দীর্ঘকাল থাকা হইল না। দুই তিন বৎসর সে স্থানে অবস্থানের পর উভয়েরই স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিল। বায়ু পরিবর্ত্তন মানসে কিছু দিনের অবকাশ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নাগপুর যাত্রা করিলেন। সেখানে স্বাস্থ্যোন্নতি যথেষ্ট হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকালতী করিয়া পসার প্রতিপত্তি স্থাপন করাও সহজসাধ্য মনে হইল। কাজেই আবার দীর্ঘাবকাশ গ্রহণ করিয়া প্রিয়নাথ বাবু নাগপুরে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। সেখানেও অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে তিনি একজন অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার স্ত্রীর কিছু কষ্ট হইত। কতকটা আহার্য্য দ্রব্যের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন এবং কতকটা দাসদাসীর ভাষা দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় শীঘ্রই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিল, কিন্তু সে কষ্ট অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্প কালের মধ্যেই সকল বিষয়েই তিনি সেখানকার লোক হইয়া পড়িলেন। আহারের কষ্টও এক রকম স্বাস্থ্যের খাতিরে মানাইয়া লইলেন এবং স্থানীয় ভাষাও বলিতে ও বুঝিতে শিখিলেন। লোকের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে এই ভাষাই তাঁহার প্রধান সহায় হইল। কাহার হৃদয়ে কি ব্যথা আছে, কি করিয়া তাহার উপশম হয়, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য হইল। তিনি কাহারও উপর কোন আদেশ করিতে জানিতেন না, মিষ্ট কথায় জগৎ তুষ্ট, এই মহানীতির অনুসরণ করিয়া সকলকেই তিনি মিষ্ট কথায় বশ করিতেন এজন্য লোকেও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। নাগপুরে বহুদিন অবস্থিতির জন্য কয়েকটি ইউরোপীয় ও অন্যান্য বিদেশীয় মহিলার সহিত নীলমণি পরিচিতা হয়েন। ক্রমশঃ এই সমস্ত পরিবারে তাঁহার এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল যে, কিছুদিন তাঁহারা যদি তাঁহাদের বন্ধুটীকে না দেখিতে পাইতেন ত ছুটিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, এবং তাঁহার ওই বিদেশিনী বন্ধুদিগের মনে তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহার ও প্রকৃতিমধুর স্বভাব দেখিয়া এমনই একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, হিন্দুরমণী মাত্রেই তাঁহাদের বন্ধুর ন্যায় সরলপ্রকৃতি। এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত না হইলেও তাঁহাদিগেরই সরলতার পরিচায়ক। এ স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ইংরাজীতে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি সাধারণতঃ হিন্দী ও মারহাট্টি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ নিত্যই খাদ্যদ্রব্যাদির আদান প্রদান হইত। অনেকেই বিদেশীয়দিগের সহিত মেশামেশিতে তাঁহার উপর ভ্রুকুটি

করিতেন। কিন্তু, তাহাতে তিনি দৃক্‌পাত করিতেন না। সকল দেশে ও সকল কালে উদার হৃদয়ের ব্যবস্থাই এইরূপ, তবে তাহাতে তিনি কেন ক্ষুণ্ণ হইবেন ?

পরসেবায় তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। সংসারে চাকরের বাহুল্য সত্ত্বেও প্রায় সকল কাজই তিনি নিজে দেখিতেন। পরিশ্রমে তিনি কখনও কাতর হইতেন না। দিনে হউক, রাত্রিতে হউক, পরিশ্রমের পরিমাণ অল্পই হউক বা অধিক হউক, গৃহে পরিজনবর্গের সেবার্থেই হউক, বা অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যার্থেই হউক, তিনি কখনও সেবাতে বিমুখ ছিলেন না। তাঁহার দৈনিক জীবন হইতেই ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, অতি প্রত্যুষেই তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন, এবং স্নানান্তে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া পাচিকার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, এবং সেখানে সকলকে ভোজন করাইয়া বেলা ২টার সময় নিজে আহার করিতেন, তারপর কয়েক ঘণ্টা নামমাত্র বিশ্রামের সময় হইত। তখনও তিনি সংসারের হিসাব দেখিতে কিম্বা সেলাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সময়ে কখনও কখনও ছোট ছেলেমেয়েদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দিতে ও নীতিপূর্ণ ভাল ভাল কবিতা মুখস্থ করাইতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎও সেই অবসরের মধ্যেই হইত। মনুষ্যের জাগ্রত অবস্থাই জীবন, তাহা ছাড়া আর যাহা কিছু সকলই মৃত্যুর ঘনীভূত ছায়ামাত্র, এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। সেইজন্য তিনি বিশ্রামের কথা আদৌ মুখে আনিতেন না। সে যাহা হউক, এ দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন হইলে বেলা ৫টার সময় আবার পরিজনবর্গের আহারাদির আয়োজনে ব্যাপৃত হইতেন। শেষে সকলকে ভোজন করাইয়া রাত্রি ১টার সময় বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিতেন। তিনি সারাদিন খাটিয়া সারা হইতেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে "শ্রান্তি বোধ করিতেছি", এ কথা বলিতে শুনি নাই। আত্মীয়-ভোজন প্রভৃতি বাড়ীর কোন বৃহৎ ব্যাপারেও তাঁহাকে অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহার সে উদ্যম, সে উৎসাহ দেখিলে তাঁহার পরার্থপরতাকেই ধন্য ধন্য করিতে হয়। আত্মীয়বর্গ বা বন্ধুদিগের গৃহে কোন কার্য্যে তাঁহার যাইতে বিলম্ব হইলে সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু একবার তিনি তথায় উপস্থিত হইলেই শত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও যেন মন্ত্রবলে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইত, ইহাই তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরসেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বন্ধুদিগের বাড়ীতে রোগশয্যায় শায়িত কাহাকেও দেখিলে কিম্বা কেহ প্রসববেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে শুনিলে তিনি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে যাইতেন। নিজের সংসার তখন কোথায় ভাসিয়া যাইত। এ কার্য্যে

তাঁহার এমনই একাগ্রতা ছিল যে, তিনি একেবারে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া শুশ্রূষা দ্বারা রোগীকে সুস্থ করিয়া তবে গৃহে ফিরিতেন। এইরূপ সেবায় তাঁহাকে উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন কাটাইতে দেখা গিয়াছে। রোগী রোগশয্যায় ছট্‌পট্ করিতেছে, কিন্তু তিনি নিকটে গেলেই একেবারে শান্ত। মধুরপ্রকৃতি শান্তস্বভাবা নীলমণি বাস্তবিকই রমণীশ্রেষ্ঠ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সহিত তুলনায় এ ক্ষেত্রে কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি যে কেবল আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের সেবায় অপার আনন্দ অনুভব করিতেন, এমন নহে, অপরিচিত লোক, ইতর জন্তু, পশুপক্ষী, গোবৎসাদি সকলকেই তাঁহার কৃপাকণা বিতরণ করিতেন। নাগপুরে টাঙ্গাগাড়ীতে ঘোড়ার পরিবর্ত্তে বয়েল (বলদ) জোতা প্রশস্ত। তাঁহারও এক জোড়া বয়েল ছিল। স্বামী ও পুত্রকে সকালে আদালত ও স্কুলে পঁহুছাইয়া আসিলে তিনি "আহা, বয়েল বড় খাটিয়াছে" বলিয়া তাহাদিগকে খড় খাইতে দিয়া শ্রমাপনোদন জন্য তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন। অধিক দিনের কথা নহে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে যখন তাঁহার গাড়ী ও ঘোড়া পাঠান হইল, তখন বয়েল রাখা অনাবশ্যক বিবেচনায় ছেলেরা উহাদিগকে বিক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তিনি এমনই দয়ার্দ্রচিত্তা ছিলেন যে, কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। শেষে যখন তাঁহার মত লইয়া উহা বিক্রয় করা হইল, তখন তিনি মনের আবেগে এতই অধীর হইয়া উঠিলেন যে, কোন মতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। নাগপুরে একবার তাঁহার বাড়ীতে সেখানকার এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া প্রভূত-ধনশালিনী রমণী ভাড়াটিয়া ছিলেন। তাঁহার অভিভাবকের মধ্যে কেহ কোথাও ছিল না। এক দিন তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, আমার হঠাৎ অসুখ হইলে কে আমাকে দেখিবে? তাহাতে নীলমণি অম্লানবদনে বলিলেন, "যখন আমি আছি, তখন তোমার ভাবনা কি? আবশ্যক হইলেই আমি ছুটিয়া আসিব।" নারীহৃদয় স্বভাবতঃই কোমল, কিন্তু এ পুণ্যবতীর হৃদয় যে কি উপাদানে গঠিত, তাহা স্থির করা সুকঠিন। পরকে ভালবাসিবেন, নিজ হৃদয়ের স্বর্গীয় সুগন্ধ অপরকে বিলাইয়া আত্মতুষ্টি করিবেন, ইহাই তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব।

নারীর পতিই স্বর্গ, পতিই একমাত্র গতি, এ ধারণা তাঁহার হৃদয়ে চিরকাল বদ্ধমূল ছিল। স্বামীর কি অভাব, স্বামীর আহার হইল কি না, স্বামী বিমর্ষ কেন, এ সমস্ত তিনি প্রকৃত দার্শনিকের মত দেখিতেন ও তাহার প্রতিকারে সর্ব্বদা যত্নবতী হইতেন। সংসারে শতকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও ছুটিয়া আসিয়া সর্ব্বদা স্বামীর তত্ত্ব লইতেন। বস্তুতঃ এতাদৃশী পতিপ্রাণা রমণী যাঁহার সংসারে বিরাজ করেন, তাঁহার সংসার প্রকৃতই স্বর্গ। ইদানীং

তাঁহার স্বামীর স্বাস্থ্য তত ভাল ছিল না, কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণীর গুণে ও সেবায় কচিৎ তাঁহাকে শয্যাগত হইতে দেখা গিয়াছে। প্রকৃত ভালবাসার বিনিময় জগতে নিতান্ত বিরল হইলেও হিন্দুর নিকট উহা একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। স্ত্রী যেমন স্বামীকে দেখিয়া "তুহুঁ তুহুঁ" (তুমি তুমি) করিতেন, ও তদ্রূপ স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। প্রতিদান না থাকিলে ভালবাসায় মাধুর্য্য থাকে না, দুইটি হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত অনুক্ষণ অনুভূত হইত বলিয়াই তাঁহাদিগের পরস্পরের ভালবাসা অতুলনীয় ছিল।

তাঁহার আর একটি বিশেষ গুণ ছিল, তাহা বৈরাগ্য। বেশবিন্যাসাদির প্রতি তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না; ভোজ, আমোদ বা নিমন্ত্রণে পারতপক্ষে তিনি যাইতে চাহিতেন না। যদি কখন অনুরোধ উপরোধে যাইতে সম্মত হইতেন, সামান্য পোষাকেই যাইতেন। আহারাদির বিষয়েও ঐরূপ নিয়ম লক্ষিত হইত। তিনি বলিতেন, "মাটীর দেহ মাটীতে মিশাবে, তবে তাহার জন্য কি যত্ন করিব?"

পরিচিত বন্ধুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার উদার মত অনেকেরই জানা ছিল। নিজে হিন্দু হইলেও তিনি অপর ধর্ম্মের কখনও নিন্দাবাদ বা বিপক্ষতাচরণ করেন নাই। আচারসম্মত আহ্নিক পূজাদি করা কিছুই তাঁহার ছিল না। এজন্য তাঁহাকে আত্মীয়াদিগের নিকট হইতে কটূক্তিও শুনিতে হইয়াছে, কিন্তু যখনই এ বিষয়ে কথা উঠিত, তখনই তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিতেন, গৃহে যাহার পতিদেবতা বর্ত্তমান, তাহার আবার অন্য দেবার্চ্চনা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে। গুরু করণ বা মন্ত্র লইবার কথা উঠিলে তিনি বলিতেন, "স্বামী আমার পরমগুরু, তাঁহার নিকট বালিকা-বয়স হইতে যে শিক্ষা ও দীক্ষায় পরিপুষ্ট হইয়াছি, তাহা অন্য কাহারও নিকট হওয়া সম্ভব নহে।" কখনও কখনও তাঁহার প্রৌঢ়া আত্মীয়াদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে তীর্থযাত্রায় প্রণোদিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার মনের এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, "সর্ব্বমিদং ব্রহ্মময়ং জগৎ", তবে আর তীর্থযাত্রায় ফল কি? ঘরে বসিয়া স্বামি সেবায় রত বা তীর্থযাত্রার ফল লাভ করিতে ত পারি, তবে আর সুদূর প্রবাসে যাইবার আবশ্যকতা কি? হিন্দুর গৃহে যে রমণী প্রৌঢ়াগণের সমক্ষে এই কথা বলিতে পারেন, তাঁহার ধর্ম্মমত কতদূর উদার ও উন্নত তাহা সহজে বুঝা যায়।

শেষ জীবনে তাঁহার স্বাস্থ্য নিতান্ত ভগ্ন হইয়াছিল। ঐ ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই তিনি সমস্ত কার্য্য দেখিতেন। পরিশেষে গত ১২ই মার্চ্চ তিনি পাণ্ডুরোগে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ভিষগ্‌বর্গের চেষ্টার কোন ত্রুটি হইল না। কিন্তু হায়! ভাঙ্গা ঘরে বন্যা আসিলে তাহার

গতিরোধ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। ক্রমে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল এবং তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শেষে ইংরাজী ১৯১২ সালের ১৫ই মার্চ্চ, বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২রা চৈত্র, শুক্রবার, তাঁহার অমর আত্মা তামস রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মর্ত্তধাম পশ্চাতে রাখিয়া অনন্তের পথে অগ্রসর হইলেন।

"এক বিন্দু প্রাণ অনন্তের সনে মিশিয়া
লভিল অনন্ত প্রাণ,
বাজিল স্বরগে বিজয়দুন্দুভি, গাহিল
দেবতা বিজয়গান।"

অসময়ে তাঁহার অমূল্য জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু যে শোকাগ্নি তিনি স্বামী ও পুত্রকন্যার হৃদয়ে জ্বালিয়া গেলেন, তাহা চিরকালই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিবে। বড় দুঃখেই অন্ধ কবি গাহিয়াছিলেন,

"সাঙ্গ না হইল হায় জীবনের ব্রত,
ডুবিল দেহের তরি ফুরাল সকলি।"

এখন তাঁহার অমর আত্মা স্বর্গে চির-শান্তি লাভ করুক, এই আমাদিগের করুণ প্রার্থনা।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, বি, এ,
৩ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উন্মত্তের প্রলাপ।

(আবৃত্তি)

কোন স্থানে জনৈক সহজজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ দুরদৃষ্টবশতঃ এক সময়ে বাতুলাশ্রমে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহারই আক্ষেপোক্তি।

স্থান—কারাগার। কাল—প্রাতঃ।

(কারাধ্যক্ষের প্রবেশ)

উন্মত্ত পুরুষ।—

কারাধ্যক্ষ—কারাধ্যক্ষ,
আমিত বাতুল নই—
কেন মোরে রেখেছ ঘেরিয়া,
কেন মোর এতেক যন্ত্রণা?
পলে পলে শুষিছে শোণিত,
কি উত্তাপ হৃদয়কন্দরে—
কি চিন্তা মস্তকে মোর—
কেমনে বুঝাব আমি!
যাচি যুক্তকরে—
ছেড়ে দাও,
চলে যাব দূরদূরান্তরে,
নরে না দেখাব মুখ।

*　　*　　*

কারাধ্যক্ষ!
আমি কি পাগল?
কে বলে উন্মত্ত মোরে?
শত্রু তারা—পশু তারা—
ঘৃণ্য নীচ স্বার্থের সেবক,
কহে মোরে বিকৃতমস্তক!
সুস্থ আমি—স্থির আমি—
আমি অচঞ্চল,

স্মৃতি মোর অভ্রান্ত উজ্জ্বল,
তবে কেন বল মোরে—পাগল!
পাগল!

* * *

কি ভীষণ কারাবাস,
অদৃষ্টের তীব্র উপহাস!
মৃত্যু যে বরং শ্রেয়ঃ!
কি কষ্ট এ কঠোর পরাণে,
কি দারুণ যাতনা জীবনে—
অহরহ সহি নিরজনে—
কেমনে তা বুঝাব তোমায়!
কারাধ্যক্ষ—কারাধ্যক্ষ,
মেরে ফেল তুমি—
দাও হৃদে হানি তরবার,
যাতনার হোক অবসান।

* * *

শুন ওই অশরীরী বাণী,
হের ওই উষার বিকাশ,
কি মধুর—শান্ত স্নিগ্ধ পূরব
আকাশ!
মরি মরি,
কি সুন্দর ফুল,
কিবা গন্ধ মনোহর—আবেশে
আকুল,
ছোটে অলি, মলয়ার বায়,
কূজনে কোকিল,
পাপিয়ার তানে স্তব্ধ বিশ্ব—
স্তব্ধ চরাচর!

* * *

একটী সুন্দর মুখ ভাসে মোর মানস-
নয়নে—
আনে স্মৃতি দূর এক অতীতের ছবি।
এমনই সুন্দর এক বসন্তপ্রভাতে,
প্রিয়া মোর বুকে রাখি শির,
বলেছিল ধরি দুটী কর—
জীবনে মরণে রব বাঁধা পরস্পর!
অহো! অকৃতজ্ঞ আমি—
গেছে সেত স্বরগে হাসিয়া,
আমি হেথা ক্ষিপ্ত, ক্লিষ্ট, পতিত, দুর্ব্বল,
উর্দ্ধ নেত্রে চেয়ে আছি আবেগে বিহ্বল।

* * *

ছিঃ ছিঃ—আবার সে স্মৃতি—
দূর হোক অতীতের করুণ কাহিনী,
নিভে যাক্ পুরাতন হাসি!
কারাধ্যক্ষ!
এই সব দুশ্চিন্তা নিয়ত,
জাগে যার মানসে প্রবল,
সেই ত পাগল।
—দিনে দিনে হ'য়ে পড়ে আপনি পাগল—
জল স্থল তার চোখে সব শূন্যময়!

* * *

ও কি! ও—
উন্মাদ এক কেন আসে ধেয়ে!
রক্ত মুখ—ঘূর্ণিত নয়ন,
বিকট দশন—রুক্ষ কেশ,
ধূলিধূসরিত কায়—
ওহো! কে আছ কোথায়—
ধর—ধর—
শান্ত কর পাগলের খেলা।

* * *

কারাধ্যক্ষ—কারাধ্যক্ষ!
পালাও—পালাও—

এই সব পাগলের সাথে,
তুমিও পাগল হ'য়ে যাবে!
আছে তব প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী,
আছে তব গৃহে ত তনয়—
সুকুমার দুগ্ধপোষ্য নবনী-কোমল?
তবে আর থেকো না এখানে—
পালাও—পালাও—
বাতুলের মেলা হ'তে দূরে সরে যাও!

* * *

আহা! আমার সে শিশু—
কি সুন্দর কেশগুচ্ছ তার,
কিবা গণ্ড—কি চিবুক—কিবা ওষ্ঠাধর—
সকলই সুন্দর!
আমার সে হৃদয়ের আলো!
বাছা মোর আছে ত গো ভাল?
আছে সেত জীবিত ধরায়?
উহুঃ—কি যাতনা—
কেড়ে নিল কে আমার ধন!
ছিঁড়ে গেছে জীবন-বন্ধন!

* * *

আবার—আবার!
কে বলে পাগল নই—আমিই পাগল!
কারাধ্যক্ষ,
আমিই পাগল,
বাঁধ মোরে কঠিন নিগড়ে,
যত চাই ভুলিবারে—তত মনে পড়ে!
(ওহো) এত জ্বালা ভুলিব কেমনে!!

(রোদন)

শ্রী—

প্রজ্ঞা।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ।

১। শরীরের চক্ষু কত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা আলোকিত হইলে অসীম জগৎ প্রকাশিত হয়, জগতের শোভা, সৌন্দর্য্য, বিচিত্রতা, সব দৃশ্যমান হয়। চক্ষু বিকৃত, বিনষ্ট বা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে সব শূন্য ও অদৃশ্য।

২। আত্মার চক্ষু প্রজ্ঞা। ইহা দ্বারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরাজ্য প্রকাশিত হয়, সত্য, রাজ্যের শোভা, সৌন্দর্য্য, বিচিত্রতা দৃশ্যমান হয়। প্রজ্ঞা বিনষ্ট বা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে সত্য-জগৎ শূন্য ও অদৃশ্য।

৩। আমরা অনেক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারি, অনেক শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিতে পারি, অনেক বিষয়-রাজ্যের ব্যাপার ও প্রকৃতিরাজ্যের দৃশ্যাবলীর সহিত পরিচিত হইতে পারি, কিন্তু প্রজ্ঞা না থাকিলে চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কিছুরই সার গ্রহণ করিতে পারি না, কিছুই জীবনের উপকারে লাগে না। মহাত্মা কাউপার Knowledge ও Wisdom এই দুয়ের কেমন সুন্দর প্রভেদ দেখাইয়াছেন। পুস্তকস্থ বিদ্যা অনেক থাকিলেও তাহা গৃহের জঞ্জাল, জ্ঞান সে সকলকে সুসজ্জিত ও সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া ব্যবহারোপযোগী

করিয়া দেয়। এই Wisdom প্রজ্ঞা নামে অভিহিত হইতে পারে। প্রজ্ঞা যদি আত্মার চক্ষু হয়, সকলেরই আছে, কেবল বিকাশের ভিন্নতা। প্রাচীন শিক্ষা ও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রজ্ঞাকে বিকাশ করে না, বিদ্যার বোঝা চাপায়। প্রজ্ঞাতে শক্তি, আনন্দ, সৌন্দর্য্য বিধান করে।

৪। প্রজ্ঞার কার্য্যের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিব। উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচনের সংবাদ যাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রজ্ঞার আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া অবশ্য পুলকিত ও উপকৃত হইয়াছেন। "আত্মাকে জানিলে সকল লোক প্রাপ্তি হয়, সকল কামনা সিদ্ধ হয়।" এই কথা অসুররাজও শুনিলেন, দেবরাজও শুনিলেন। ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উভয়ে গেলেন। ব্রহ্মা যখন শরীরদর্পণে আত্মদর্শন করিতে বলিলেন, তখন বিরোচন স্থূলবুদ্ধি বশতঃ শরীরকেই আত্মারূপে বুঝিয়া অসুররাজ্যে জড়বাদের প্রচার করিলেন এবং সকলে মৃত্যুর স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন।

কিন্তু দেববুদ্ধি ইন্দ্র প্রজ্ঞাপ্রভাবে শরীর হইতে মন, মন হইতে স্থিরচিত্ত, স্থিরচিত্ত হইতে ক্রমে আত্মার আত্মা অন্তরাত্মাকে জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইলেন এবং দেবরাজ্যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া অমৃতের পথ দেখাইলেন।

বরুণ-ভৃগু সংবাদে আছে, যাঁহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন, যাঁহাতে জীবিত, প্রলয়কালে যাঁহাতে অবস্থিতি করে,তিনিই ব্রহ্ম। ভৃগু প্রথমে অন্ন, পরে মন, পরে প্রাণ, পরে জ্ঞানকে এই ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিয়া অবশেষে আনন্দময় ব্রহ্মকে সকলের মূলরূপে দর্শন করিলেন।

জাবালি মুনি শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, যেখানে কেহ দেখিতে পায় না, এমন স্থানে একটী ছাগ বধ করিয়া আইস। কেহ পাহাড়ে, কেহ জঙ্গলে, কেহ নির্জ্জন-ক্ষেত্রে সেই কার্য্য সাধন করিয়া আসিল। কিন্তু এক শিষ্য সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও নির্জ্জন স্থান পাইল না, ঘোর নির্জ্জনেও কাহার চক্ষু সম্মুখে দেখিয়া ভীত হইয়া গুরুর নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল। গুরু তাহাকেই বিদ্বান্ ও প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

"যাহাদের চক্ষু আছে, তাহারা দেখুক, যাহাদের কর্ণ আছে তাহারা শুনুক" যিশু উপদেশ দিবার সময় এই কথা বারম্বার বলিয়াছেন। চক্ষু কর্ণ ত সকল মানবেরই আছে, কিন্তু সকলে কি দেখে, সকলে কি শুনে? প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিরাই দেখিতে ও শুনিতে পায়।

এই প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়—তাই সব সাধুজনের এক কথা। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্য ঋষি হিমালয়কন্দরে ধ্যানমগ্ন হইয়া প্রজ্ঞা-চক্ষুতে যাহা দেখিয়াছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর এক মার্কিন জ্ঞানী ইরিহ্রদের তটে বসিয়া তাহাই দেখিতেছেন, তাহাই ভাবিতেছেন। ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য কি আছে?

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিলাতে ভারতীয় রাজস্ব ও কারেন্সি কমিশনের সমক্ষে বে-সরকারী সাক্ষ্য—বিলাতের ভারতীয় রাজস্ব ও কারেন্সি কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য অনারেবল্ রাজা হৃষীকেশ লাহা, সি, আই ই, অনারেবল্ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, অনারেবল্ ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মিঃ জে, সি, সরকার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ প্রভৃতির সাক্ষ্য দিবার ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে।

বৌদ্ধ স্মৃতি—মহাভারতে বর্ণিত নরপতি শিবি আশ্রিত কপোতের প্রাণরক্ষার জন্য আপনার গাত্র হইতে মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের এই স্মৃতি-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়া লণ্ডনের যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছে। ভারতের কীর্ত্তি ভারতে থাকিলেই ভাল হইত।

শিশু-প্রদর্শনী—সম্প্রতি আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্ক নগরে এক শিশু-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এক শত মাতা আপন আপন শিশুদিগকে লইয়া সেই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বহু সহস্র মাতা সেই শিশুদিগকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ডাক্তার ডেনেট শিশুদিগের মুখের ভাব, বক্ষঃস্থল, মেরুদণ্ড, হস্ত, পদ, জ্ঞান, উচ্চতা, তেজস্বিতা ও স্বভাব প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া নম্বর দিয়াছিলেন। যে সকল শিশু অধিক নম্বর পাইয়াছিল, তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

এক বৎসর একটী শিশু পুরস্কারের অযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। তাহার মাতা বৎসর কাল তাহাকে এরূপ পুষ্টিকর সামগ্রী খাওয়াইয়াছিলেন ও তাহার ব্যায়ামের এরূপ আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন যে, পর বৎসর সেই শিশু প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

ইউরোপের জননীগণ সন্তানগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য কত চেষ্টা ও উপায় অবলম্বন করেন, আমাদের পাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বোম্বায়ে বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রদানের চেষ্টা—বোম্বাইয়ের কতিপয় ধনশালী ব্যক্তি বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রদানের জন্য এক কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। নগরে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে প্রতি বৎসর কত শিশু প্রাণ হারাইতেছে। কত দরিদ্র অর্থের অভাবে শিশুদিগের দুগ্ধের ব্যবস্থা করিতে পারে না। এই কোম্পানী এইরূপ দরিদ্রদিগকে অবস্থানির্ব্বিশেষে

অল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে দুগ্ধ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাঁদের এই সাধু চেষ্টা সফল হউক ও সর্ব্বত্র ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

হাঁসপাতালে পাঠাগার—কলিকাতার মেডিকেল কলেজে শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় রোগীর চিকিৎসা হইয়া থাকে। শ্বেতাঙ্গ রোগীদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত এখানে একটি পাঠাগার আছে, কিন্তু দেশীয় রোগীদিগের জন্য এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণের উদ্যোগে এখানে দেশীয় রোগিগণের নিমিত্ত একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শোকসংবাদ—আমরা ব্যথিতহৃদয়ে পুনরায় ভারতের কয়েক জন সুযোগ্য সন্তানের চির-বিয়োগসংবাদ প্রদান করিতেছি। ভারতীর সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী ও কংগ্রেসের জনৈক উৎসাহী সভ্য, মিঃ জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় গত ১৯শে বৈশাখ, রাত্রি নয় ঘটিকার সময়, দুই কন্যা এবং এক পুত্র ও বৃদ্ধা পত্নীকে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা। মহর্ষি ইহাঁর মধুর স্বভাবের জন্য ইহাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভগবান্ এই শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তি বিধান করুন।

প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা অভিধানকার ও বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিগত ২৭শে এপ্রিল অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। হৃদ্‌রোগেই ইহাঁর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।)

১৩ অধ্যায়।

মাসিডন্ দেশের সহিত ও আণ্টিওকসের সহিত রোমের যুদ্ধ

১। ৫৫০ রোমাব্দে কার্থেজের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে মাসিডনের সহিত রোমের সংগ্রাম হয়।

২। হানিবল যখন ইটালী জয় করেন, তখন মাসিডনাধিপতি ফিলিপ তাঁহার আনুকূল্য করাতে এই যুদ্ধ ঘটে।

৩। সাইনোসিফেলির রণক্ষেত্রে খৃঃ পূঃ ১৯৬ অব্দে রোমানেরা জয়ী হইল। পরে ফিলিপ সন্ধির প্রার্থনা করাতে রোমানেরা তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে বলিল, গ্রীসের কোনও দেশ তাঁহার অধীন থাকিবে না।

৪। এই যুদ্ধের অনতিবিলম্বে ৫৬২ রোমাব্দে সিরিয়াধিপতি মহাবীর আণ্টিওকসের সহিত রোমের যুদ্ধ হয়।

হানিবল ঐ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে সমরোৎসাহিত করিবার তিনিই প্রধান কারণ।

৫। আন্টিওকস, রোমীয় সেনাপতি লুসস্ সিপিওর নিকটে পরাভূত হয়েন এবং পরিশেষে যেরূপ সন্ধি-বন্ধনে বদ্ধ হয়েন, তাহাও তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অযশস্কর হইয়াছিল।

৬। মাসিডনের সহিত রোমের সন্ধি ২০ বৎসর ছিল। পরে মাসিডনাধিপতি ফিলিপ যুদ্ধের পুনরুদ্যোগ করেন এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র পার্সিয়স্ খৃঃ পূঃ ১৭১ অব্দে রোমানদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু এই শেষ রাজা পিওনার ভয়ঙ্কর যুদ্ধে এমিলিয়স কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। ইহাতে ৩০ হাজার মাসিডনের সৈন্য বিনাশ পায়। রোমানেরা অগাধ ধন লুণ্ঠন করিয়া লয় এবং মাসিডন রাজ্য এককালে ধ্বংস হইয়া যায়।

১৪ অধ্যায়।

তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ।

১। খৃঃ পূঃ ১৪৫ অব্দে ও ৬০৭ রোমাব্দে কার্থেজের সহিত আবার রোমের যুদ্ধ হয়। ইহারই নাম তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ।

২। কার্থেজিনিয়ানেরা সন্ধির প্রস্তাব ভঙ্গ করিয়া রোমের মিত্র নিউমিডিয়াধিপতি মেসেনেসার সহিত বিবাদ করিয়াছিল, ইহাতেই যুদ্ধ ঘটে। এই সংগ্রাম চারি বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। পরে পরসিয়স্ কর্ণেলিয়স সিপিও কার্থেজ নগর অধিকার করিয়া উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

৩। কার্থেজিনিয়ানদিগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই স্বদেশরক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে কোন মতে রক্ষার উপায় না দেখিয়া মাতৃভূমির চিতানলে আপনারাও প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে কার্থেজের সমুদায় ক্ষমতার নির্ব্বাণ হইলেই পিউনিক যুদ্ধের শেষ হইল। (ক)

(ক) কার্থেজ, এক শত বৎসর পর্য্যন্ত রোমের ভয়ঙ্কর প্রতিযোগী হইয়াছিল এবং ৭০৮ বৎসর অবস্থিতি করিবার পর ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই ঘটনাটী ৬০৮ রোমাব্দে, কন্সলদ্বারা রাজ্যশাসনের ৩৬৩ বৎসর পরে ও খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কার্থেজ নগরে বহুলোক বাস করিত। ইহার পরিধি ২৪ মাইল ছিল। অনেক জাতির সহিত ইহার বাণিজ্য ব্যবসায় চলিত এবং ইহা সুশোভন বৃহৎ অট্টালিকাসমূহে সুশোভিত ছিল। কার্থেজ ১৭ দিবস অগ্নিময় ছিল। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, রোম-সেনাপতি সিপিও ইহার ধ্বংসাবলোকনে চক্ষুর জল নিবারণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয় লোকদিগের হৃদয়ে কিছুমাত্র শোক বা করুণ ভাবের উদ্রেক হয় নাই। কারণ রোমীয় মহাসভা ইহার উচ্ছেদ সংবাদ পাইয়া হর্ষোন্মত্ত হইয়া মহাড়ম্বরে রাজ্যমধ্যে ধুমধাম ও কেলি কোলাহল করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা আরও প্রচার করিলেন যে, কার্থেজ কখনও পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইতে পারিবে না এবং যে ব্যক্তি সেরূপ ইচ্ছা করিবে, সে সকলের নিকট ঘৃণার্হ ও দণ্ডার্হ হইবে। কার্থেজ বর্ত্তমান টিউনিস্ নগরের নিকটে ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষোপরি মেল্কা নামে এক ক্ষুদ্রদ্বীপ বিদ্যমান আছে।

১৫ অধ্যায়।

করিন্থ ও পর্টুগালের যুদ্ধ।

১। করিন্থনগরে রোমের এক দূত বাস করিত। ঐ নগরের লোকেরা তাহার প্রতি কুব্যবহার করাতে রোমানদিগের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ হয়।

২। এই যুদ্ধে রোমকেরাই জয় লাভ করিয়াছিলেন। করিন্থিয়ানদিগের অধিকাংশ লোক হত হইল এবং তাহাদিগের রাজধানী ভস্মসাৎ হইল।

স্পেনে রোমানদিগের যুদ্ধ (খৃঃ পূঃ ২০০-১৩৩) ৬০ বৎসরে অধিক চলিয়াছিল। পর্টুগালদেশীয় ভেরিএথস নামক এক ব্যক্তিকে এই যুদ্ধে আপনাদিগের সেনাপতি করিয়া স্পেনবাসীরা অতুল সাহসের সহিত রোমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু রোমানেরা সম্মুখ যুদ্ধে উক্ত বীরপুরুষকে কোন ক্রমে পরাস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে যখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার তিন জন বন্ধুকে উৎকোচ দিয়া তাঁহার বধ সাধন করিল। ইহাতে ৬০৮ রোমাব্দে পর্টুগাল দেশ রোমের অধীন হইল। ইহার পরেই স্পেনে নিউমানসিয়ার সহিত যুদ্ধ হয়।

১৬ অধ্যায়।

স্পেনদেশস্থ নিউমানসিয়ার ধ্বংস।

১। কার্থেজ বিনাশিত হইবার ষোড়শ বৎসর পরে নিউমানসিয়া উচ্ছেদদশায় পতিত হয়।

২। কার্থেজ-বিনাশক সিপিও এ যুদ্ধেও প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

৩। এই সংগ্রাম চারি বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, পরে তথাকার লোকেরা নগরপরিখার মধ্যে কিছুকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া যখন স্বাধীনতা লাভে একান্ত নিরাশ হইল, তখন আপনারাই আপনাদিগের প্রাণনাশ করিল।

৪। রোমকেরা নিউমানসিয়া উৎখাত করিয়া ফেলিল এবং স্পেনদেশ (খৃঃ পূঃ ১৩৩ অব্দে) রোমের এক প্রদেশ হইল।

অর্থের সহচর।

(১)

রহে যতক্ষণ মধু ফুল্ল পুষ্পদলে,
অলি করে গুণগান, করে কত মধু পান,
কুসুমে গুঞ্জরি উড়ে কত কুতূহলে,
রহে যতক্ষণ মধু ফুল্ল পুষ্পদলে।

(২)

নিঃশেষিত হ'লে মধু, উড়ি' চ'লে যায়,
অন্বেষে নব প্রসূন, থেমে যায় গুণগুণ,
আবার আসিয়া বসে অন্য ফুলগায়,
নিঃশেষিত হ'লে মধু, উড়ি' চ'লে যায়।

(৩)

তেমতি ধনীর কাছে ধনের আশায়
ছুটে আসে কত জন, সখা, মিত্র, বন্ধুগণ,

তোষামদ করে সবে, কত গুণ গায়,
তেমতি ধনীর কাছে ধনের আশায়।

(৪)

হয় ধনী পুনরায় যবে অর্থহীন,
ত্যজিয়া বিপদ পরে, পলায় অন্যের দ্বারে,
উপেক্ষা করয়ে সবে ব'লে তা'রে দীন,
হয় ধনী পুনরায় যবে অর্থহীন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূতন সংবাদ।

১। সিমলা শৈলে পথের ধূলা বিনষ্ট করিবার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপালিটি ২০০০ টাকা ব্যয় করিয়া তৈল ক্রয় করিয়া পথে ঢালিয়া দিবেন, এইরূপ শুনা যাইতেছে।

২। কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ সাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচারার্থ সাহিত্য পরিষদের হস্তে বার্ষিক দেড় শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৩। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ধলভূম নামক স্থানের কোন কোন স্থলে স্বর্ণ-রেণুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যাইতে পারে।

৪। শুনা যাইতেছে, সম্প্রতি কানাডা দেশের অটোয়া নগরে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত পুলিশ বিভাগে দুই জন স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা রেলযাত্রী স্ত্রীলোকদিগের সহায়তা করিবেন ও অসহায়া বালিকাদিগকে রক্ষা করিবেন।

৫। বোম্বাই নগরে গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে।

৬। বড় লাট লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ৪০০০৲ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

৭। আগামী ১৯১৬ সালের প্রারম্ভে কলিকাতার গড়ের মাঠে এক বিরাট প্রদর্শনী হইবে। প্রায় ৩।০ শত বিঘা জমির উপর ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে, এইরূপ শুনা যাইতেছে।

৮। বিগত ২রা মে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে পরলোকগত ডাক্তার দুকুড়ি ঘোষ মহাশয়ের ও তাঁহার পত্নীর আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ঘোষ ২রা এপ্রেল ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী যখন শুনিলেন স্বামীর জীবনের আর আশা নাই, তখনই তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরেই সাধ্বী পত্নীর আত্মা স্বামীর সহিত অনন্ত ধামে অনন্ত মিলনে মিলিত হয়। ইহাকেই যথার্থ সহমরণ বলা যায়। ইহাই প্রকৃত প্রাণের যোগ।

৯। বার্লিন নগরের ডাক্তার সবার-ম্যান চির-যৌবন লাভের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি বলেন, রেডিয়াম নামক বহুমূল্য ধাতু মনুষ্যের ধমনীতে সজীবতা আনয়ন করে, সুতরাং মানুষ ইচ্ছা করিলেই অতি সহজে চির-যৌবন লাভ করিতে পারে।

১০। ফরাসী দেশে মৎস্য ধরিবার জন্য একরূপ টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৎস্যগণ জলে বিচরণ করিবার সময় একরূপ শব্দ হয়। ঐ শব্দ জল-মধ্যে রক্ষিত তার দ্বারা তীরে রক্ষিত কলে প্রতিধ্বনিত হইলে তারে যে একটা বোতাম সংযুক্ত থাকে, সেইটি টিপিয়া দেওয়া হইলেই বিস্ফোরক দ্রব্য বিস্ফুরিত হইয়া মৎস্যকে বিনষ্ট করে।

১১। মিঃ বিহারী লাল গুপ্ত মহাশয় বরোদা রাজ্যের অস্থায়ী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম সম্প্রতি তিনি এই পদে স্থায়ি-রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১২। সম্প্রতি বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট জেমস্ বোর্ডিলনের মৃত্যু হইয়াছে। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট-গণ একে একে কালের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছেন। এই সে দিন বেকার সাহেব গিয়াছেন, আবার বোর্ডিলনও যাইলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন।

১৩। সম্প্রতি আমেরিকার হাউয়ার্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রেট ফিজ মিসর দেশের পিরামিডের অভ্যন্তরে দুইটী মন্দিরের আবিষ্কার করিয়াছেন।

কলিকাতার অন্ধ-বিদ্যালয়ে লর্ড কার-মাইকেল মহোদয় আড়াই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সমালোচনা।

স্নেহময়।—

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ প্রণীত।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস, মূল্য ॥৵০।

গল্পটী অতি সুন্দর, পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। কলুষিত-চরিত্র পঙ্কিল নারীজীবন দ্বারা সোনার সংসার কিরূপে ছারখার হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত অতি সুন্দর-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানুষ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিলে তাহার ফল কিরূপ বিষময় হয় ইহা পাঠে সে জ্ঞান জন্মিবে। আমরা প্রত্যেক গৃহিণীকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি, ইহা পাঠে তাঁহাদের প্রভূত কল্যাণ হইবে। লেখিকার লিখিবার শক্তি আছে। এই পুস্তকখানি বোধ হয় তাহার প্রথম রচনা, এজন্য স্থানে স্থানে দুএকটি দোষ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, ইনি পরে একজন সুলেখিকা হইবেন।

সদ্ভাব কুসুম।—

ইহা অমর কবি ৺রজনীকান্ত সেন প্রণিত, মূল্য।০ আনা।

এইখানি ছোট শিশুদিগের উপযোগী সরল নীতি ও উপদেশপূর্ণ কবিতা পুস্তক। মৃত কবির পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। দেশবাসী সকলেই কবি রজনীকান্তকে চিনেন। তাঁহার 'বাণী', 'কল্যাণী', 'অভয়া' যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার চরিত্রের মধুরতার আস্বাদন পাইয়াছেন। ইঁহার রচিত পুস্তকের আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কবির চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। প্রত্যেক জনক জননী তাঁহাদের সরলমতি শিশুদিগের হস্তে এই পুস্তক দিয়া তাহাদের কোমল হৃদয়-বৃত্তির স্ফূর্ত্তি সাধন করুন। এস, কে, লাহিড়ী মহাশয় স্বর্গীয় কবির নিরাশ্রয় পরিবারের জন্য নিজ ব্যয়ে ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। স্কুলের পাঠ্যরূপে এই পুস্তকখানি গৃহীত হইলে আমরা যারপরনাই সুখী হইব। আশা করি শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কবির পরিবারবর্গের প্রতি কৃপা করিয়া ও কবির সম্মান রক্ষা করিয়া দেশবাসী সকলকে সুখী করিবেন।

বামারচনা।

চাহি না।

সংসার! আমারে আর দেখা'ও না ভয়,
ভাল নাহি বাস যদি দিও না আশ্রয়।
অমর-আশ্রিত যবে হবে ক্ষুদ্র হিয়া
বিভুর কৃপায় যাব তোমারে ত্যজিয়া।
ভীষণ মূরতি হেরে প্রকম্পিত কায়,
কত কাল বিভীষিকা দেখাবে আমায়।
তোমার করাল মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়,
তোমা হতে স্বার্থসিদ্ধি কাহার কি হয়?
তোমার পিচ্ছিল পথে পাব কি তাঁহারে
তন্ন তন্ন খুঁজি যাঁরে জগত মাঝারে।
মায়ার ভিতরে তিনি না রহেন কভু,
তিনি যে আমার সেই প্রাণারাম বিভু।

শ্রীমতী ইন্দুমতি দেবী।

নব বর্ষ।

নব বরষের নাথ! মধুর উষায়,
কেমন প্রফুল্ল বিশ্ব তোমার কৃপায়।
কুসুমসৌরভ লয়ে
অনিল যেতেছে ব'য়ে
গাইছে আনন্দে পাখী বিটপি-শাখায়।

নবীনে মধুরে আজি মিশেছে ধরায়।

২

নব বরষের এই মধুর উষায়,
তোমার পবিত্র নামে ধরা পূর্ণ হায়!
তটিনী লহরী তুলে,
নেচে যায় হেলে দুলে
আনন্দে মাতিয়া সবে নমিছে তোমায়,
গুণ গুণ রবে অলি তব নাম গায়।

৩

নব বরষের এই মধুর উষায়,
আমিও প্রণমি নাথ! ও রাতুল পায়।
সুধু নিজ স্বার্থ লয়ে,
সারা বর্ষ গেছে ব'য়ে,
হে বিশ্ব আরাধ্য দেব! ডাকিনি তোমায়।
কে জানে কি ঘুম ঘোরে রাখিলে আমায়!

নব বরষের এই মধুর উষায়,
হে বরেণ্য! এই ভীক্ষা মাগি তব পায়।
যে দিকে ফিরাব আঁখি,
যেন গো তোমারে দেখি,
তব নামে, তব প্রেমে, তোমারি কথায়,
করিয়া তোমারি কার্য্য বর্ষ যেন যায়।

৫

নব বরষের এই মধুর উষায়,
মাগি এই ভীক্ষা নাথ! দাও গো আমায়!
হে দয়াল বিশ্বপতি! ওহে অগতির গতি!
বারেকের তরে যেন না ভুলি তোমায়।
এই শুভ দিনে দাসী এই ভীক্ষা চায়।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র। (হুগলী)

পিপাসিত।

লক্ষ্য-হারা, পথ-হারা, দিশা-হারা আমি,
পশু হইতেও হীন জীবন আমার,
নিশি দিন ডুবে রহি মোহ-পঙ্কে হায়!
দেখাইয়ে দাও মোরে মুক্তির দুয়ার।

২

কত কাল রব আর মায়া মোহে মজি
দারুণ পিয়াসা লয়ে চাতক যেমন,
ধরণীর সুখ হায় মরীচিকা সম,
জলে তাই তৃষানলে হৃদয়-গহন।

৩

"আমার" বলিতে ভবে যা কিছু বুঝায়
তুমি ছাড়া কিছু নাই দাও বুঝাইয়ে,
বসুধার প্রলোভনে আশার কুহকে
রেখোনা রেখোনা আর মিছে ভুলাইয়ে।

দাও হে সন্ধান দেব! অনন্ত সুখের
না হয় পাহিতে যাহে নিরাশার গান,
ঢাল তব সুধা-ধারা মরু-দগ্ধ প্রাণে
নিদারুণ তৃষা মোর হোক্ অবসান।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত, চট্টগ্রাম।

মর্ম্মকথা

শৈশব-জীবনে মোহের স্বপনে
নিরত আছিনু ভোর।
সহসা গো তুমি দেবতা! আমার
ভাঙ্গালে স্বপন ঘোর।
তুমিই বাজালে প্রেমের বাঁশরী,
ধ্বনিয়ে নিভৃত হৃদয় আমরি!
জাগালে কতই বাসনা লহরী,
আমার সুষুপ্ত মরম-তলে।
তুমি এ হৃদয়ে প্রণয়ের ছবি
আঁকিয়া দিয়াছ মধুময় সবি,
আলো দেয় হৃদে তব প্রীতি রবি,
তোমারি প্রেমের মোহন বলে।
তোমারি মধুর প্রণয় পরশে,
হৃদি-কুঞ্জে ফুটে ফুল সে হরষে,
মলয় মারুত সুখ সে বরষে,
আনন্দে বিহগ ধরেছে তান।
তব অপরূপ রূপের তরঙ্গে,
ঢালিয়া দিয়াছি এ ক্ষুদ্র প্রাণ।
আমি তব প্রেমে আছি নিমগন,
আমার আমিত্ব ভুলে।
আমার বলিতে যা কিছু তা সব—
দিয়েছি ও পদে তুলে।
তোমাতে মিশিয়া তোমাতে মজিয়া,
তোমার মুরতি হৃদয়ে আঁকিয়া,
পুজি দিবানিশি পরাণ ভরিয়া,
প্রেম পুষ্প তুলি হৃদয় হ'তে।
তব ইষ্ট নাম জপি সদা আমি
বিভোর বিহ্বল বিমুগ্ধ চিতে।
যেন তুমি মম জীবনে মরণে,
হ'ও দেব! মোর স্বামী।
জনম জনম মুগধ রহিব,
তোমাময় হ'য়ে আমি।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

এস!!

আধ আলো, আধেক আঁধারে,
অনাবিল নিরজনমাঝে,
কত বার দেখেছি তোমারে,
প্রকৃতির শ্যাম-স্নিগ্ধ সাঁঝে॥

২

অন্ধকার হৃদয়-গগনে
উদেছিল পূর্ণ শশধর,
এ হৃদয় বিজন-কাননে,
ফু'টেছিল পুষ্প মনোহর॥

৩

গেয়েছিল বিহগ সুস্বরে,
ব'য়েছিল মৃদু সমীরণ,
শুধু হায়! ক্ষণেকের তরে,
ভাবি বিশ্ব নন্দন কানন॥

মরি মরি নিমেষের তরে,
দেখেছিনু কি পরিবর্ত্তন,
শুষ্ক-মরু পাষাণ অন্তরে,
বসন্তের সব উপবন॥

৫

রঙ্গভূমে যবনিকা প্রায়
উজলিয়া হৃদয় আমার,
দৃশ্য পট মুহূর্ত্তে লুকায়,
এবে সব দেখি অন্ধকার॥

৬

দিবসের শেষ আলো জ্যোতিঃ,
নিভে যথা গোধূলির কোলে,
সুকুমার বালক যেমতি,
জেগে উঠি স্বপ্ন কথা ভোলে॥

৭

তেমতি স্মৃতির ক্ষীণ রেখা,
ক্রমে আসে ক্ষীণতর হ'য়ে,
আর যদি নাহি দিবে দেখা,
বল তবে থাকিব কি ল'য়ে?

৮

এ হৃদয়ে কিছু নাহি আর,
সকলি সঁপেছি সেই ক্ষণে,
তুমি মম জীবনের সার,
সব শূন্য তোমার বিহনে॥

৯

হৃদয়ের আকুল আহ্বান,
পশে না কি অন্তরে তোমার?
মম সুখ শান্তির নিদান
এস তুমি এস একবার॥

১০

শান্ত, সৌম্য, মধুর কিরণে,
উজলিবে হৃদয় আমার,
পূর্ণ শশী হেরিয়া গগনে,
দূরে যাবে যত অন্ধকার॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ,
বারুইপাড়া খুলনা।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 599. July, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৯ সংখ্যা। } আষাঢ়, ১৩২০। জুলাই, ১৯১৩ { ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

আমি কে?

কেবা আমি! কেন আমি এসেছি ধরায়?
ভাবি তাই মনে মনে, কি জানি কি
প্রয়োজনে,
কোন মহা শক্তিমান্ পাঠা'লে হেথায়?
ভাবি সদা, কেন আমি এসেছি ধরায়।"

২

কেবা আমি? কে বলিবে? কা'রে
বা সুধাই।
কি কার্য্য সাধন তরে, এই নর মূর্ত্তি ধ'রে,
কেন বা এখানে আসি কেনই বা
ফিরে যাই?
কেন আসি কেন যাই, ভেবে নাহি পাই।

৩

আমার রহস্য কেবা বুঝাবে আমায়
এই যে সুন্দর দেহ, সবে যার করে স্নেহ,
অবশ হইলে কেহ নাহি ছোঁবে তায়,
অযতনে এই দেহ লুটা'বে ধূলায়।

৪

দু'দিনের খেলা আহা! দু'দিনে ফুরায়।
এত ভাল বাসাবাসি, এত যে আনন্দ হাসি
দুই দিন পরে কিছু না রহিবে হায়!
দু'দিন খেলিতে কেন এসেছি ধরায়?

৫

এক যাবে আর এক আসিবে আবার।
সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে, এই ভাবে এ জগতে
কালের কুটিল চক্র ঘুরে অনিবার
ভাবিয়া না পাই কিছু সার তত্ত্ব তা'র।

৬

কুসুম-কোমল এই শরীর আমার,
সূচির আঘাত হায়!' লাগিলে সহেনা
তায়,

অনন্ত অনলে পুড়ি' হ'বে ছারখার'
তখন বেদনা কোথা রহিবে তাহার ?"

৭

ভাবিতে ভাবিতে শুধু দিন চ'লে যায়।
মীমাংসা হ'লনা তা'র, কেবা আমি ?
কে আমার ?'
আসিয়াছি কোথা হ'তে যাইব কোথায়?"
আমার স্বরূপ তত্ত্ব কে ক'বে আমায়?"

৮

কেন আমি আসিলাম জগত মাঝার,
পাঠাইল কোন জন, সাধিতে কি প্রয়োজন,
কেমনে জানিব কিবা উদ্দেশ্য তাহার,
ঘুরিতে ঘুরিতে দিন গেল যে আমার"

৯

ব্রহ্মাণ্ডের পতি তুমি র'য়েছ কোথায় ?
ভেঙ্গে দাও মোহ ঘোর, দারুণ সন্দেহ
মোর,
দেখা'য়ে বুঝা'য়ে প্রভু দাও হে আমায়'
কে আমি, কোথায় যাব ? কেন এ
ধরায় ?"

শ্রীমতী হেমাঙ্গিণী ঘোষ।
বারুইপাড়া খুলনা

উদাসীনের চিন্তা

(গল্প)

আমাদের বাড়ীতে এক সময়ে এক পাগল আসিয়াছিল। সে প্রকৃত পাগল কি না পাঠক পাঠিকা বুঝিয়া লইবেন, কিন্তু তাহার বাহিরের বেশ ও ব্যবহার ঠিক পাগলের মত। মাথায় আলুলায়িত কেশ, তাহাও তৈলাভাবে রুক্ষ। পরিধানে শত-ছিদ্র একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র। তাহার শরীরের দিকে বড় লক্ষ্য ছিল না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ধূলিতে পরিপূর্ণ। দৃষ্টির স্থিরতা নাই, চক্ষু দুইটি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কি দেখিতেছে, কি ভাবিতেছে। পাগলকে দেখিবামাত্র একটু দয়ার আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম ইহার কত দুঃখ, সংসারে একাকী বেড়াইতেছে, আত্মীয় স্বজনের প্রেমের আলিঙ্গন ও সহানুভূতি ইহার ভাগ্যে ঘটিতেছে না। সময় মত আহার মিলিতেছে না, শীতাতপ হইতে রক্ষিত হইবার একটা স্থান নাই, লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্রাভাব। ইহাকে দুইটি মিষ্টি কথা বলিয়া নিকটে ডাকে এমন লোক দেখি না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পাগলের নিকটস্থ হইয়া তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু পাগলের উত্তর শুনিয়া অবাক্ হইলাম। সে একটু হাসিয়া বলিল আমার নাম ত আমি জানি না। আমি বুঝিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম সে কেমন? তোমার বাপ মা কি তোমার কোন নাম রাখেন নাই, কাহাকেও কি

তোমার নাম ধরে ডাকতে শুন নাই? সে উত্তর করিল "হাঁ সে রকম নাম ত অনেকই আছে, সেই কি আমার নাম? আমার বাপ মা ত অন্য দশটা নামে আমাকে ডাকিতে পারিতেন। সুতরাং আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত কোন নাম নাই, আমার সহিত কোন নামের জন্ম হয় নাই, তাই বলি প্রকৃতপক্ষে আমি অনামক। অন্য দশ জনের সহিত ভিন্ন করিয়া লইবার জন্য মা বাপ একটা উপাধি দিয়া আমাকে ডাকিতেন, তাহাদের নিকট হইতে অন্য দশ জনে শুনিয়া সেই নামে আমাকে অভিহিত করিয়াছে। ইহা ঈশ্বরদত্ত নহে, পিতামাতার দত্ত, সুতরাং এই উপাধি আমার নিত্যসঙ্গী নহে। তাহার পর আমার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমার বাড়ী শ্মশান ঘাটের অপর পারে।" ভাবিলাম কোন নদীর ধারে একটি শ্মশান ভূমি আছে, সেই নদীর অপর পারে তাহার জন্মভূমি হইবে। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন নদীর পারে তোমার বাড়ী" সে আর তখন হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না, কেবল হাসিতেই লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম না হবে কেন এই জন্যই লোকে ইহাকে পাগল বলে, তাহা না হইলে প্রশ্নটীতে হাসিবার বিষয় কি আছে? পাগলের কার্য্যেরই কোন যুক্তি নাই, মনে যখন যে ভাবের উদয় হয় সেই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই কাজ করে। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এত হাসিলে কেন? উত্তরে সে বলিল "শ্মশান ঘাটের অপর পার তুমি ভুল বুঝিয়াছ। এই পৃথিবী কি মানুষের বাস ভূমি? কই এখানে ত চির কাল বাস করিতে পার না। অতিথি যেমন দুদিনের তরে এক স্থানে বাস করে, মানুষ মাত্রেই তাহা করিতেছে। আমি তোমাদের বাড়ী আসিয়াছি আবার কিছু কাল পরে চলিয়া যাইব, আমি কি তোমাদের বাড়ীকে আমার বাসস্থান বলিতে পারি? এইরূপ জন্মস্থানেও দুই চারি বৎসর জীব অবস্থান করে। মৃত্যুর পর নিত্য ধামে যাইয়া বাস করিতে থাকে। তাই বলিয়াছি যে শ্মশান ঘাটের অপর পারে অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমি নিত্য ধামের প্রজা হইব।" পাগলের এই দুই প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া আমার মনের সংস্কার ঘুচিয়া গেল। আমি বলিলাম "তুমি ত পাগল নহ, তুমি মহা-জ্ঞানী। তোমার মত তত্ত্বজ্ঞান অনেকেরই নাই। তবে তুমি এবেশ ধারণ করিয়াছ কেন?" পাগল বলিল "ভাল জিজ্ঞাসা করি বাহিরের বেশের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ আছে কি? তুমি যে বাহিরের বেশ দেখে একটা মীমাংসা করে লয়ে ছিলে এটাই ত তোমার ভুল?" এই কথা শুনিয়া আমি আর তাহাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলাম না। তখন বলিলাম "আপনাকে ভুল বুঝিয়া আমি অপরাধ করেছি, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।" জ্ঞানী মহাপুরুষ তখন বলিলেন "আমি কাহারও অপরাধ লই না। মানুষ যখন পূর্ণ নহে তখন মানব মাত্রই ভ্রম

করিতে পারে। একমাত্র পূর্ণ শক্তির আধার ভগবানের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি যখন মানুষ তখন ভ্রম করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে অপরাধী মনে করি না"। লোকের দোষ লওয়া আমার একটা মন্দ অভ্যাস ছিল। কাহাকেও দোষী মনে করিলেই তাহার প্রতি বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিত, কোন ক্রমেই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম না। কিন্তু পাগল বেশধারী মহাপুরুষের যুক্তি শুনিয়া আমার একটু চৈতন্যের উদয় হইল, এবং আর কাহারও দোষ লইব না এই সঙ্কল্প করিলাম। মহাপুরুষকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে আমাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতি অল্প সময় মধ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন।

শ্রীমতী কিশোর কুমারী।

অশ্রু।

(স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে)

ফুল ত ফুটিয়া উঠে শিশির উষায়
শুধু দু'দণ্ডের তরে,—ক্ষীণ-মৃদু হাসি
সন্ধ্যায় ধরার-বুকে পড়ে ঘুমাইয়া—
অতি ধীরে,—মাগি আহা! অচির বিদায়
সমীরণ চাহে শুধু অধীর আবেগে
লুটায়ে মরমে কাঁদি, অস্ফুট-কুজন
মিশে যায় সঞ্চারিত মৃদু-কল-তানে।
আবার জগত হাসে নবীন সোহাগে,
ফুটে' উঠে থরে থরে মুগ্ধ কুঞ্জবনে
কানন বালিকা শত,—ধরণীর বুকে
মিশে যায় তা'র যত স্নিগ্ধ স্নেহরেখা।
জীবন মরণ গাথা বিচিত্র বন্ধনে—
নিয়ন্তার,—ব্যর্থ স্নেহ, আমার—আমার
তা'রি দেওয়া—তা'রি নেওয়া—তা'রি অধিকার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মাইতী
রাজসাহী

বিলাপ।

(১)

এই যে ফুটিয়াছিল সরসীর জলে
সুরভি কুসুম ফুল, কে হরিল বলে?
আঁধারিয়া চারিভিতে কেন আজ আচম্বিতে
হইল অদৃশ্য হায়, কিসের কারণ?
পৃথিবী কি নহে তা'র সুখের ভবন

(২)

বিশ্বপতি বিধাতার এ কি আচরণ !
বিতরি' রতন পুনঃ করেন হরণ।
আজি যা'রে দেখি হায়, কালি সে
কোথায় যায় ?
চপলা-চমক ন্যায় নিমেষে ফুরায়।
নিশার স্বপন যেন নেহারি ধরায়।

(৩)

আর কি মিলিবে সেই অমূল্য রতন,
অতল জলধি-জলে ডুবেছে যখন ?
জানিনা সাঁতার আমি, তবে হায় দিবা যামি
বিফল রোদনে আমি লভিব কি ফল ?
আকাশ কুসুম সম সকলি বিফল !

(৪)

কাল-কীট দংশিয়াছে যেই লতা-মূল,
কেমনে সজীব হবে সেই লতা ফুল ?
অবিরত অশ্রুধারে তা'রে কি জীয়াতে
পারে ?
আর কি ফুটে সে ফুল, ছুটে কি
সৌরভ ?
নিয়তির কাছে হায় অক্ষম মানব !

(৫)

স্বরগের মূর্ত্তিখানি স্বরগে মিশিল।
শোকানল হৃদিমাঝে জ্বলিয়া উঠিল।
কেমনে নিভিবে বল, হৃদয়ের
দুঃখানল,
কেমনে পাশরি বল তোমার আনন,
যতদিন শুষ্কদেহে রহিবে জীবন্ !

(৬)

ফিরিলাম এবে তবে লয়ে আঁখিজল ;
বিফল প্রয়াস মোর, সকলি বিফল—
তোমার আরক্ত-পদে ঢালিবারে
অশ্রুহ্রদে
বড় সাধ ছিল আজি হৃদয়ে আমার !
পাপী আমি, স্বরগের নাহি অধিকার !

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূত না মানুষ ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবদত্তের দুর্ভাগ্য ও নন্দকের সৌভাগ্য।

দেবদত্ত আপনার পত্নীর গলার স্বর্ণপদক দর্শন করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার স্বর্ণবর্ণ বপু ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, তাঁহার পদ্মনেত্র নিমিলিত হইয়া রহিল, তিনি তদবস্থায় ভূমি পতিত আগ্নেয়-গিরির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার রক্ষক ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী নন্দক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে তাঁহাকে জ্ঞানহীন অবস্থাতেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তিনি এখন ঘোর শত্রুমণ্ডলির মধ্যে জীবন-মৃত্যুর সন্ধি স্থলে রহিয়াছেন।

এখন রজনী দেবী পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, গাছ পালা ও বন জঙ্গলের ছায়া ব্যতীত সর্ব্ব স্থানেই জ্যোৎস্না।

নন্দককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া চারি পাঁচ জন বিকটাকৃতি লোক আসিয়া দেবদত্তকে ঘেরিয়া বসিল, তখন বনের চারিদিকে অনেকানেক ফুল ফুটিয়াছিল। এই কৃত্রিম বন ব্যতীত অন্য কোন বনে এত সুগন্ধ ফুল বিকশিত হয় কিনা সন্দেহ। এই বনাভ্যন্তরে সাময়িক কোন ফুলের অভাব ছিল না, কোন ফুল অন্ধকারে ফুটিয়া অন্ধকারেই নৃত্য করিতেছিল, কোন ফুল আলোকে প্রস্ফুটিত হইয়া আলোক সাগরেই সাঁতার দিতেছিল, কিন্তু চন্দ্রকে সকলেই দেখিতে পাইতেছিল, চন্দ্রানন কাহারও চক্ষুর অগোচর ছিল না। বাতাসের স্পর্শ হইতেও কেহ বঞ্চিত হইতেছিল না। অপার ক্ষমতাশালী ভগবান আপন রাজ্যের প্রত্যেক প্রজাকেই সমভাবে আপনার প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার কাছে আঁধার ও আলোকের প্রভেদ নাই, তিনি ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও ভেদ করেন না, তাঁহার কাছে ক্ষুদ্র বড় এক, রাজা ও ভিখারীর উপরেও তাঁহার সমান স্নেহ।

যাহারা দেবদত্তকে ঘেরিয়া বসিয়াছিল তাহারা তাহাকে কি প্রকারে হত্যা করিবে তাহার পরামর্শ করিতেছিল। দেবদত্তই চণ্ডদেবের প্রধান শত্রু, কারণ চণ্ডদেব দেবদত্তের স্ত্রী অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এই প্রধান শত্রুকে হত্যা না করিয়া কিছুতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। তখন অনেকেই অনেক রকম কহিল। কেহ কহিল "গলা টিপে মার," কেহ বলিল "বঁটি বা দা দিয়ে কেটে ফেল," কেহ কহিল "জলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দাও"। একজন অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল সে কহিল "দেবদত্তকে জ্ঞানহীন অবস্থাতেই নদীর স্রোতে ফেলিয়া দাও, সে নিজে নিজেই মরিবে আমরাও মৃত্যুর পর মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট কৈফিয়তের দায় হইতে বাঁচিব।" তখন সকলেই তাহার কথায় সায় দিল। তখনও ফুল হাসিতেছিল, চাঁদ হাসিতেছিল। হতভাগা দেবদত্তের সঙ্কট দেখিয়া তাহারা কেহই হাস্য হইতে নিবৃত্তি হইল না। এই নরাকৃতি ভূতদিগের মধ্যে কেহই তাহার অধঃপতন দেখিয়া দুঃখিত হইল না।

দেবদত্ত জ্ঞানহীন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত ছিলেন! পূর্ব্ব পরামর্শদাতা কহিল "চল এই বেলা আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া দেবদত্তকে লইয়া নদীর স্রোতে ফেলিয়া দিয়া আসি।" "তাই ভাল" বলিয়া তাহারা সকলে দেবদত্তকে ধরাধরি করিয়া লইয়া বনের মধ্য দিয়া বহুদূর গেল। তাহার পর নদীর পারে গিয়া দেবদত্তকে নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। দেবদত্তের জ্ঞানহীন দেহ স্রোতে ভাসিয়া গেল কি জলে ডুবিয়া গেল তাহা পাঠক পাঠিকাগণ আপনারাই বুঝিয়া লউন, আমি আর এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিয়া সময় নষ্ট করিব না। এই পৈশাচিক ও দুঃসাহসিক কার্য্যের মধ্যে নন্দকের পরিচিত সেই ভীষণাকৃতি ব্যক্তিও ছিল।

সে দেবদত্তের বিনাশ সাধন হইল জানিতে পারিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া এই সংবাদ তাহার কর্ত্তাকে জ্ঞাপন করিল ; এই কথা পাঠক পাঠিকাগণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই অবগত হইয়াছেন। এই ঘটনার পূর্ব্বে নন্দক সম্বন্ধে যে একটি বিষম ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা এতক্ষণ পাঠকগণের কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেই বিবরণই আমি এখন বর্ণনা করিব।

নন্দককে আমরা বহুক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়াছি, একবার দেখা উচিত তিনি সেই নির্জ্জন ভূমিতে একাকী কি করিতেছেন। সেইরূপ ভীষণ স্থানেও নন্দক এই বিকট হাস্য শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইলেন না। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কে হাস্য করিল চারিদিকে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন স্থানেও মানুষের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, থাকিয়া থাকিয়া সেই বিকট হাস্য-ধ্বনি নৈশ কানন বিদীর্ণ করিতেছিল, কিন্তু কোথা হইতে যে সে হাস্যধ্বনি আসিতেছিল তাহা নন্দক কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সময় সময় তিনি ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতেছিলেন, সময় সময় তাঁহার মন বিস্ময় সাগরে ডুবিয়া যাইতেছিল, আবার সময় সময় সন্দেহ আসিয়া তাঁহার মনকে দোদুল্যমান করিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন এ কি, ইহা কি সত্যই কোন ভূতের খেলা ? না এইরূপ কর্ম্ম যাহারা করিতেছে তাহারা মানুষ।

এই সময় আকাশে চতুর্থীর চন্দ্র উদয় হইল। সেই ঘন নিবিড় বনের মধ্যস্থলও চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইল। তদ্দর্শনে নন্দকের মনে হইতে লাগিল যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহার দুরাবস্থা দর্শন করিয়া উপহাস ছলেই দন্ত বিস্তার করিয়া হাস্য করিতেছেন। নন্দক জ্যোৎস্নালোকে সেই ভীষণ স্থানটি ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন। কি ভীষণ বন ? কিন্তু তাহার মধ্যেও সুগন্ধ ফুলের অভাব ছিল না। এক একটি গাছে এত বন ফুল ফুটিয়াছে যে বৃক্ষগুলিকে এক একটি ফুলের স্তবক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ? নন্দক দেখিলেন চারিদিকেই নিবীড় বনরাজি, কেবল তাহার পশ্চাতে সলিলপূর্ণ পুষ্করিণী সদৃশ একটী ডোবা এবং এই জলপথেই তিনি এই স্থানে আনিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ অনুশীলন করিয়া বুঝিলেন যে তিনি যে কূপের মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন সেই কূপের জলের সঙ্গে ডোবার জল সংলগ্ন এবং কূপের মধ্যে এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য দ্বার আছে যে তাহা দ্বারা জলের ভিতর দিয়াই যাতায়াত করা যায়। নন্দক আরও বুঝিলেন যে তিনি যে ডোবার তীরে উঠিয়াছেন ঐ কূপের অন্য দিকে ঐরূপ ডোবা আরও আছে, নচেৎ তিনি যাহার সঙ্গে জলে ডুবিলেন এবং যে তাহাকে এই পথে লইয়া আসিল সে কোথায় গেল। সম্ভবতঃ সেও এইরূপ একটী ডোবার তীরে গিয়া থাকিবে। এখান হইতে বহির্গমনের

অন্য পথ আছে কিনা নন্দক এখন অনন্যোপায় হইয়া তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হঠাৎ বহু হাঁসির শব্দে নির্জ্জন বন মুখরিত হইয়া উঠিল। নন্দক অনুসন্ধান করিলেন কোথা হইতে এই শব্দ আসিতেছে, কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে হাঁসির শব্দ ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিণত হইল, করুণ ও অকরুণ ক্রন্দন ধ্বনিতে দিগদিগন্ত ছাইয়া পড়িল। এ কি? এসব কি কাণ্ড? এ সব ব্যাপারের মুলে কি ভূত না কোন মানুষ? এই কীর্ত্তিও কি প্রতিধ্বনির অপহরণকারির, না অন্য কাহার? এটাকি ভূতের বাড়ী না কোন দুষ্ট লোকের আবাস ভূমি? বিস্ময়ের প্রথম বেগ হ্রাস হইলে নিস্তব্ধ ও অন্যমনস্ক হইয়া নন্দক পুনরায় ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তার পথে বহু দুর অগ্রসর হইতে না হইতেই গভীর বনাভ্যন্তর হইতে ব্যাঘ্র ডাকিয়া উঠিল। বন গর্ভ ভেদ করিয়া গর্জ্জনের উপর গর্জ্জন হইতে আরম্ভ করিল। নন্দক এ ঘটনাতেও ভীত হইলেন না কিন্তু বিস্ময়ে ও সন্দেহে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন একি? এ সব কি ভূতের কীর্ত্তি না মানুষের, না যথার্থই ইহা বাঘ? ভাবিতে ভাবিতে নন্দকের শরীর ক্রোধে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তিনি পলক মধ্যে তাঁহার তরবারি কোষমুক্ত করিলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল না, বরং ক্রমে ক্রমে ব্যাঘ্রও গর্জ্জন হইতে বিরত হইল। নন্দকের আর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বনের নিবিড় হইতে নিবিড়তর প্রদেশে প্রবেশ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার দ্বিগুণ বিস্ময়োৎপাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ বৃক্ষরাজি সবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। পুষ্প বৃক্ষ হইতে পুষ্প, ফল বৃক্ষ হইতে ফল, শুষ্ক বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পত্র সমুহ ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করিল। এ কি আশ্চর্য্য?

নন্দক প্রথমে আশ্চর্য্য হইলেন, তাহার পর ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় তাহার মস্তকোপরি কতকগুলি বৃক্ষ শাখা নুইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঝপা ঝপ্ ঝপা ঝপ্ শব্দে নন্দকের পশ্চাৎস্থিত জলের মধ্যে কতকগুলি ভারি বস্তু পতনের শব্দ হইল। নন্দক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন আর কোন দিকে কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। তিনি অনাহারে অনিদ্রায় কেবল দণ্ডায়মান থাকিয়াই সে রজনী যাপন করিলেন।

পর দিবস সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যাহা দেখিতে পাইলেন তাহাতে তাঁহার মন একেবারে বিস্ময় সাগরে ডুবিয়া গেল। তিনি দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার মাতা এবং তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে। তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন

বলিয়া না দেখিলেও অনুধাবণ পূর্ব্বক স্পষ্ট বুঝিলেন যে তাঁহার মাতা এই মাত্র জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। তিনি মাতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। নন্দকের মাতা নন্দককে আশীষ না করিয়াই জোড় হস্তে জানু পাতিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন ও তদগত চিত্তে ভগবানের এই স্তব করিতে লাগিলেন :—

প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারাম
আহা কি অমৃত মাখা এই নাম।
তুমি রোগ হন্তা, তুমি শোক হন্তা,
পতিত উদ্ধার তোমারই পন্থা,
তব স্পর্শে হর্ষ ভরে নাচে প্রাণ,
গুণধাম গুণধাম গুণধাম।
আমার সুখ সন্তোষ লও হরি,
জ্ঞান চক্ষু দাও প্রস্ফুটিত করি,
প্রাণ ভরি করি তব নাম গান,
প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারাম।
মম হৃদয়রূপ উদ্যান মাঝে
তোমার করুনা-কনা-রূপ-গাছে—
ফুটে উঠ তুমি ফুল রূপ ধরি
সাজায়ে রাখ চির বসন্ত করি।
সূর্য্যের আলোকে চন্দ্রিকা যেমন
অনিচ্ছাতে ধরে বেশ সুশোভন,
তেমনি তোমার দয়া কণিকায়
সাজায়ে আমায় রাখ করুণায়।
হাতে ধরে নিয়ে চল তব রাজ্যে
নিয়োগ কর তব পবিত্র কার্য্যে।
তব—কৃপা সিন্ধুর বিন্দু করায়ে পান
অতি দুঃখীকেও কর ধনবান।
প্রভু—শুধু তুমি সত্য, সত্য-তব নাম
প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারাম।

নন্দকের মাতা স্তব শেষ করিয়া নন্দককে যে তিনি জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক নন্দককে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।
নং ৪৮ চুড়িহাটা, ঢাকা।

বৈজ্ঞানিক যুগ ও নূতন আবিষ্কার

কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্ববিৎ মনিষীগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন কিছু দিন পূর্ব্বে সভ্য সমাজ যাহা কবির কল্পনা অতিরঞ্জিত কেহ বা পাগলের উক্তি বলিয়া যাহা উড়াইয়া দিতে চাহিতেন, আজ বিজ্ঞানের দ্বারা সেই সকল সত্য পুনরায় উদ্ধার হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল নূতন আবিষ্কার প্রচার হইতেছে নিম্নে তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পাঠ করিলে বিজ্ঞানের দ্বারা কত লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধন ও জগতের কত উন্নতি হইতেছে

তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

পরমাণুতত্ত্ব—

সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে রসায়ন বিজ্ঞানে পরমাণু লইয়া অত্যন্ত আলোচনা চলিতেছে। ম্যাডাম ব্লাভাস্কি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার কথা উপেক্ষিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক দিগের এই ধারণা ছিল যে, পরমাণু নিত্য, অনাদিকাল হইতে ইহা সমভাবে, বিদ্যমান আছে। রেডিয়াম্ (Radium) আবিষ্কারের পর তাঁহারা এই ধারণা বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে, পরমাণু নিত্য নহে, বরং অবস্থায় পড়িয়া উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্ষুদ্রতর পরমাণুতে পরিণত হয়। এই ক্ষুদ্রতর পরমাণুর Ion or Electron নাম করণ হইয়াছে। সম্প্রতি কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড় পরমাণু বলিয়া কোন কিছু নাই, ইহা জীবেরই ভাবান্তর! এসম্বন্ধে ডাক্তার সালিবি (Saleeby) সম্প্রতি এইরূপ লিখিয়াছেন যে নব্য রাসায়নিক পণ্ডিতগণ জড় (Matter) বলিয়া কোন কিছু আছে কি না তাহাই সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরমাণুর বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, উহা শক্তির অস্থায়ী কেন্দ্র মাত্র। পরমাণুরও জন্ম মৃত্যু অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ আছে। কিন্তু মৃত হইলে তাহার শবদেহ পড়িয়া থাকে না, কারণ যে শক্তির প্রস্রবণ পরমাণু, সেই শক্তি মহাশক্তি সাগরে বিলীন হইয়া যায়, তাহার কোন চিহ্ন থাকে না।

২। বিগত জানুয়ারী মাসে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টম্‌সন্ সাহেব বিলাতের রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসন্ নামক সুবিখ্যাত বিজ্ঞান সভায় এক নূতন মৌলিক ভূতের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মৌলিক ভূতটি হাইড্রোজেন হইতে গুরুতর ও হিলিয়ম হইতে লঘুতর।

ইহার আণবিক গুরুত্ব (Atomic Weight) "৩", এইজন্য টমসন্ সাহেব ইহাকে ×,৩ পদার্থ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় মিসেস্ আনিবেশাণ্ট ও মিঃ লেড্‌বিটার সাহেব কেবল মাত্র সূক্ষ্মদর্শন সাহায্যে অকালটাম (Occultum) নামক যে নূতন মৌলিক ভূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, তাহারও আণবিক গুরুত্ব "৩"। কিন্তু তখন বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদিগের কথায় আস্থা স্থাপন করেন নাই। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, টম্‌সন্ সাহেবের নবাবিষ্কৃত ×৩ ও অকালটাম একই পদার্থ।

রুম্যানিয়ার রাণী, "কারমেন্ সিল্‌ভা" (Carmen Sylva) কিছু দিন পূর্ব্বে Nineteenth Century নামক মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, অনেক সময় সঙ্গীতের সুরের স্বরের সহিত তিনি নানা বিচিত্র বর্ণের ছটা দেখিতে পান। শব্দের শুধু ধ্বনি আছে তাহা নহে, ইহার বর্ণও আছে। সেই জন্য

সংস্কৃতে অক্ষরকে বর্ণ বলে। শব্দের যেরূপ বর্ণ আছে, বর্ণেরও সেইরূপ শব্দ আছে। সেইজন্য সকল বর্ণের আধার সূর্য্যকে 'রবি' বলে। রবি ও রব একই 'রু' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

উপনিষদের একস্থলে লিখিত আছে যে, সূর্য্য যখন উদিত হন, তখন আকাশময় এক বিচিত্র শব্দ-তরঙ্গ আন্দোলিত হয়। অতএব রুম্যানিয়ার রাণীর সঙ্গীতের সুরের সহিত বর্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া বিচিত্র নহে।

গৃহ-চিকিৎসা।

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে নাড়ী দেখিবার সহজ উপায়।

মনুষ্যদেহে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি স্থূল ও কতকগুলি সূক্ষ্ম। ঐ নাড়ীগুলি নাভি-মূল হইতে বহির্গত হইয়া সরল ও বক্র-ভাবে শরীরের ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে গমন করিয়াছে। ঐ সাড়ে তিন কোটি নাড়ীর মধ্যে ৭২০০০ বাহাত্তর হাজার নাড়ীকে স্থূল নাড়ী বলে। ইহারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, প্রভৃতি বহন করিয়া থাকে। এই বাহাত্তর হাজার স্থূল নাড়ীর মধ্যে সাতশত নাড়ী নলাকার ছিদ্র-সমন্বিত। ঐ সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ সর্ব্ব শরীরে পরিচালিত হয়। ঐ ছিদ্রযুক্ত ধমনীপথে আহারীয় বস্তুর সারাংশ সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হইয়া মনুষ্যদেহের পুষ্টি সাধন করে। চর্ম্মরজ্জুতে বিজড়িত মৃদঙ্গের ন্যায় ঐ সাত শত ধমনী পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অবস্থান পূর্ব্বক শরীর রক্ষা করিতেছে। উক্ত সাতশত ধমনীর মধ্যে চব্বিশটী নাড়ী সচরাচর স্পন্দনশীল বলিয়া অনুভূত হয়। ইহার মধ্যে দুই হস্তে ও দুই পদে যে চারিটি নাড়ী আছে তাহাই পরীক্ষা করিতে হয়। পুরুষের দক্ষিণ দিকে ও স্ত্রীলোকদিগের বাম দিকে পরীক্ষা করিবার নিয়ম। মানবদিগের নাভিদেশে বক্রভাগে একটী কূর্ম্মাকার নাড়ীপুঞ্জ অবস্থিতি করিতেছে, ঐ কূর্ম্মের মুখে দুইটী, পশ্চাতে দুইটী, পদতলে এবং হস্তে পাঁচটী করিয়া দুইদিকে কুড়িটী নাড়ী আছে। ইহা-দিগের সমষ্টিতে চব্বিশটী নাড়ী হইল।

ঐ কূর্ম্মের মুখ স্ত্রীলোকের ঊর্দ্ধদিকে এবং পুরুষের অধোদিকে অবস্থিত। এজন্য স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ও পুরুষের দক্ষিণ হস্তে নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। শোণিতসমূহ বায়ুর প্রভাবে হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীর মধ্যগত হইলে উহাতে যে বেগ হয়, তাহাকে নাড়ীর গতি কহে।

নাড়িজ্ঞান শিক্ষার্থিগণের সর্ব্বপ্রথমে

মনুষ্যের সুস্থাবস্থায় নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত।

সুস্থাবস্থায় নাড়ী পরীক্ষা না করিলে কদাচ রুগ্নাবস্থায় নাড়ীজ্ঞান জন্মিতে পারে না। সুস্থাবস্থায় নাড়ীর গতি অবগত হইলে রুগ্নাবস্থায় নাড়ীর গতি অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে।

সকল সময়েই নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত নহে। স্নানের সময় তৈলমর্দ্দনে হস্তাদি ঘর্ষণ দ্বারা শিরাস্থিত শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে সুতরাং নাড়ীর গতি তখন চঞ্চল হয়। নিদ্রিতাবস্থায় অধিক পরিমাণে কফের সঞ্চার হইয়া কোন কোন শিরার কার্য্য বন্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং তদবস্থায় নাড়ীর গতি নির্ণয় করা কোন মতে সম্ভবপর হইতে পারে না। নিদ্রাভঙ্গ কালে নাড়ী চঞ্চল হয়, সুতরাং তখন নাড়ী পরীক্ষা হইতে পারে না। ভোজন কালে ও ভোজনাবসানে যে পর্য্যন্ত ভক্ষিত দ্রব্যের পরিপাক না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, সুতরাং সে সময়েও নাড়ী পরীক্ষা হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন স্নানের পর এবং পরিশ্রমের অব্যবহিত পরে নাড়ী পরীক্ষা উচিত নহে।

নাড়ী পরীক্ষার স্থান—অগ্রে রোগীর নাড়ী ও জিহ্বা পরীক্ষা করিবেন। হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে যে নাড়ী আছে, উহাকে জীবসাক্ষিণী নাড়ী বলে। উহার গতির দ্বারা সুস্থ বা অসুস্থ জানা যায়। কেবল যে অঙ্গুষ্ঠমূলের ধমনী দ্বারা নাড়ী পরীক্ষা হয়, এমন নহে, দুই হস্তে, দুই পদের গুল্ফ, কণ্ঠের দুই দিকে ও নাসিকার দুইদিকে, এই আট স্থানে নাড়ী পরীক্ষা করা যাইতে পারে। নাড়ী পরীক্ষাকালে, রোগীর যে হস্তে নাড়ী পরীক্ষা করিবেন, সেই হস্তের কনুয়ের নাড়ী পীড়ন পূর্ব্বক নিজ বাম হস্তোপরে রোগীর কনুই স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা রোগীর মণিবন্ধের নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

বায়ুর আধিক্য হইলে নাড়ী একবার এদিক একবার ওদিক এই প্রকার গতি-বিশিষ্ট হয়। অধিকন্তু বায়ুরোগগ্রস্থ (উন্মত্ত) ব্যক্তিগণের নাড়ী কখন বলবান পুরুষের ন্যায় চঞ্চল, কখন বা দুর্ব্বলের ন্যায় মৃদুগতিবিশিষ্ট দেখায়। পিত্তের আধিক্য হইলে নাড়ী বেগে বহিতে থাকে এবং কফের আধিক্য হইলে মৃদুগতি হয়। ত্রিদোষ হইলে নাড়ী কখন ধীরে কখন বেগে বহিতে থাকে। শুভ লক্ষণ ব্যতীত অশুভ লক্ষণ সকল সহজে উপলব্ধি হইতে পারে না। তজ্জন্য এস্থলে অগ্রে দুই একটী শুভলক্ষণ প্রদর্শিত হইল। যে রোগে নাড়ী পরীক্ষা কালে নাড়ীতে প্রথমতঃ বায়ুর, পরে পিত্তের ও তৎপরে কফের লক্ষণ অনুমিত হয়, সেই রোগের শান্তি অল্প সময়ে ও সহজ উপায়ে হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিপরীতভাব লক্ষিত হইলে, রোগীকে রোগমুক্ত করিতে প্রায়ই অধিক সময় ও আয়াস লাগিয়া থাকে। আরও দেখিতে হইবে

যে, যে রোগে প্রাতঃকালে কফের, মধ্যাহ্ন সময়ে পিত্তের ও অপরাহ্নে বায়ুর গতি নাড়ীতে প্রকাশ পায়, সেই রোগ সুখ-সাধ্য এবং ইহার বিপরীত ঘটিলে কষ্টসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পরন্তু সান্নিপাতিক রোগে নাড়ী অতি মৃদুভাবে, কখনও বা শিথিল ভাবে, কখন সূত্র সঞ্চারের ন্যায়, কখনও ব্যাকুলভাবে কিম্বা এত ত্রস্ত চলে যেন উহা ইতস্ততঃ চলিয়া যাইতেছে মনে হয়। কখনও বা থামিয়া থামিয়া অর্থাৎ চলিতে চলিতে একটু থামিয়া পড়ে আবার চলিতে থাকে। অথবা কোন সময়ে নাড়ী পাওয়াই যায় না, এমন কি মণিবন্ধ ছাড়িয়া উহার উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। পুনর্ব্বার স্বস্থানে নামিয়া আইসে। তখন রোগীর সম্পূর্ণ বিকারাবস্থা বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে। ঈদৃশাবস্থায় রোগীকে প্রায়ই রোগমুক্ত হইতে দেখা যায় না। আবার বিকারের আর একটী সাধারণ লক্ষণ এই যে, শরীর অত্যন্ত উষ্ণ, কিন্তু নাড়ী শীতল এবং শরীর অত্যন্ত শীতল কিন্তু নাড়ী উষ্ণ ও নানা প্রকার গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যে রোগীর নাড়ীর গতি এ প্রকার হইয়া থাকে, তাহাকে প্রায়ই রোগমুক্ত হইতে দেখা যায় না। পরন্তু অত্যল্প কাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু সংঘটন হইয়া থাকে।

বেদের টীকাকার ও মাধবাচার্য্য

বেদ প্রত্যাদিষ্ট ঋষিগন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহা সংগ্রহ ও বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া বেদব্যাস নামে অভিহিত হইয়াছেন। বেদান্ত দর্শনও তাঁহার প্রণীত। বেদের শিরো-ভাগ লইয়া উপনিষদ সকল প্রণীত হইয়াছে কিন্তু তাহা বেদের টীকা নহে। শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য, ভারতী তীর্থ প্রভৃতি বেদবিৎ মহাত্মাগণ বেদের ভাষ্য বা টীকা প্রচার করেন। বেদব্যাসের ন্যায় মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ও বেদান্তভাষ্য কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। ইহাঁদিগের মধ্যে মাধবাচার্য্যও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইহাঁর অপর নাম "শায়নাচার্য্য"। কেহ কেহ ইহাঁকে "বিদ্যারণ্য" নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ইহাঁর কৃত বেদের ভাষ্য বা টীকা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, পুস্তক লিখিয়া পাণ্ডুলিপি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের দ্বারা সমালোচনা বা সংশোধন করাইয়া ছাত্র বা শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করা হইত এবং ক্রমে তাহারাই উক্ত গ্রন্থ প্রচারের সাহায্য করিত। কথিত আছে দাক্ষিণাত্যে একজন বেদবিদ মহাপণ্ডিত ও

ধর্ম্মাত্মা অবস্থান করিতেন। মাধবাচার্য্য তাহা অবগত হইয়া তাঁহার প্রকাণ্ড গ্রন্থ স্কন্ধে করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত হইতে পদব্রজে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত তাপস গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পাঠের পর একদা প্রসঙ্গ ক্রমে "কেশব বা হৃষিকেশ" শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে হরির কেশ কিরূপ এই বিষয় লইয়া উভয়ে তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। মাধবাচার্য্য বলিলেন হরির কেশ কেশরীর কেশরের ন্যায়। তাপস বলিলেন ইহা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ। তর্ক ক্রমে বিবাদে পরিণত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া তাপস বলিলেন "যদি ইচ্ছা কর হরিকে এখানেই আবির্ভুত করিয়া তাঁহার কেশের বর্ণ কি প্রকার তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি।" মাধবাচার্য্য সম্মত হইলেন। তাপস ধ্যানস্থ হইবামাত্র ভগবান হরি সাক্ষাৎকার হইলেন। মাধবাচার্য্য তাপসের বাক্য সত্য অনুভব করিয়া লজ্জিত হইলেন, কিন্তু তাপসের কৃপায় হরি দর্শন হইল বলিয়া কৃতার্থ হইলেন। অনন্তর তাপস তাঁহাকে বলিলেন "তোমার গ্রন্থ অত্যন্ত বৃহৎ ইহা প্রকৃত ভাবে সমালোচনা করিতে অনেক সময় লাগিবে। আমার তত অবসর নাই তুমি বেদ বিশারদ শিঙ্গন ভট্টের সাহায্য প্রার্থনা কর তিনি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। মাধচার্য্য শিঙ্গন ভট্টের আশ্রমপদের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "যে শিঙ্গন ভট্ট এক্ষণে ব্রহ্মরক্ষরূপে বিজন অরণ্যদেশে একটী প্রকাণ্ড বনস্পতির আশ্রয়ে বাস করিতেছেন। তিনি বেদবিদ সুতরাং তাঁহার অধীত জ্ঞান সকল অবস্থাতেই স্ফুর্ত্তিমান। মাধবাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মরক্ষরূপ ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাপস বলিলেন শিঙ্গন ভট্ট মহর্ষি বশিষ্ঠের সহযোগী। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। রাবণ বিশ্রবা মুনির পুত্র। রাক্ষস যোনীতে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণের ঔরসজাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বশিষ্ঠাদি মুনিগণের ব্যবস্থায় এই পাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। প্রায়শ্চিত্তের দান যে গ্রহণ করিবে দানের সহিত তাহাকে এই মহা পাপভার গ্রহণ করিতে হইবে। কোন ব্রাহ্মণ এই দান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব এই কার্য্যের জন্য দায়ী। অন্য কেহ দান গ্রহণ না করিলে তাঁহাকেই দান গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা শ্রীরামচন্দ্র পাপমুক্ত হইবেন না সুতরাং তিনি বিষম বিপদে পড়িলেন। শিঙ্গন ভট্ট বশিষ্ঠের অনুগত, তিনি তাঁহাকেই এই দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রতিগ্রহ করিলেই গৃহীতার মুখ তৎক্ষণাৎ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিতে হয় এবং দাতা আর তাঁহার মুখ দর্শন করেন না। শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে দাতা যদি ফিরিয়া প্রতিগ্রাহকের মুখ দর্শন করেন তাহা হইলে তাঁহার

দান নিষ্ফল হয় এবং পুনর্ব্বার পাপভার তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া থাকে। এই রূপ প্রতিগ্রাহককে আপামর সাধারণ সকল লোকেই ঘৃণা করিয়া তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অগত্যা তাহাকে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে হয়। বশিষ্ঠ তাঁহাকে পুনর্ব্বার সমাজভুক্ত করিবার আশ্বাস দিয়া এই দান গ্রহণে সম্মত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিঙ্গন ভট্ট প্রতিগ্রহ করিলে পর, বশিষ্ঠ অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাঁহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। এই জন্য শিঙ্গন ভট্ট হতাশ হইয়া অরণ্যে বাস করিলেন। একা তথায় দারুণ মনোদুঃখে দিন দিন ক্লিষ্ট হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বেদ-পারগ বিপ্র পাপভারে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে ব্রহ্মরক্ষ হইয়া থাকে। শিঙ্গন ভট্ট তাই ব্রহ্মরক্ষ হইয়াছেন।” তাপস নিদর্শন বলিয়া দিলে, মাধবাচার্য্য ব্রহ্মরক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং আগমনের কারণ বিজ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহার আদেশ মত মাধবাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। কিছু-দিন অতিবাহিত হইলে শিঙ্গন ভট্ট তাঁহাকে বলিলেন যে “আমার এই বিসদৃশ অবস্থায় মন সর্ব্বদাই আকুল ও অস্থির সুতরাং এই গুরুতর বিষয়ে আমি যথোচিত মনোযোগ দিতে পারিতেছি না। গ্রন্থ খানি যত দূর শুনিলাম অতি উত্তমই হইয়াছে, তথাপি ইহা একবার মহর্ষি বেদব্যাসকে দেখাইয়া তাঁহার সম্মতি লইয়া প্রচার করিলে ভাল হয়।” “বেদব্যাসের সন্দর্শন কিরূপে সম্ভব” এই বলিয়া মাধবাচার্য্য আশ্চর্য্য প্রকাশ করিলেন। শিঙ্গন ভট্ট বলিলেন ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। বেদব্যাস অমর, তিনি চারি যুগ বর্ত্তমান থাকিয়া ইচ্ছানুসারে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। যুগে যুগে ধর্ম্মের লোপ ও মানবের আয়ু ও শক্তির হ্রাস দেখিয়া বেদের স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া অলক্ষ্যে জনসমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তিনি প্রতি পৌর্ণমাসী পর্ব্বাহে বারাণসীতে আগমন করিয়া মণিকর্ণিকা তীর্থে স্নানাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে চিনাই সুকঠিন। তজ্জন্য আমি একটী উপায় বলিতেছি। তুমি প্রত্যূষে কুক্কুট ডাকিবার পূর্ব্বে গঙ্গা-তীরের পথে ধান্যের ত্বক্ (তুষ) ছড়াইয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি তুষ না মাড়াইয়া সাবধান পূর্ব্বক পদ বিক্ষেপ করিয়া গমন করিবেন, তাঁহাকেই তুমি বেদব্যাস বলিয়া অবগত হইবে। তুমি এই উপলক্ষে আমারও কিঞ্চিৎ উপকার করিও। আমি ব্রহ্মরক্ষ রূপ প্রাপ্ত হইয়া ভগবান বশিষ্ঠ দেবকে ইহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন “মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তিন বার তোমার নাম উচ্চারণ করিলে তুমি পাপ ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সদ্গতি লাভ করিবে। আমি কৌশল পূর্ব্বক দুইবার

তাঁহাকে আমার নাম উচ্চারণ করাইতে সমর্থ হইয়াছি, তুমি তাঁহাকে আর একবার উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করিও।" মাধবাচার্য্য সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন। অনন্তর পূর্ণিমার প্রত্যূষে শিঙ্গন ভট্টের উপদেশ মত পথে তুষ ছড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন, একজন কৃষ্ণবর্ণ কৃশকায় তাপস তুষ পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। তাঁহার সমুজ্জ্বল পবিত্র সৌম্যমূর্ত্তি ও সুপ্রসন্ন মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া মাধবাচার্য্য তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক পদতলে পতিত হইয়া রহিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে উঠিতে অনুজ্ঞা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধবাচার্য্য শিঙ্গন ভট্ট নামোল্লেখ করিয়া তাঁহার সন্দর্শন লাভ এবং আপনার আগমনের কারণ নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বলিলেন তিনি শিঙ্গন ভট্টের নাম শুনিয়াছেন, তিনি একজন মহাপণ্ডিত ও মহৎ লোক। মহর্ষি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র ব্রহ্মরক্ষরূপী শিঙ্গন ভট্ট দিব্যগতি প্রাপ্ত হইলেন। বেদব্যাস মাধবাচার্য্যকে বলিলেন, আমি শীঘ্র গঙ্গাস্নান করিয়া নিত্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব সুতরাং এখন আমার গ্রন্থপাঠ করিবার অবসর নাই। কিন্তু মাধবাচার্য্য "নাছোড় বান্দা"। "অনুগ্রহ না করিলে কিছুতেই আপনার পদযুগ ছাড়িব না" বলিয়া বিস্তর সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অবশেষে সদয় হইয়া গঙ্গার অপর পারে একটী সুবিস্তীর্ণ শাখা ও নিবিড় পত্র সমন্বিত প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার তলে বসিয়া লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে প্রত্যেক ভ্রমস্থলে এক একটী পত্র পতিত হইবে, ইহাতেই তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। মাধবাচার্য্য আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে তথায় গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আহ্লাদ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। যখনি তাঁহার গ্রন্থ উচ্চৈঃস্বরে পাঠারম্ভ করিলেন তখনি এক একটী করিয়া বৃষ্টির ন্যায় পত্রগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পত্র পতিত হইয়া বৃক্ষটী কেবল স্কন্দ ও শাখা সার হইল। মাধবাচার্য্য আকুল হইলেন। তাঁহার বিশাল পুথির পত্র সকল চতুর্দ্দিকে ফেলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের পরিশ্রম বিফল হইল। তাঁহার আর শোক রাখিবার স্থান রহিল না। তিনি নিরাশ হইয়া ভগ্নোদ্যম হইলেন। করুণাময় ঋষি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সদয় সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া তাঁহার উৎসাহ পুনরুদ্দীপণ করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন "নিরাশ হইও না, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া গ্রন্থখানি পুনর্ব্বার সংশোধনে প্রবৃত্ত হও, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রত্যেক ভ্রম সংশোধনের

প্রমাণ স্বরূপ এক একটী পতিত পত্র পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া তাহার নিজ স্থানে সংলগ্ন হইবে। যখন দেখিবে যে সমস্ত পত্র গুলি যথাস্থানে সংলগ্ন হওয়ায় বৃক্ষ পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইয়াছে,তখন বুঝিবে যে তোমার গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে।” ভগবান বেদব্যাস এই বলিয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন। মাধবাচার্য্য ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও উৎসাহের সহিত তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন পত্র গুলি পুনর্ব্বার কুড়াইয়া লইয়া সেইখানে বসিয়াই গ্রন্থ সংশোধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষির প্রসাদে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইলেন এবং ভ্রম সকল তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। তিনি এক একটী ভুল সংশোধন করেন আর এক একটী পত্র উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া তাহার নিজ স্থানে সংলগ্ন হইতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পত্র গুলি একে একে যথাস্থানে সংলগ্ন হইল। বৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় ঘন পত্রে সজ্জিত হইয়া স্বীয় শোভা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে মাধবাচার্য্যের সংশোধন শেষ হইল। তিনি উৎসাহ ভরে সংশোধিত গ্রন্থ খানি পুনর্ব্বার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। এবারে আর একটীও পত্র পতিত হইল না। মহর্ষির প্রসাদে তাঁহার চিরমনোরথ পূর্ণ হইল। মাধবাচার্য্যের টীকা এবম্প্রকারে ব্যাসের অনুমোদিত বলিয়া জন সমাজে প্রচলিত আছে।

“রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।”

(Some anecdotes from the life of Raja Ram Mohon Roy with a Genealogical Table showing the succeeding generations from Nityanand Bandopadhya down to the present surviving members of one branch of the family.”) শ্রীযুক্ত নন্দ মোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

এই পুস্তক প্রণেতা উক্ত মহাত্মার বংশের একজন দৌহিত্র সন্তান। ইনি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ঠাকুরদাদার সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার মহৎ জীবনের অনেক তত্ত্বকথা পাওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন ও কর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ বিবিধ ভাষায় বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় রচিত হইয়াছে। রাজার নিজের গ্রন্থাবলী অনেক ও বহুবিধ, তাহাতে যাহা যাহা বর্ণিত আছে সে সকল বিষয় ততটা এক্ষেত্রে উল্লেখ না করিয়া নন্দ মোহন বাবু যে সকল নূতন কথা ঐ পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বড়ই প্রীতিকর বিধায় বর্ণিত হইল। রাজা

রামমোহন রায়ের বংশাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গেলে স্থানের সংকুলান হইবে না বলিয়া আপাততঃ সংক্ষেপে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৈষ্ণব পিতার ঔরসে ও শক্তি মাতার গর্ভে রামমোহনের জন্ম। ভক্তি ও শক্তির সমন্বয় ক্ষেত্রে স্বর্গ হইতে যে অনুকূল বায়ু বঙ্গে বহিতেছিল তাহা এখনও বঙ্গে বহমান থাকিয়া এক অপূর্ব্ব সাত্বিক প্রভাবের সঞ্চার করিতেছে। ইহাতে বঙ্গের ভবিষৎ কত সমুজ্জ্বল হইবে তত্বজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা আলোচ্য বিষয়। বঙ্গবাসীগণ মহাত্মা রামমোহন রায়ের বহির্মুখীন ধর্ম্মকাণ্ড যতটা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ততটা তাঁহার অন্তর্মুখীন ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই, সুতরাং ধর্ম্মহীন কর্ম্ম বঙ্গে যে অনেক সময় পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

রাজা রামমোহন রায়ের বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ভাব ও প্রধান প্রধান জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠের জন্ম ১৩টী ভাষা শিক্ষা এবং দেশ বিদেশ পর্য্যটন প্রভৃতি অধ্যবসায় ও তাঁহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও তপস্যাদির বিবরণ অনুশীলন করিলে অবাক হইতে হয়। ভগবান দয়া করিয়া ভারতের মঙ্গলের জন্ম এই বহুগুণসম্পন্ন সন্তানকে বঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের ধৈর্য্য, ক্ষমা, প্রভৃতি ধর্ম্মের লক্ষণ সকল কিরূপ প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নন্দ বাবু তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী স্থানের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"রামমোহনের সময় মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। দলাদলির প্রভাবে তাঁহার জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়াছিল। সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে যোগ দেওয়া ত দূরের কথা, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেও লোকে সে সময় জাতিভ্রষ্ট হইত। কিন্তু কে কোথায় দেখিয়াছে, যে শিথিল বালির বাঁধ নদীর গতিরোধে সমর্থ হইয়াছে? সে সময়ে এমন কে ছিল যে রামমোহনকে নিরস্ত করিতে পারে?

কৃষ্ণনগরের সন্নিকট রামনগরগ্রাম নিবাসী রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ সহস্র লোক লইয়া একটা দল করে। কথিত আছে, এই ব্যক্তি রামমোহনকে বড়ই বিব্রত করিয়া রামমোহন রায়ের উপর আক্রমণই ইহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। অতি প্রত্যুষে ইহারা তাঁহার বাটির সম্মুখে আসিয়া অবিরত কুক্কুটধ্বনি করিত ও সন্ধ্যাকালে গোহাড় প্রভৃতি তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া নানাবিধ অত্যাচার করিত। রামমোহন উহাদিগকে ওরূপ অন্যায় কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ম অনেক সদুপদেশ প্রদান করেন, "কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। তাহারা তাঁহার খিন্নমনম্রতার বিভিন্ন চিত্র লইয়া বরং

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রূপে তাঁহার উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে, তাহাদের এত অত্যাচারেও রামমোহন দ্বিরুক্তি করেন নাই। কিন্তু বিনয়ের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! পরিশেষে তাহারা বোবার শত্রু নাই„ ভাবিয়া নিরস্ত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন সুতীক্ষ্ণ অসি লইয়া দেশ জয় করেন, রামমোহন রায় ধৈর্য্যাস্ত্রপ্রভাবে লোকের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি নানা বিষয়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতা জগন্মোহন রায়ের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ লোকের প্ররোচনায় বিষয়ের অংশ পাইবার জন্য তাঁহার নামে সুপ্রীমকোর্টে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন, কিন্তু ইহাতে তিনি ক্ষণকালের জন্য ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি রুষ্ট হন নাই। পরিশেষে অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গোবিন্দপ্রসাদ তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রকটিত হইল।

"আমি অন্য লোকের কথা শুনিয়া মহাশয়ের নামে বিষয়ের অংশ পাইবার প্রার্থনায় সুপ্রীমকোর্টে একুইটীতে অযথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম। আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পাইতেছি এবং মহাশয়ের মনস্তাপ এবং অর্থব্যয়ের কারণ হইয়াছি অতএব মহাশয় আমার পিতার তুল্য, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া যদি আমাকে নিকট যাইতে অনুমতি করেন তবে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় নিবেদন করি"। (এই পত্রখানি দীর্ঘাকার, সংক্ষেপে বর্ণিত হইল)।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের অশেষ ধৃতি ও কার্য্যকুশলতা বঙ্গবাসীগণ যখন অনুকরণ করিতে শিক্ষা করিবেন, তখনি বঙ্গের গৃহ-বিচ্ছেদ এবং বাঙ্গালির মোকদ্দমা করিবার বুদ্ধির অবশ্য লাঘব হইবে। তিনি অন্তরে অন্তরে বড়ই কুশলপ্রিয় থাকিয়া বাহ্যে নিপুণ কর্ম্মীর ন্যায় কর্ত্তব্য সাধন করিতেন। যে ভাগ্যবান পুরুষ ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও প্রেম স্বীয় আত্মায় উপলব্ধি করিয়া চিত্তের শান্তিলাভ করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ মহাত্মাদিগের জীবনের কার্য্যে দেখেন যে, কেবল মঙ্গলময় ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাই সৃষ্টিতে বিবিধ প্রকারে সংসিদ্ধ হইতেছে। যতদিন বাঙ্গালীরা কি ধর্ম্মে কি কর্ম্মে এই মহাপুরুষের আদর্শ অনুকরণ করিয়া বিচরণ না করিতেছে, ততদিন ভ্রাম্যমাণ ইহুদিগের ঘুরণচক্রবৎ ঘোরপাকে পড়িয়া বিব্রত হইবে। যেন তেন প্রকারেণ ভগবান ঐ মহৎ আদর্শেই বাঙ্গালী-জীবন সংগঠন করিবেন। এখনও যে ঐ মহাত্মাকে বঙ্গবাসী ভালরূপ চিনিতে পারে নাই ইহাই আশ্চর্য্য। সময় আসিতেছে, যখন মহাত্মা রামমোহনের জীবন বাঙ্গালীর পক্ষে একান্ত অনুসরণীয় হইবে। মানবকগুলী যদি ভগবৎ হস্তের কার্য্যের প্রতি চক্ষু রাখিয়া কুসংস্কারত্যাগ

পূর্ব্বক সত্যানুসরণ করে তবে কালের যে একটা কুটিলগতি আছে তাহার হাতে পড়িয়া আর অধিক দিন বিধ্বস্ত হইবে না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত।

ভগবৎকথা বলিতে, শ্রবণ করিতে, এবং বিবিধ উপায়ে তাঁহার নাম প্রচার করিতে সাধু উমেশচন্দ্রকে আন্তরিক অনুরাগী ও সতত প্রফুল্লচিত্ত দেখিয়া দর্শকমাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত না। ব্রাহ্ম গৃহস্থ-দিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে ব্রহ্মো-পাসনা ও গৃহানুষ্ঠানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে নিমন্ত্রণ করিতেন। তিনিও তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেন এবং এরূপ ক্রিয়া কলাপ ভগবৎ সেবার কার্য্য বলিয়া অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন। এসম্বন্ধে নিজের শরীরের সুখসচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অনবরত শ্রম ও যত্ন সহকারে ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। তাহা দেখিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের মনে তাঁহার শরীররক্ষা সম্বন্ধে ভয়ের সঞ্চার হইত। কিন্তু ব্রহ্ম-পদে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি এরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তন্, মন, ধন, এ সকলি তাঁহার নিকট ব্রহ্মপূজার উপকরণ সামগ্রী বলিয়া উপলব্ধি হইত। তিনি ঈশ্বরের প্রেমে এমনি মগ্ন থাকিতেন যে, তাঁহার নাম গান, ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। হিন্দি ভজন শুনিতে তিনি বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তিনি স্বয়ংও কথন কথন হিন্দি ভজন ভক্তিভরে গাহিতেন। নিম্নোদ্ধৃত ভজনটী তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

"হরি সে লাগি রহরে ভাই। তেরা বন্‌ত বন্‌ত বনি যাই। আরে তেরা বিগাড়ি বাত বনি যাই।

অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই (১) শুগা (২) পড়ায় কে গণিকা তারে, তারে মিরা বাই। (৩)

(১) "সুজন কসাই নামে বারানসী নগরে একজন হিন্দু মাংস বিক্রেতা ছিল। তাহার পায়ে বড়ই ক্লেশ দায়ক ঘা হইলে সে কাতর হইয়া হরিনাম করিতে প্রবৃত্ত হয়। হরিনাম করিতে করিতে হরি ভক্তিতে মত্ত থাকার কালে এক দিন দেখিল, তাহার ঘায়ে বিস্তর পোকা হইয়াছে, এবং তাহার কতক গুলি খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে, এবং কতক গুলি খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। তখন সেইগুলি তুলিয়া পুনরায় সেই ঘায়ে স্থাপিত করিয়া বলিল, "হায়! আমি কতশত পশু হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস অপর সাধারণকে দিয়া ভক্ষণ করাইয়াছি, এখন আমার মাংস কীটে ভক্ষণ করিলে যদি আমার এই গুরুতর পাপ হইতে তাইক ব্রহ্ম হরি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার

দৌলৎ শুনিয়া, মাল খাজনা বেবিয়া বয়েল চলাই, এক বাৎছে টাণ্ডা লাগে, খোজ খবর নাহি পাই।

আয়সি ভক্তি কর ঘট্ ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই, সেবা বন্দেগী আওর অধীনতা সহজে মিলি গোসাঞী।

এই সংগীতটীর প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল, ইহাতে তাঁহার ভগবৎ-ভক্তি ও সাধুভক্তি উভয়ই সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইত। তাঁহার জীবদ্দশায় একদা তাঁহার বিষয় কথনকালে একজন প্রাচীন ধর্ম্মাত্মা (যিনি এই সাধুকে বহু-দিন হইতে বিশেষ ভাবে জানিতেন ও প্রেমের চক্ষে দেখিতেন) বলিয়াছিলেন "উমেশ কি জান—'হরি সে লাগি রহরে ভাই।" ইহার অর্থ তিনি হরির সঙ্গে সতত সহবাস করিতেন। বাস্তবিক তিনি সঙ্গীতরূপ সুধাময় রস পানে তাঁহার জীবনকে এতাধিক মধুময় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সাধুভক্তি এরূপ প্রবল ছিল যে, কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় যে কোন সাধুপুরুষকে দর্শন করিতেন' তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এই মহাত্মার আবির্ভাব ও তিরোভাব দিনে তিনি তাঁহার প্রিয় সিটিকলেজের ঘরে (হলে) সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সেই সভার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার জন্য কত না চেষ্টা যত্ন ও শ্রম করিতেন। প্রতি বৎসর ২৭ শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ দিবসে অতি সমারোহপূর্ব্বক উপরোক্ত স্থানে এক বৃহৎ সভার অধি-বেশন হয়। এই সভাস্থলে কলিকাতার অনেক কৃতবিদ্য, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের ছাত্রেরা আসিয়া যোগদান করে। কলেজের উপরকার হল ও নিম্নের প্রাঙ্গণ প্রায়ই পূর্ণ হইয়া যায়। সাধু উমেশচন্দ্র শেষ জীবনে ঐ সভার যথেষ্ট উন্নতি দেখিয়া গিয়াছেন। সে সভা তাহার দেহান্তের পর আরও উন্নতাকার ধারণ করিয়াছে। এজন্য কলেজের বর্ত্তমান অবিভাবক এবং উক্ত শুভকর্ম্মের সহায়ভূতিকারিগণ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রতি সাধু উমেশচন্দ্রের অসাধারণ ভক্তি ছিল। মহর্ষিদেবও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যদিও মহর্ষির স্নেহ ও প্রেম

করেন, তবেই হয়। দয়াল হরি সত্যই তাঁহাকে ভক্তের ভজনাঙ্গ হইয়াছে "তারে শুজন কসাই"।

(২) "শুগা" মানে শুক পক্ষী। এক গণিকা শুক পাখীকে হরিনাম পড়াইতে পড়াইতে দর্শন দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাহার হৃদয়ে হরিভক্তির উদয় হয়, সে তখন তাহার পাপমতি পরিত্যাগ করিয়া হরিপ্রেমে মগ্ন হওয়ায় তরিয়া গিয়াছিল। তাই ঐ ভজনে আছে "শুগা পড়ায় কে গণিকা তারে।"

(৩) মিরা বাইয়ের হরি ভক্তির কথা ভক্তমণ্ডলে সমাদৃত এবং তাহা বহু বহু ভজনে গৃহীত। মিরা বাইয়ের জীবন চরিত পাঠে তাহার আশ্চর্য্য ধর্ম্ম জীবন ও ভক্তিভাব দেখিয়া কেনা মুগ্ধ হয়?

ব্রহ্মোপাসক মাত্রের প্রতি সতত স্নেহ-ভাবে বর্ষিত হইত, তথাপি ঐ সাধুর প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতির প্রকাশ দেখিয়া কে না আনন্দ প্রকাশ করিত? প্রায় আট বৎসর হইল একবার সাধু উমেশ চন্দ্রের সঙ্গে বোলপুর শান্তি নিকেতন দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তথায় কয়েকদিন অবস্থিতি কালে দেখিয়াছিলাম মহর্ষিদেব কলিকাতায় ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী ও স্বগৃহে প্রস্তুত মিষ্টান্ন তাঁহার প্রতি অতীব স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্ম যাত্রী তাঁহার সহিত উক্ত নিকেতন দর্শন করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা উক্ত খাদ্য সামগ্রী ও মিষ্টান্ন তথাকার প্রস্তুত করা প্রচুর ভোজ্য দ্রব্য সহ চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহারের রস ভোগে বড়ই প্রীত হইয়া-ছিলেন। অনেক সময় সাধু সঙ্গে এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সচ্ছন্দকর ব্যাপার উপস্থিত হয় যে, আত্মা, মন ও শরীর এ তিনই যথো-চিত আহার পাইয়া পুষ্টিলাভ করে। মহর্ষি দেবের উপদেশ মস্তকে করিয়া ঐ যাত্রীরা সে সময় গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সাধু উমেশচন্দ্রের তথায় গমনে যে ঐ সমস্ত খুব উৎসাহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। শান্তি নিকেতনে সেই তীর্থ যাত্রা আমার স্মৃতি পথ হইতে অপসৃত হইবার নহে।

প্রাগুক্ত সাধুর স্বদেশ হিতৈষিতার ভাব কেবলমাত্র ব্রহ্মপ্রীতি কামনায় উদ্ভূত হইত এবং তাহা তিনি সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিতেন। মূক-বধির বিদ্যালয়ের সূত্রপাত তাঁহার উদার প্রেমের ও অহরহ ভগবৎ সেবার ফল। অনাথ আশ্রমের কার্য্য তিনি আরম্ভ করিয়া বহু যত্নে সচল রাখিয়া ছিলেন। পরে তাহার ভার তিনি কতকগুলি হিত-সাধক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগর গ্রামে তিনি কয়েক-বার তাঁহার কয়েকটী ব্রাহ্ম বন্ধুকে লইয়া গমন করিয়া যাহাতে ঐ মহাত্মার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ সেখানে কিছু করা হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা ও সে চেষ্টা দুর্ভাগ্য ক্রমে ব্রাহ্মগণের সহানুভূতির অভাবে সম্পন্ন না হওয়ায় তাঁহার বড়ই সন্তাপের বিষয় হইয়াছিল! মহাত্মা রামমোহন রায়ের জন্ম ভূমিতে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থে সাধু উমেশ-চন্দ্রের পরিশ্রম, যত্ন ও ত্যাগ স্বীকারের ক্রটি ছিল না। তাহা দেখিয়া তাঁহাকে "সাধু! সাধু," বলিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই ধন্যবাদ করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই সাধুকার্য্য প্রকৃত পক্ষে বোধগম্য করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করার পক্ষে আন্তরিক ভাবে সহায়তা করে এমন একজনও ব্যক্তি দেখা গেল না। তবে তিনি এ সম্বন্ধে যে সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা যাইবার নহে। কালে তাঁহার ঐ শুভ

ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, কারণ "সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়" ইহা প্রামাণিক কথা।

সাধু কর্ম্মের ফল কখন কখন বিলম্বে ফলে। এই বিলম্ব দেখিয়া মানুষ যে নিরাশ হয় তাহা কেবল অজ্ঞতা বশতঃ ঘটে। সে অজ্ঞতা অন্য কারণে নহে, কেবল বিধাতার হস্ত যে "কাল" ও "অনন্ত" এ উভয়েই নিহিত তাহা দেখিতে না পাওয়াতে তাহা হৃদয়কে বিষাদে সমাচ্ছন্ন করে। ইহা ভেদ করিয়া এই পূজনীয় সাধুর উজ্জ্বল আত্মার কি সম্পন্ন কি অসম্পন্ন কার্য্য তাহা আনুপূর্ব্বিক নিবদ্ধ রাখিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিলে সকলেই বিস্তর উপকার লাভ করিতে পারেন। সাধু উমেশ চন্দ্রের মত সত্যপরায়ণ, জ্ঞানী, উদার, ও ধৈর্য্যশীল, সতত মঙ্গলকল্প, বিনীত ও ধীর এবং ভগবৎ প্রেম ও ভক্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির জীবনকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী পুরুষ সনাতন এই দুর্ব্বল বঙ্গভূমে বৃথা পাঠান নাই। তাঁহার মহতী ইচ্ছার পূর্ণতার জন্য তাঁহাকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধু জীবনের "চিদাকার পুনরুত্থানে" ভাবী বঙ্গবাসীগণ দেখিতে পাইবেন মজিলপুর নিবাসী এই গৃহস্থ সন্তান-উমেশচন্দ্রের জীবন বঙ্গের সাধুতার আদর্শ ক্ষেত্রে কত অধিক জয়-যুক্ত হইবে। ধন্য সেই জননী যিনি এরূপ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। সাধু উমেশচন্দ্রের জীবন কীর্ত্তনক্ষেত্রে আর কি বলিব? কেবল এই বলি তাঁহার "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা!

পরিব্রাজক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুক্তপ্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা—কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া যুক্তপ্রদেশের বালক বালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত নৈনিতালে একটী কমিটির অধিবেশন হইবে।

লহোরে নারীদিগের ভ্রমণের স্থান—লহোরের আর্য্যসমাজ নারীদিগের বায়ুসেবন ও ভ্রমণের জন্য একটী উদ্যান মিউনিসিপ্যালিটিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কলিকাতাও এসম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছে। ফল কতদূর হইবে বলা যায় না।

বিহারে বিশ্ববিদ্যালয়—বিহারে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে অভি-জ্ঞতা লাভের জন্য মিঃ স্লাগান নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঁকিপুর হইতে কয়েক

মাইল দূরে স্বাস্থ্যকর স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইবে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শিশু চিকিৎসা সম্মিলন—

আগামী গ্রীষ্মঋতুতে লণ্ডনে শিশু-চিকিৎসা সন্মিলনীর এক বিরাট অধিবেশন হইবে। তাহাতে শিশুদিগের অকাল মৃত্যু ও শিশু-পীড়ার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারিত হইবে।

সম্রাটের জন্ম দিন উপলক্ষে উপাধি দান—ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর উপাধি বিতরণ করিয়াছেন।

এ বৎসর জি, সি, আই, ই; ও কে, সি, আই, ই উপাধিলাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

অকাল বিয়োগ—

আমরা অতি ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, বঙ্গ জননীর আর এক কৃতি সন্তান কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয় হঠাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোক চলিয়া গিয়াছেন। কবিবরের এই অকাল বিয়োগে দেশের অত্যন্ত ক্ষতি হইল। অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের হাসির গান ও জাতীয় সঙ্গীত সাহিত্যের অতি অমূল্য সম্পদ।

এ বৎসর বঙ্গজননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া কত যোগ্য সন্তান চলিয়া যাইলেন, ইহাদের স্থান কত যুগে পূর্ণ হইবে বলা যায় না।

পুরস্কার দান—

শ্রীমতি হেমন্ত কুমারী চৌধুরী ১৯১২ ও ১৩ সালে দেশীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ছোটলাট তাঁহাকে তিনশত টাকা পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল—

এ বৎসর প্রায় ৯ হাজার ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ৬৯৩৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে প্রথম বিভাগে ৪৪৯৩, দ্বিতীয় বিভাগে ২২১৩ ও তৃতীয় বিভাগে ২৩১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কাল্পনিক স্বাস্থ্য বিকার।

শরীরের উপর মনের প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মন অসুস্থ হইলে শরীর অসুস্থ হয়। শোকাদি কারণে মন অস্থির হইলে শরীরও শীর্ণ হইয়া থাকে। অপর পক্ষে শরীর অসুস্থ হইলে মন যদি প্রফুল্ল থাকে তাহা হইলে কষ্টের অনেক উপশম হয় এবং ক্রমে শরীরও নীরোগ হয়। অদ্য আমরা ইহার একটী অপূর্ব্ব উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিলাম।

এতদ্দেশে একটী যুবা রাজপুরুষ অতিরিক্ত পরিশ্রম ও গ্রীষ্মাতিশয্য

প্রযুক্ত ক্লান্ত হইয়া জনৈক বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ প্রার্থী হন। চিকিৎসক তাঁহার হৃদয় ও অন্যান্য অবয়ব পরীক্ষা করিয়া অবিলম্বে ব্যবস্থাপত্র পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া চলিয়া যান। পর দিবস তাঁহাকে যে পত্র পাঠাইলেন তাহাতে লেখা ছিল "আপনার বিষম হৃদরোগ উপস্থিত। বাম দিকের ফুসফুস একেবারে নাই বলিলেই হয়; বাস্তবিক আপনার অবস্থা অতীব মন্দ, তবে দুই এক সপ্তাহ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। যাহা হউক আপনার যে সকল অত্যাবশ্যক কার্য্য অসম্পূর্ণ আছে তাহা যেন শীঘ্র সম্পন্ন করেন।" বলা বাহুল্য যে যুবক পত্র প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর "বিলম্ব নাই" বিবেচনা করিয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িলন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইল এবং শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল, গাত্রবেদনা ও প্রদাহ উপস্থিত হইল এবং হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে শয্যা অবলম্বন করিলেন এবং আর যেন কখন শয্যা হইতে উঠিতে হইবে না ভাবিয়া নিরাশ হইলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার যাতনার সীমা রহিল না। প্রাতঃকালে তাঁহার ভৃত্য সেই চিকিৎসককে সংবাদ দিল। চিকিৎসক শুনিবা মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারও মনে অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি ধীরে ধীরে শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অকস্মাৎ এরূপ অবস্থা হইবার কারণ কি? গতকল্য তো ইহার কোন লক্ষণই ছিল না।" রোগী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন "বোধ হয় আমার হৃদরোগ বৃদ্ধি হইয়া এইরূপ যন্ত্রণা হইয়াছে।" ডাক্তার বলিলেন "হৃদরোগ কি? গতকল্য আমি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়াছি এবং এখনও দেখিতেছি হৃদয় স্থলে কোনও বিকার ঘটে নাই।" "তবে বুঝি ফুসফুস খারাপ হইয়াছে" বলিয়া রোগী হাঁপাইতে লাগিলেন। ডাক্তার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আপনার ব্যাপার কি? আপনি কি মদ খাইয়াছেন? তাহাও তো বোধ হইতেছে না।" রোগী হাঁপাইতে হাঁপাইতে উত্তর করিলেন "আপনার সেই ব্যবস্থা পত্র। আপনি বলিয়াছিলেন আমি কেবল দুই এক সপ্তাহ মাত্র বাঁচিতে পারি।" ডাক্তার বলিলেন, "আপনি পাগল হইয়াছেন, আমি আপনাকে কয়েক সপ্তাহ ছুটী লইয়া পাহাড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি, তদ্দ্বারাই আপনার বিশেষ উপকার হইবে।" রোগী আর কোন উত্তর না দিয়া বালিসের নিম্ন হইতে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। ডাক্তার পত্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন "এ ব্যবস্থা পত্র অন্য একটী ভদ্র লোকের জন্য। বোধ হয় আমার সহকারী ভ্রম বশতঃ আপনার ব্যবস্থাপত্র তাঁহাকে এবং তাঁহার খানা আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই। আপনি

শীঘ্র ছুটী লইয়া পাহাড়ে যান আপনার অন্য কোন ঔষধের আবশ্যক নাই।" ডাক্তারের কথা শুনিয়াই যেন রোগীর সমুদায় পীড়া অন্তরিত হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং শীঘ্রই আপনকার নিয়মিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি ইহাঁর ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছিলেন তিনি পাহাড়ে বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইবেন এই আশায় আহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাহাড়ে যাত্রা করিলেন এবং কিছু দিন তথায় অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। মানসিক প্রফুল্লতার স্ফুর্ত্তি রোগের অমোঘ ঔষধ, ইহার দ্বারা আসন্ন মৃত্যুও নিবারিত হইতে পারে। অন্ততঃ মৃত্যুকালীন যন্ত্রণারও অনেক উপশম হয়।

লেডী ক্লেয়ার।

১

হইয়াছে বিকশিত স্থলজ কমল
আকাশেতে অতি উচ্চে আছে মেঘদল
রোলাণ্ড মাতুল-সুতা
ক্লেয়ারের লাগি তথা
আনিল হরিণী এক যেন শতদল।

২

কার (ও) প্রতি ঘৃণাকার (ও) জন্মে নাই মনে
বহুদিন বাগদত্ত প্রেমিক দুজনে
রজনী প্রভাত যবে
দোঁহে বিবাহিত হবে
পরমেশ আশীষ করুণ এই দিনে।

৩

"ইহাই উত্তম অতি" বলিছে সুন্দরী
"অতীব সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম মোর হেরি
অথবা বিভব আশে
রোলাণ্ড না ভাল বাসে
ভালবাসে মোরে শুধু মোর গুণ হেরি"।

৪

এলিস নামেতে ধাত্রী করে জিজ্ঞাসন
"তোমার নিকট হতে গেল কোনজন?"
কহিল লেডী ক্লেয়ার
"সম্বন্ধে ভ্রাতা আমার
কালি হবে দুজনার বিবাহ বন্ধন।"

৫

এলিস কহিল ঘটে সকল বিষয়
এহেন সুচারু রূপে ধন্য দয়াময়।
তোমার যত বিভব
রোলাণ্ডের তাহা সব
শুন বৎসে মহিলা ক্লেয়ার তুমি নয়।"

৬

"উন্মাদিনী হয়েছ কি তুমি ধাত্রী মাতা?
কেন কহিতেছ হেন উচ্ছৃঙ্খল কথা?"
কহিল ধাত্রী এলিস
"স্বরগে আছেন ঈশ
সত্য কথা শুন তুমি আমার দুহিতা।

৭

যখন মরিল বৃদ্ধ আরলের সুতা
আমার বক্ষের পরে শুন সত্য কথা
আপন সন্তান প্রায়
সমাধিস্থ করি তায়
রাখিনু তাহার স্থানে আপন দুহিতা।

৮

ক্লেয়ার কহিল যদি সত্য ইহা হয়
করেছ জননি তুমি বড়ই অন্যায়
শ্রেষ্ঠ যিনি ধরাপরে
তাঁর নিজ অধিকারে
বঞ্চিত করন তাঁরে উচিত তো নয়।

৯

কহিল এলিস ধাত্রী একথা শ্রবণে
"ভাঙ্গিওনা এ রহস্য কখন জীবনে
তোমার বিভব যত
রোলাণ্ডের হবে তা'ত
পতি পত্নীরূপে যবে মিলিবে দুজনে।"

১০

"জন্মাবধি যদি মাতা আমি ভিখারিণী
প্রকাশিব তাহা না কহিব মিথ্যাবাণী
এই স্বর্ণ অলঙ্কার
এই হীরকের হার
ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও এখনি জননি।"

১১

এলিস কহিল তবে হইয়া হতাশ
যতক্ষণ সাধ্য তব না কর প্রকাশ"
ক্লেয়ার কহিল কথা
"দেখি আজি সরলতা
করে কি না মানবের হৃদয়ে নিবাস।"

১২

"সরলতা" কহে ধাত্রী এলিস তখন
"সত্বেতে আকৃষ্ট হবে রোলাণ্ডের মন"
উত্তর দিল সুন্দরী
"আজি যদি আমি মরি
তথাপি রোলাণ্ড আজি পাবে নিজধন।"

১৩

"তোমার মাতারে কর বারেক চুম্বন,
পাপ করিয়াছি আমি তোমারি কারণ"।
ক্লেয়ার কহিল শুনি
"বিস্ময় রসে জননি
হয়েছে আপ্লুত অতি আজি মোর মন।

১৪

"করেছ জননি তুমি যদিও অন্যায়
তথাপি ক্ষমা আমি করিব তোমায়
গমনের পূর্ব্বে মোর,
আমার মস্তক পর
হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করহ আমায়।"

১৫

লোহিত গাউনে ঢাকে তনু সুকুমার
এখন সে নহে আর মহিলা ক্লেয়ার
দিয়া গিরি উপত্যকা
সুন্দরী চলিল একা
শোভিছে গোলাপ এক চিকুর মাঝার।

১৬

শুয়েছিল রোলাণ্ডের আনীত হরিণী
একপার্শ্বে, লাফাইয়া উঠি সে অমনি
কুমারীর হস্ত পরে
রাখিয়া আপন শিরে
চলিল হইয়া তার পশ্চাৎ গামিনী।

১৭

রোলাণ্ড প্রাসাদ হতে নামিয়া ত্বরায়
কহিল "ক্লেয়ার কেন নিজ অবস্থায়
লজ্জা দাও, কোন কাজে
গ্রাম্য বালিকার সাজে
আসিয়াছ ? রম্য ফুল তুমি যে ধরায়।"

১৮

"যদি এসে থাকি গ্রাম্য বালিকার বেশে
চলিতেছি আমি নিজ অদৃষ্টের বশে
শুন সত্য কথা কহি
মহিলা ক্লেয়ার নহি
জন্ম ভিখারিণী আমি শুনিতেছি শেষে।"

১৯

রোলাণ্ড কহিল মোরে প্রতারণা করি
কি ফল ক্লেয়ার কহ আমিত তোমারি
কহ শুনি কি কারণ
মোরে কর প্রবঞ্চন
বুঝিতে কঠিন বড় তোমার চাতুরী।"

২০

অমনি গম্ভীর ভাবে দাঁড়ায়ে মহিলা
একদৃষ্টে রোলাণ্ডের দিকেতে চাহিয়া
দুর্ব্বলতা-শূন্য মনে
চাহি তার চক্ষু পানে
ধাত্রী এলিসের কথা সকাল কহিল।

২১

হর্ষে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া অমনি
রোলাণ্ড চুম্বিল গিয়া ক্লেয়ারে তখনি
কহিল 'আমিই যদি
সম্পর্কে নিকট অতি
জন্মাবধি নহ তুমি বিভব-স্বামিনী।

২২

বিষয়ে আমারি যদি আছে অধিকার
বদ্ধ হব দুই জনে করি অঙ্গীকার
কল্যকার প্রাতঃকালে
বিবাহ বন্ধন জালে
তখনও থাকিবে তুমি মহিলা ক্লেয়ার।"

নূতন সংবাদ।

১। স্যার দোরাব তাতা ভারতে স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

২। বেতিয়ার মহারাণী জানকী কোয়ার বাঁকিপুরে শিক্ষয়িত্রীদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত বাদসা নবাবজি ট্রেনিং কলেজ সংশ্লিষ্ট হিন্দু হোষ্টেল নির্ম্মাণ কল্পে ১০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট আলিগড় মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩। ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে এবৎসর সমস্ত ভারতবর্ষে ২৪৭ জন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪। অকস্মাৎ মটরগাড়ীর সংঘর্ষণ হওয়ায় মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর গাড়ির তলায় পড়িয়া যান। ভগবানের বিশেষ কৃপায় তিনি কোনরূপ

আঘাত প্রাপ্ত হন নাই।

আজ ১৫ দিন হইল অতিরিক্ত বর্ষায় ভারতের নানাস্থান জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা সহরের অবস্থাও তদ্রূপ।

ম্যাট্রিকুলেশন পরিক্ষার ফল।

এবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শত করা প্রায় ৮০ জন পাশ হইয়াছে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত বালিকাগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম বিভাগ।

ঊষা আচার্য্য—লোরোটো হাউস।

এলেন আর্মষ্টেড—এডেন গার্লস্ হাই স্কুল ঢাকা। মণিকা সেন, ক্রাইষ্ট চার্চ।

কমলকলিকা বসু—ডাইওসিসন।

লিজি বরগেস—লোরেটো।

মাধুরী দত্ত—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।

সুখময়ী লাহিড়ী—বেথুন স্কুল।

জ্যোৎস্নাময়ী সেন—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।

সুহাসিনী চক্রবর্ত্তী—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।

শান্তিলতা চট্টোপাধ্যায়—ছোট নাগপুর, গিরিধি।

ক্ষেমঙ্করী দে— ”

পুর্ণিমা ঘোষাল— ”

সুকৃতি—বেথুন স্কুল

শান্তা সরকার—লোরেটো

সুনীতিবালা সোম—বেথুন স্কুল।

মণীষী রায়—ছোটনাগপুর, গিরিধি।

দ্বিতীয় বিভাগ।

প্রভাময়ী দাস—ঢাকা ইডেন।

বীণা— ”

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত বালিকাগণ ইণ্টারমিডিয়েট (অর্থাৎ আই এ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রথম বিভাগ।

জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ—বেথুন কলেজ।

সুসমা সিংহ রায়— ”

চন্দ্রমুখী সারঙ্গী—বেথুন কলেজ।

লীলা চৌধুরী—ডাইওসিসন কলেজ

দ্বিতীয় বিভাগ।

ওলিভ আঢ্যি—ডাইওসিসন

সুপ্রভা ভাটাচার্য্য— ”

লাবণ্যলতা চন্দ—বেথুন কলেজ।

মুক্তাপ্রভা ঘোষ—ডাইওসিসন।
সুধাংশুবালা হাজরা—প্রাইভেট।
অমরবালা পাল—বেথুন কলেজ।
চারুশীলা রায়—বেথুন কলেজ।

তৃতীয় বিভাগ।

বিভাময়ী বসু—বেথুন কলেজ।

বামারচনা।

পরাণ আকুল করে।

কি যেন কি কথা হইয়ে স্মরণ,
নাহি লাগে ভাল সুখের ভবন,
পরাণ আকুল করে।
উষার কুসুম ছড়ায়ে সুবাস,
আমোদিত যবে করে চারিপাশ
পরাণ আকুল করে।
বিহগনিকর মনের হরিষে,
গায় যবে গান তরুশাখে বসে,
পরাণ আকুল করে।
রাঙা রবি যবে পূরব আকাশে,
ছড়ায়ে কিরণ আঁধার বিনাশে
পরাণ আকুল করে।
কৃষক-বালিকা দিবা অবসানে,
গেয়ে গীত যবে ফিরে গৃহপানে,
পরাণ আকুল করে।
ছড়ায়ে জোছনা চাঁদিমা যখন,
পাগল করেগো চকোরের মন,
আকুল পরাণ কি যেন কি চায়,
কার পানে সদা ছুটে চলে যায়,
পারিনা রাখিতে ধরে।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।
ছনহরা

জীবন মুকুল কাহিনী।

সৌরভ বিহীন জীবন-মুকুল
নিবিড় পল্লীর গহনে,
আধেক শুকায়ে বৃন্তচ্যুত হয়ে
চুম্বিল ধরণী গোপনে।
না চাহি ফিরিয়া কত পান্থজন
ভূপতিত ওই কলিরে,
নির্ম্মমের মত দলিল চরণে
কি জানি কেমনে কি করে।
শুধু হায়, রাখি একলক্ষ্যে
নশ্বর জানিয়া এ ভবে,
কত সুভাষণ পরিহাস-ঝঞ্ঝা
সহিল মুকুল নীরবে।
বসুধার যত ধূলি বালি কাদা
রাখিল আবরি তাহারে,
পশিল না তবু কিছু যেগো তা
প্রাণ কলি রেণু মাঝারে।
আপনার মনে সে যে ভাবে নিতি
উর্দ্ধমুখী হয়ে কাঁদিয়া;
"বৃথা কি আমারে পাঠালে ভুবনে
উদ্দেশ্য বিহীন করিয়া?

যদি মোরে দিয়ে বিশাল ধরায়
নাহি হবে কাজ কেন গো
কেন প্রভো! তবে পাঠাইলে হায়।
রাখিলে জীবন কেন গো" ?
সহসা অনেক দয়াল পথিক
ভ্রমিতে সংসার কাননে,
হেরি চকিতে পদতলে তায়
তুলিল পুলকে যতনে।
যত ধূলি কাদা মুছায়ে আদরে
উঠায়ে লইল হৃদয়ে,
নিজ গৃহে এনে গৃহ-ফুলদানে
রাখিল মুকুলে সাজায়ে।
ধীরে ধীরে স্নেহ-ধারাসিঞ্চি
করিল সরস তাহারে,
মলিনতা রাশি দূরে গেল ক্রমে
চেনা হল দায় তাহারে।
পথিকের ঘরে আসিত যে জন
বারেক সস্নেহ নয়নে,
গৃহ-ফুলদানে সাজান মুকুলে
লাগিল তুষিতে যতনে।
সুনিবিড় পল্লী বিপনে জনমি
আধেক বিকাশি যে কলি
বৃন্তচ্যুত হয়ে চরণ দলিতা
হয়েছে হায়রে কেবলি—
আজি সে নিরখি সুখের গৌরবে
পুলকে উঠিল শিহরি,
বুঝিল আকুল গোপন সাধনা
করিল সফল শ্রীহরি।
কৃতজ্ঞতা রসে তিতিল হৃদয়
ভক্তি-ধারা বহে নয়নে
আকুল উচ্ছাসে বলে কৃপাময়ে,
"চির স্থান দিও চরণে"

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

শিশুর প্রতি।

কোমল শোভন শিশু মনের সুখে।
আদরে ফুটিয়েছিল মায়ের বুকে।
মায়ায় স্নেহেতে তোরে পুষিয়ে যতনে।
নিশিদিন তোরলাগি ভাবি প্রাণপনে
লইলিনা এক বিন্দু এক রতি তার
চরণে ঠেলিয়া গেলি বল ডাকে কার?
অসীম অপার এই স্নেহের বন্ধন
করেনিক এতটুকু ব্যাকুলিত মন?
দুদিনে করিয়া সাঙ্গ হেতাকার খেলা।
চলে গেলি ওরে তুই না ফুরাতে বেলা
স্বরগের চির পুত অমর রতন!
চিনিলাম না তোরে কেন কেহ এতক্ষণ!
দেব—শিখাতে দিয়েছিলে হরে নিলে কেন?
কোন প্রাণে দিলে তুমি বেদনা এমন।
সুদৃঢ় স্নেহের গ্রন্থি ছিন্ন করি হায়
কেমনেরে শিশু তুই লইলি বিদায়?
তোর তরে হিয়া আজি ব্যাকুলিত কার?
পাবেনা কি পুন দেখা এই চিন্তাসার
এ স্নেহের ডোর তুই কেমনে কাটিয়া,

কি সুখে গেলিরে তুই কিসের লাগিয়া ?
তোমারি সুখের লাগি ভাবি অনুক্ষণ—
বৃথায় রহিল পড়ে অতুল যতন
দেখিনিতো তোমা আমি ক্ষণমাত্র তরে
তবুও কাঁদেরে প্রাণ তোমা হেরিবারে।
কেমনে রহিলি সেথা ভুলি অকাতরে
অনন্ত নিদ্রার কোলে ঘুমায়ে গভীরে॥

কুমারী সুনীতি ভাদুড়ী
কেশব-ধাম,
বেনারস।

কামনা।

দুখ, ব্যথা, ক্লেশ, যাতনা অশেষ,
নীরবে সহিব আমি,
সবার ভিতরে, মৃদু মধু স্বরে,
আমারে ডাকিও স্বামী।
ও গো বিশ্ব রাজ, তোমারই কাজ,
সাধিতে শকতি দাও,
তোমারি জগতে, সরল সুপথে,
বারেক আশিষি নাও।
দাও জগপতি, সাহস, সুমতি,
সংসার-সাগর মাঝে,
ভক্তি, ভালবাসা, উৎসাহ ও আশা,
সদা যেন বুকে রাজে।
পাপ, মলিণতা, হিংসা, কাতরতা
দূরে সব ভেসে যাক্,
তোমারি চরণে, জীবনে, মরণে
কামনা আমারি থাক।

শ্রীহেমন্ত বালা দত্ত।

১৩।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আণ্টিবাগান লেন হইতে প্রকশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 600. August, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৬০০ সংখ্যা। } শ্রাবণ, ১৩২০। আগষ্ট, ১৯১৩ { ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

প্রার্থনা।

১

কোথা তুমি—কত দূরে,
কোন্ আলোকের পুরে,
এত আমি খুঁজি তবু না পাই সন্ধান,
অথচ নিরখি চক্ষে
সমস্ত জগতবক্ষে,
তোমারি করুণা দয়া সদা বর্ত্তমান।

২

তুমিই অলক্ষ্যে ঢা'ল,
ঊষার মধুর আলো,
হাসাও রক্তিম রবি সুবর্ণ-অচলে,
কর্ম্মময় দিনমান,
জড়তার অবসান,
জীবগণ খাটে তব অপার কৌশলে।

৩

সে তপন ক্রমে ধীরে,
ডোবে নীল সিন্ধুনীরে,
রজত জ্যোছনা-ধারা ঢালে শশধর,
অথবা তামসী রাত্রি,
অনন্তের কোটি যাত্রী,
নিয়া আসে তারা-রূপে আকাশ উপর।

৪

শান্তিময়ী নিশা রাণী
বিছায়ে অঞ্চলখানি,
শ্রান্ত সন্তানেরে রাখে সুখের নিদ্রায়,
এ সব কাহার কার্য্য,
কার এ স্নেহের রাজ্য,
কে পালে মহৎ ক্ষুদ্রে এত সুবিধায়?

৫

নীরস নিদাঘশেষে,
বরষা বিরাজে এসে,
জুড়াইতে ধরণীর দগ্ধ হিয়াখানি,
সাধিতে বিশ্বের হিত,
আসে সে শরত শীত,
তার পরে ধরা-লক্ষ্মী বসন্তের রাণী।

নদ নদী সরোবর,
জলভরা নিরন্তর,
উছলি স্বরগশোভা ফুল ফোটে বনে,
বিহঙ্গ-কাকলী যবে,
ভব ভরে সুধা রবে,
কত মধুরতা আহা! মৃদুল পবনে!

৭

মানবে রক্ষিতে হরি!
মায়ের হৃদয় ভরি,
অসীম অমৃত সিন্ধু করিয়াছ দান,
দেছ পিতা ভাই বোন,
স্নেহময় পরিজন,
দম্পতীর প্রাণভরা প্রেমের তুফান!

৮

আবার আবার নাথ!
ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত,
অগ্নিকাণ্ড, কালসর্প, শার্দ্দূলদশন,
মানবের মহাপাপ,
অজ্ঞানতা, শোক, তাপ,
সবি তব শুভ ইচ্ছা করিছে সাধন!

৯

তোমার মঙ্গল আশা,
অপার্থিব ভালবাসা
বুঝিতে শকতি মোরে দিবে তুমি কবে,
কিছু আমি নাহি চাই,
প্রয়োজনে সবি পাই,
তোমার প্রেমের রাজ্যে রহিয়াছি সবে।

১০

তবু চিত্তে লাগে ব্যথা,
শুন'না অনেক কথা—
তাই কত দিন ভাবি তুমি বা নিঠুর,
ভাবিতে তা কাঁপে বুক,
খুঁজি তব প্রেম মুখ,
আশা ও আশ্বাস মাখা দয়ার ঠাকুর।

১১

কবে তুমি দিবে দেখা,
কত কাল র'ব একা,
লইয়া সংশয় এত, শত অবিশ্বাস,
এ নীচতা যাবে কবে,
কত কালে যোগ্য হবে,
এ অধম—বল বল করিয়া প্রকাশ।

১২

কবে সে বুঝিব মর্ম্ম,
করিব তোমারি কর্ম্ম,
তোমার ইচ্ছার সনে মিলাব কামনা,
কোন্ যুগে, কোথা, কবে,
মোর সে সুদিন হবে,
কবে বা শুনিবে এই আকুল প্রার্থনা?

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

অধ্যবসায়ের পুরস্কার।*

দুঃখীরামের অদৃষ্টে পিতৃদর্শন-সুখ লাভ ঘটে নাই। সে যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখন তাহার পিতা পরলোকে

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

গমন করেন। দুঃখিনী বিধবা, স্বামীর পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধরিয়া অতি কষ্টে সন্তানটীকে প্রতিপালন করিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে, অভাব ও দৈন্য পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বদা বিরাজ করিত। তিনি নিজে অর্দ্ধাশনে, অনশনে থাকিয়া পুত্রটীকে মানুষ করিতেছিলেন। বড় দুঃখে জন্ম, তাই পুত্রের নাম দুঃখীরাম রাখিয়াছিলেন। দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস, গত হইয়া, ক্রমে বৎসর অতীত হইল, শুক্ল পক্ষের শশধরের মত, ধীরে ধীরে দুঃখীরাম বড় হইতে লাগিল। সেই সুকুমার মুখখানি সস্নেহে চুম্বন করিয়া বিধবা নীরবে চক্ষের জল ফেলিতেন, আর মনে মনে বলিতেন, "ঠাকুর! আমার দুঃখীরাম মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি সুখের মুখ দেখিল না, তাহাকে সুখী কর, তাহাকে চিরজীবী কর।" এইরূপে কত প্রার্থনাই করিতেন। বিপদভঞ্জন মধুসূদন তাঁহার প্রার্থনা শুনেন নাই, এ কথা বলিতে পারি না। জননীর স্নেহে, যত্নে ও পালনে শিশু দুঃখীরাম পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল।

দুঃখীরামের মাতা স্ত্রীলোক হইলেও, বুদ্ধিমতী ও সচ্চরিত্রা ছিলেন। তিনি দুঃখীরামকে গল্পচ্ছলে সর্ব্বদা নানারূপ সদুপদেশ দিতেন, আর মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "বাবা! কবে তুমি লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইবে? আমাদের দুঃখ ঘুচিবে?" দুঃখীরাম মাতাকে বলিত, "মা! লেখা পড়া শিখিলে কি মানুষ হয়? তবে আমি লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইব।"

২

গ্রামের জমীদার চৌধুরী বাবুদের প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপের প্রশস্ত দালানে পাঠশালা বসিয়াছে। প্রায় পঞ্চাশটী বালক সেখানে পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত আছে। পাঠশালাটী জমীদার বাবুদের স্থাপিত, তাঁহাদের বেতনভোগী তিন জন শিক্ষক শিক্ষাদান করেন।

সমবয়স্ক কয়েকটী বালকের সহিত দুঃখীরাম পাঠশালায় আসিয়াছে। কিন্তু পাঠশালায় আসিতে হইলে যে সব বস্তুর প্রয়োজন হয়, দুঃখীরামের তাহার কিছুই ছিল না, সে রিক্ত হস্তেই আসিয়াছিল। আজ কয় দিবস হইতে দুঃখীরাম লেখা পড়া শিখিবার উদ্দেশ্যে বাবুদের পাঠশালায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু কেবল যাতায়াতই সার হইতেছে, ফল কিছুই হইতেছে না।

চৌধুরী বাবুদের মধ্যে সূর্য্যকান্ত বাবুকে সকলেই বিশেষ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। সূর্য্যকান্ত বাবু জমীদারের সন্তান হইয়া কখনও অলস বা অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিতেন না। তখন নীলকর সাহেবদিগের অসীম প্রতাপ। প্রায় প্রতি গ্রামে নীলের কুঠি ছিল। সূর্য্যকান্ত বাবু স্বেচ্ছায় তাঁহাদের গ্রামস্থ নীলকুঠীর দেওয়ানী পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্যাচারীর অত্যাচার সাধ্যমত নিবারণ করা ও সদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ

আর্ত্ত, দুঃখী ও বিপন্নদিগকে দান করাই তাঁহার এই কার্য্য গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

সূর্য্যকান্ত বাবু যখনই বাড়ীতে থাকিতেন, তখনই পাঠশালায় আসিতেন। ছেলেরা কেমন পড়িতেছে, শিক্ষকেরা কেমন শিক্ষা দিতেছেন, এই সমস্ত তিনি দেখিতেন, কখনও কখনও নিজে ছেলেদের পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা তাঁহার নিকটে পুরস্কৃত হইত।

এই সময়ে সূর্য্যকান্ত বাবু বাড়ীতে ছিলেন। তিনি দেখিলেন, একটী ছোট বালক প্রত্যহ পাঠশালায় আসে, কাহাকেও কিছু বলে না, চুপ্‌টী করিয়া এক ধারে বসিয়া থাকে, ছুটী হইলে বাড়ী চলিয়া যায়, আবার পর দিন আসে। তিন চারি দিন দেখিয়া একদিন তিনি ছেলেটীকে কাছে ডাকিলেন। সঙ্কুচিত ভাবে বালক কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্য্যকান্ত বাবু সস্নেহে তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "খোকা? তোমার নাম কি?"

খোকা উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটী বালক বলিয়া উঠিল, "ওর নাম দুঃখে, ওদের বড় কষ্ট!" সূর্য্যকান্ত বাবুকে ছেলেরা বড় ভালবাসিত, জমীদার বাবু বলিয়া মনে কিছু সঙ্কোচ করিত না, যেন তিনি তাহাদের আপনার জন। দুঃখীরামের মলিন মুখখানি দেখিয়া সূর্য্যকান্ত বাবুর মনে স্বতঃই দয়ার সঞ্চার হইল। স্নেহ-মাখা স্বরে বলিলেন, "তুমি লেখা পড়া শিখবে?"

এবার দুঃখীরাম কথা কহিল। খুব ধীরে ধীরে সে বলিল, "আমার বই কাগজ কিছু নাই।"

সূর্য্যকান্ত বাবু পকেট হইতে একটী টাকা লইয়া দুঃখীরামের হাতে দিয়া বলিলেন, "তুমি লেখা পড়া শেখ, যা ব্যয় হ'বে আমি সব দিব।"

দুঃখীরাম নিতান্ত বালক, এ কথার যে কি উত্তর দিতে হয়, তাহা সে জানে না। সে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৩

পাঠশালার ছুটী হইবামাত্র দুঃখীরাম ছুটিয়া বাড়ী গেল। টাকাটী মাতার হাতে দিয়া সব কথা তাঁহাকে বলিল। বিধবার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। প্রথমে তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে ভগবানের চরণে প্রণাম করিলেন। পরে সূর্য্যকান্ত বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবু! যেমন আজ আমাকে সুখী কর্‌লে, তেমনি তুমি চিরদিন সুখে স্বচ্ছন্দে থাক, আমার মাথার যত চুল, তত তোমার পর্‌মাই হোক্।"

দুঃখীরামের মাতা টাকাটী ভাঙ্গাইয়া প্রথমে, তাহা হইতে পাঁচটী পয়সা হরিলুটের জন্য রাখিলেন, যাহা থাকিল, তাহা দিয়া দুঃখী রামের জন্য একখানা বই, কাগজ, কলম ইত্যাদি আনাইলেন। বুদ্ধিমতী রমণী প্রথমে পুত্রকে কাগজ দিলেন না। পাড়ার ছেলেদের নিকট হইতে গুটিকয়েক তালপাতা চাহিয়া আনাইলেন। তাহাই একটা ছোট

মাদুরে করিয়া গুছাইয়া দিলেন। তখনকার দিনে পাঠশালায় তালপাতার প্রচলন খুবই ছিল। বালকদিগকে প্রথমেই কাগজ ধরান হইত না। কাগজে লেখা সাধারণ ব্যাপার ছিল না, সুকুমারমতি শিশুদিগকে প্রথমে অনেক দিন পর্য্যন্ত তালপাতায় লেখান হইত, হাত সরিয়া আসিলে, কলাপাতা ধরান হইত। কলাপাতায় হাত "পাকিয়া" আসিলে, ভাল দিন দেখিয়া কাগজ ধরান হইত। সেই জন্য তখনকার ছেলেদের হাতের লেখা বড় পরিষ্কার ছিল। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বতন নিয়মগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কলাপাতা উঠিয়া গিয়াছে। কোন কোন পল্লীগ্রামে এখনও তালপাতার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু তাহাও অধিক দিন থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস নাই। তখনকার সামান্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালার ছাত্রদের যেমন হাতের লেখা ছিল, এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ বি, এ, এম, এ, উপাধিধারী অনেক ছাত্র তেমন লিখিতে পারেন না।

পর দিন পাততাড়ি বগলে, বই হাতে, প্রফুল্লবদন দুঃখীরাম সকলের আগে পাঠশালায় উপস্থিত হইল। পাঠশালায় আসিয়া মাতার উপদেশ মত শিক্ষকগণকে প্রণাম করিল। একটু পরে সূর্য্যকান্ত বাবু আসিলে তাঁহাকেও প্রণাম করিল। সূর্য্যকান্ত বাবু শিক্ষকদিগকে বলিয়া দিলেন, "আপনারা এই বালকটীকে একটু যত্ন করিয়া পড়াইবেন। ইহার জন্য স্বতন্ত্র পারিশ্রমিক পাইবেন।" তাঁহারা একবাক্যে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। দুঃখীরামের বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হইল।

অল্প দিন যাইতে না যাইতে শিক্ষকেরা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, অন্য বালকে দুই মাসে যাহা আয়ত্ত করিতে পারে না, এই বালক তাহা পনর দিনে আয়ত্ত করিয়াছে। তাঁহাদের যত্ন উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। দুই তিন বৎসরের মধ্যে দুঃখীরাম পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিল। সূর্য্যকান্ত বাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া যশোহর লইয়া গেলেন এবং ইংরেজী পড়িবার জন্য তত্রত্য গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

৪

অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী, ধীরচিত্ত বালক দুঃখীরাম, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে বৎসর বৎসর প্রমোশন্ পাইয়া প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনর টাকা বৃত্তি লাভ করিল। এ পর্য্যন্ত সূর্য্যকান্ত বাবু উহার যাবতীয় ব্যয়ভার, বহন করিতেছিলেন। দুঃখীরাম এক্ষণে কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে জানাইল, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও আপনার কৃপায় আমি এক্ষণে নিজের ব্যয় চালাইতে সক্ষম হইয়াছি, অতএব আমার পরিবর্ত্তে আপনি অন্য কোন অনাথ বালককে প্রতিপালন করিলে ভাল হয়।"

সূর্য্যকান্ত বাবু দুঃখীরামের এই সঙ্গত

কথা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইলেন ও তাহাকে বলিলেন, "দুখীরাম! তোমার কথায় বড় সুখী হইলাম, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। তোমার কথাই রাখিলাম। অতঃপর আর তোমাকে সাহায্য করিব না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তুমি অতি অবশ্য আমাকে জানাইও।" দুঃখীরাম তাহাতে স্বীকৃত হইল। সে সূর্য্যকান্ত বাবুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। দুঃখীরাম শৈশবে জননীর নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বড় হইয়া তাহা এক দিনের জন্যও ভুলিয়া যায় নাই। লেখা পড়া শিখিয়া, মানুষ হইয়া জননীর দুঃখ ঘুচাইব, ইহাই তাহার একমাত্র প্রার্থনা ছিল। এখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, একান্ত অধ্যবসায় দ্বারা শৈশবের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে যত্নবান্ হইল।

এফ্‌. এ, ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া দুঃখীরাম দুই একটী প্রাইভেট্ টিউসন সংগ্রহ করিয়া লইল। তাহার আয় এবং বৃত্তির পনর টাকা হইতে নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিত। দুঃখিনী বিধবার বহুকালের দুঃখরাশির কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইল। দুঃখীরাম প্রথমে যে টাকা পাঠাইল, ঠাকুর দেবতার পূজা, ভোগ ইত্যাদিতে বিধবা প্রায় তাহার সমস্তই নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। বিধাতার কৃপায় তাঁহার অদৃষ্টগগনের ঘোর তমোরাশি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া আসিতে লাগিল।

যথাসময়ে দুঃখীরাম এফ্, এ, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করিল।

৫

সূর্য্যকান্ত বাবু অনেক দিন দুঃখীরামের সংবাদ পান নাই। প্রথম প্রথম দুঃখীরাম তাঁহাকে পত্রাদি লিখিত, তিনিও তাহার উত্তর দিতেন। কিন্তু প্রায় দুই বৎসর তাহার কোন পত্র বা সংবাদ না পাইয়া তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। এই অনাথ বালকটীর উপরে তাঁহার কেমন একটা মায়া জন্মিয়াছিল। প্রথম হইতে তাহার প্রতি সূর্য্যকান্ত বাবুর স্নেহ জন্মে, পরে তাহার বিনীত ব্যবহার, অসাধারণ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা, তাঁহাকে একান্ত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি দুঃখীরামকে কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই। তাহার বাটীতে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন যে, শেষবার যখন দুঃখীরাম বাটীতে আসিয়াছিল, সেই সময়ে সে তাহার মাতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। তাহার পরে আর তাহার কোন সংবাদ কেহ জানে না। মাতা ছাড়া দুঃখীরামের আর কেহই ছিল না।

ক্রমে আরও কতদিন চলিয়া গেল, দুঃখীরাম বা তাহার মাতার কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। সূর্য্যকান্ত বাবু তাহার জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে লাগিলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার সন্দেহ, বিশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল। দুঃখীরামের স্মৃতি সকলের মন হইতে অন্তর্হিত

হইয়া আসিল, কিন্তু সূর্য্যকান্ত বাবু তাহাকে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি দুঃখীরামকে প্রকৃতই ভাল বাসিতেন।

৬

ইহার পরে আরও তিন চারি বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল। সূর্য্যকান্ত বাবু বৃদ্ধাবস্থায় বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ বিষয় কার্য্য দেখেন, তিনি ধর্ম্মচিন্তায়, এবং পরোপকারে সময় কাটাইতেছেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে সূর্য্যকান্ত বাবুর অধীনস্থ দুই জন প্রধান প্রজার মধ্যে একটা জমীর দখল লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। জমীদার বাবু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন, বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত লোক হইলে, সেই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রজাদ্বয় সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিত। কিন্তু অশিক্ষিত, নির্ব্বোধ প্রজারা জমীদারের মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইল না। তাহাদের মনোমালিন্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। একদিন প্রকাশ্যভাবে উভয় পক্ষের দাঙ্গা হইল, এবং উভয় পক্ষেরই লোক তাহাতে বিশেষরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইল। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র জমীদার বাবু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দাঙ্গা মিটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশেষ চেষ্টায়, উত্তেজিত প্রজাগণ ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু একেবারে নিরস্ত হইল না। তাহারা উভয়পক্ষেই আদালতে বিচারপ্রার্থী হইয়া জেলাকোর্টে আবেদন করিল। সূর্য্যকান্ত বাবু আর তাহাতে বাধা দিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাধা প্রাপ্ত হইলে ইহারা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। এরূপ মোকর্দ্দমা গভর্ণমেণ্টের হাতে যাওয়াই ভাল, তাহা হইলে দাম্ভিক মূর্খেরা কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে।

গভর্ণমেণ্ট হইতে ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু দুর্গাচরণ রায় সরজমিনে মহেশপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গাচরণ বাবু বয়সে নবীন হইলেও কার্য্য দক্ষতাগুণে অল্প দিনের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ইনি কিছু কাল বেহার অঞ্চলে ছিলেন, সম্প্রতি বদলী হইয়া যশোহরে আসিয়াছেন। তাঁহার সেখানে আসিবার অব্যবহিত পরেই, মহেশপুর গ্রামের ফৌজদারী মোকর্দ্দমার তদন্তের ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি অগোণে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডেপুটী বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁহার তাম্বুতে আসিলেন, কিন্তু ডেপুটী বাবু কাহারও বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন না। তিনি সকলকে মিষ্ট কথায় ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহার নম্র স্বভাবে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। সমাগত ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলে দুর্গাচরণ বাবু একজন মাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে, পদব্রজে জমীদারবাটীতে গমন করিলেন।

সূর্য্যকান্ত বাবু সান্ধ্যোপাসনা শেষ করিয়া সবে মাত্র বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে ডেপুটী বাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়াই, কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া সূর্য্যকান্ত বাবুর পদে প্রণত হইলেন। সূর্য্যকান্ত বাবু বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একজন ভদ্রলোক সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি একটু পূর্ব্বে ডেপুটী বাবুকে অভ্যার্থনা করিবার জন্য তাঁহার তাঁবুতে গিয়াছিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে বলিলেন, "ডেপুটী বাবু যে, বসুন! বসুন!"

সূর্য্যকান্ত বাবুও আগন্তুক ডেপুটী বাবুকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ডেপুটী বাবু যুক্তকরে, কম্পিত স্বরে সূর্য্যকান্ত বাবুকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেব! আমার যাহা কিছু সমস্ত আপনা হইতেই হইয়াছে। আপনি আমার গুরু, শিক্ষক, উপদেষ্টা, এক কথায় আপনি আমার সর্ব্বস্ব, সাধারণের নিকটে আমি এখন যে নামেই পরিচিত হই, আমি আপনার সেই স্নেহ-পালিত দুঃখীরাম"। কথাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটী বাবু, পুনরায় সূর্য্যকান্ত বাবুর পদে পতিত হইলেন। সূর্য্যকান্ত বাবু চমকিত হইয়া দুই হস্তে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন, এবং দুঃখীরামকে চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, উভয়ের আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সূর্য্যকান্ত বাবু বলিলেন, "দুঃখীরাম! আমি তোমার জন্য যাহা কিছু করিয়াছি, আজ তোমাকে এমন ভাবে, এমন বেশে দেখিয়া তাহার সহস্র গুণ অধিক ফিরিয়া পাইলাম। তোমার নম্র স্বভাব, তোমার উদার চরিত্র আমাকে একান্ত মুগ্ধ করিয়াছে। তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব? তোমার সততা, তোমার ন্যায়পরায়ণতা, এবং তোমার অসাধারণ অধ্যবসায় তোমাকে যশঃ ও উন্নতির উচ্চতম শিখরে উন্নীত করিবে সন্দেহ নাই।"

বলা বাহুল্য, নবীন বিচারকের সু-ব্যবস্থায় অল্পায়াসেই প্রজাপক্ষের বিদ্রোহ-দমন হইয়া মহেশপুর গ্রামে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

শ্রীহেমাঙ্গিনী ঘোষ,
বারুইপাড়া, খুলনা।

সাধু-দর্শন।

মহাপুরুষের দর্শন সহসা ভাগ্যে ঘটে না, সে আজ অনেক দিনের কথা বলিতেছি, তখন আমার পঠদ্দশা। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে চপলমতি বাঙ্গালী যুবকের নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিলে যাহা হয় পরীক্ষা শেষে আমারও তাহাই হইতে লাগিল। কোন রকমে দুরন্ত রৌদ্রে ঘরের মধ্যে চোরের মত আবদ্ধ থাকিয়া নিদাঘের ক্রোধমূর্ত্তি একটু উপশমিত হইলেই বাহিরের পবন-হিল্লোলে আসিয়া গা ঢালিয়া দিতাম। দিন আর কাটে না! ইতিপূর্ব্বে কালেজে যাওয়া ও আসা, ও সন্ধ্যার পরক্ষণেই ক্ষীণ দীপালোকে বসিয়া পাঠাভ্যাস করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইলেও পলকের মধ্যে দিন গুলা কোথায় চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন! সবই আছে, অভাব কেবল এক ঘেয়ে রকমের লেখা পড়া। তাহাতেই যেন বোধ হইতেছে জীবনটা কি বিসদৃশ। যাহা হউক, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে আমার দিনগুলা সৎসাহিত্যের আলোচনায় প্রধানতঃ কাটিয়াছিল। বন্ধুদিগের সহিত অপরাহ্নে যে সময় গল্প গুজব করিয়া কাটাইতাম সে সময়েও অস্মদ্দেশীয় অনেক মহাপুরুষ লইয়া কথা-বার্ত্তা চলিত। অধীত বিদ্যা ছাড়া এ বিষয়ে আমার আর কোন সম্বল ছিল না, কাজেই বাদানুবাদের মধ্যে বড় বাজারে এক সাধু পুরুষ আসিয়াছেন, এক জন এই সংবাদটি দিলেন। তিনি নিজে তখনও পর্য্যন্ত সাধু দর্শনে যান নাই, তবে তাঁহারই এক নিকট আত্মীয় সেখানে যাতায়াত করেন, তাঁহারই মুখে সাধুর অনেক গুণ-গরিমা শুনিয়াছেন বলিলেন। শুনিয়াই আমার সাধু দর্শনে মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। আমি সাধুর সকল তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত বন্ধুটির সহিত আত্মীয়ের নিকট ছুটিলাম। যাইবার সময় ভাবিলাম হয়ত অসময়ে তাঁহার নিকট যাইতেছি বলিয়া সকল শ্রম পণ্ড হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই সেই ইংরাজী বুলি," "when hope is higest help is nighest" মনে পড়িয়া গেল। গতিও কিছু ক্ষিপ্র করিলাম। শেষে যখন আত্মীয়ের নিকট ঈপ্সিত বস্তু পাইলাম তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। পরদিন সন্ধ্যার প্রাকালে তাঁহার সহিত সাধু দর্শনে যাইব স্থির হইয়া গেল। সে দিন আর বন্ধুদিগের সহিত দেখা না করিয়া সোজাসুজি একেবারে সেই ভদ্রলোকটির বাড়ীতে গেলাম। সেখান হইতে বড়বাজারে ক্লাইব ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। প্রসস্ত ছাদে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছে। মধ্যে নিবাতনিষ্কম্প পদ্মের ন্যায় এক মহাপুরুষ অর্দ্ধ নগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন।

মুখে কথা বড় কমই ফুটিতেছে, যেখানে উত্তর না দিলে নয় সেই খানেই উত্তর দিতেছেন। সেই বিপুল জনব্যূহের মধ্যে পার্থিব ভাব আদৌ চক্ষে পড়িল না। কেমন একটা ঐশী প্রভাব সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে তাহা আর বলা যায় না। সেই মহাপ্রাণের নিকট সকলেই আপনাকে তুচ্ছ মনে করিতেছেন, আর মানবের যাহা কিছু জারীজুরী সবই যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য, জীবনে এ পুণ্য স্মৃতি কখনই লুপ্ত হইবার নহে।

সাধুটীর নাম, "পাওহারী বাবা।" সেখানে অনেকেই ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ ডন্ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সতীশ বাবু তখন ছাত্র জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। কথায় কথায় তাঁহার নাম হইতেই সাধু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "যে সতীশ বাবু হ্যায় ও তো বালযোগী হ্যায়?" আমি নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া আমাকে কাছে বসিবার জন্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। আমিও র‍্যাফেলের সৌন্দর্য্য চিত্রের ন্যায় স্থির নেত্রে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে অনেক কথা কহিতেছিলেন, কথা প্রসঙ্গে বৈরাগ্যের কথা উঠিল। প্রশ্ন হইল, গৃহীর বৈরাগ্যের আবশ্যকতা আছে কি না? এই বারে সাধুটি মুখ খুলিলেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্মগুলি যতদূর আমার মনে পড়িতেছে, তাহা স্থূলতঃ এই।—

বৈরাগ্য মানুষের জীবনে একেবারে ফুটিয়া উঠে না, দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া এ ভাব অঙ্কুরিত হয়। বালক ক্রীড়ণক লইয়া খেলা করিতেছে, সহজে তাহার খেলার সামগ্রী হস্তচ্যুত করে না। আবার উহা কাড়িয়া লইলে সে কাঁদিয়া উঠে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, নির্ম্মল-হৃদয় বালকের এ ভাব আদৌ বৈরাগ্য নহে। বালক তখনও জানে না যে খেলনাটি তাহার, সে ও কথা বুঝে না। তবে তাহার আয়ত্তাধীনে আছে বলিয়া সে উহা ছাড়িতে নারাজ। প্রকৃত বৈরাগ্যের মধ্যে কোন রকম মাপকাটি থাকিতে পারে না। এ জিনিসটি ক্ষুদ্র, অতএব উহার মায়া ত্যাগ করিতে পারা যায়, উহা মহৎ, কাজেই উহার মায়া ত্যাগ করিতে পারা যায় না, এ ভাবনা বৈরাগ্যের ভাবের মধ্যে স্থান পায় না; সেখানে ক্ষুদ্র মহৎ সব সমান হইয়া যায়। তবে সংসারের ঘাত প্রতিঘাত না পাইলে এ ভাবের লক্ষণগুলি ফুটিয়া উঠে না। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও সিদ্ধার্থ মানবকে কেমন সুন্দরভাবে আত্মত্যাগ শিখাইলেন। উহার তুলনা ধর্ম্ম জগতে অতি বিরল। ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। কিন্তু, তাই বলিয়া মানুষকে যে সংসার-ত্যাগী হইতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।

সিদ্ধার্থের সিদ্ধি লাভের পথে দুরন্ত বাসনা গুলি অন্তরায় হইয়াছিল বলিয়াই তিনি সংসারের বাহিরে আসিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন। সকলের কর্ম্মক্ষেত্র এক নহে, তবে সাধনা সকলেই করিতে-ছেন, কেহ বা সংসারের মধ্যে থাকিয়া, কেহ বা উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া। প্রকৃত বৈরাগ্য আনিতে গেলে আশা উন্মূলিত করিতে হইবে। বড় দুঃখেই মাইকেল গাহিয়াছিলেন, "আশার ছলনে কি ফল লভিনু হায়।" এ জগতে সম্পূর্ণতা নাই, আশার পূরণ নাই, মনের আশা মনেই থাকিয়া যায়, অবশেষে নৈরাশ্য সাগরে সুন্দরী আশা-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে হয়। এইজন্য মনের উল্লাস বা প্রকাশ যত না হউক, উহার প্রশমন বা শান্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাধনায় আমাদের জয়ী হইতে হইবে। মনঃসংযম বিনা সীমাবদ্ধ জীবের মোক্ষ হয় না। কথাটি শুনিবামাত্র কবিবর নবীনচন্দ্রের "অমিতাভ" কাব্যের ছত্রগুলি আমার মনে পড়িয়া গেল। সেখানে কবি এ ভাবটি বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন!

"কেবল ভোগ পুষ্পে মধুপমত করিলি চয়ন
ইন্দ্রিয়ের সুখমধু! কই তৃপ্তি কোথা?
মত্ত তিমিরেরি মত সম্ভোগ সাগরে
কি ক্রীড়া না করিলাম হায়! এতদিন?
কই তৃপ্তি কোথা?—
আছে শান্তি আছে সুখ
ভোগ দাবানল হ'তে হইতে উদ্ধার।
জন্ম, জরা মরণের দুঃখ পারাবার
হইতে উত্তীর্ণ হ'তে আছে মুক্তি পথ ।"

সাধুজি আবার আরম্ভ করিলেন! বৈরাগ্য ভিন্ন শান্তি নাই। আমাদের দেশের রমণীকুল বৈরাগ্যের জ্বলন্ত আদর্শ। তাঁহারা আপনি না খাইয়া পুত্র বা স্বামীকে খাওয়ান, কিন্তু, তাই বলিয়া যত দুঃখের বোঝা তাঁহাদের স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। এ বিষয়ে পুরুষেরই পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত।

কর্ত্তব্যকর্ম্মে ঔদাসীন্য প্রকাশ ও বৈরাগ্য এক কথা নহে। প্রথমটি আলস্য ও চিন্তাহীনতার ফল বলিয়া উহাতে মনুষ্য ও সমাজ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু, বৈরাগ্যে আবার বিশেষত্ব আছে, সকল রকম বৈরাগ্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিতে বৈরাগ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ধর্ম্মজগতে উহার মূল্য এত অধিক।

ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিতে বৈরাগ্যযুক্ত অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহপূর্ণ লোকেরাই বিশ্ব-জয়ী হন, তাঁহাদের জয় সর্ব্বত্র। সংসারে থাকিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে ঔদাসীন্য দেখাইয়া বৈরাগ্যের পথ উন্মুক্ত হয় না, তাহাতে যেন ষোল আনাই পাপ, পুণ্যের ভাগ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই সংসারী জীবকে কর্ম্মের মধ্য দিয়া বৈরাগ্যপথ ধরিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু, এপথে উদ্যমবিহীন হইলে চলিবে না, তাহা হইলেই সাধনায় বিপত্তি ঘটিবে।

"আরভেতৈব কর্ম্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ
পুনঃ পুনঃ।

কর্ম্মাণ্যারভমানং হি পুরুষং স্ত্রী
নিষেবতে ॥” মনুঃ

পুনঃ পুনঃ শ্রান্ত হইয়াও কর্ত্তব্যকর্ম্ম আরম্ভ করিবে। যিনি এইরূপে কার্য্য করেন, স্ত্রী তাঁহাকে সেবা করে।

বৈরাগ্য সম্বন্ধে সাধুজি সেদিন এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, আমরাও রাত্রি অধিক হওয়ায় উঠিয়া পড়িলাম। পথে নানারূপ ভাবনা আসিয়া জুটিল, কিন্তু মহাপুরুষের বাণীগুলি তখনও হৃদয়তন্ত্রীতে যেরূপ ভাবে আঘাত করিতেছিল, আজ এতদিন পরে এখনও সেইরূপ ভাবে বাজিতেছে। সাধু দর্শনের লাভই এইটুকু।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ।

অগ্নি-পরীক্ষা।

প্রাচীন ভারতে আর্য্যদিগের রাজত্ব-কালে অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা সতীত্ব প্রমাণিত হইত। সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কথা সকলেই অবগত আছেন। সীতার ন্যায় সতী বিরল হইলেও অদ্যাপিও অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা ভারতের কোন কোন স্থানে সতীত্ব পরীক্ষা হইয়া থাকে। পাঞ্জাবে শিয়াল কোর্ট প্রদেশে একটী জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে অগ্নি-পরীক্ষা-প্রথা প্রচলিত আছে। সতীত্ব ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের প্রগাঢ় অনুরাগ। সতীত্ব ধর্ম্ম ভ্রষ্ট কোন নারীকেই তাহারা বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দেয় না। কিছু কাল পূর্ব্বে লাহোরস্থ সিবিল এণ্ড মিলিটরি গেজেটে এতদ্‌বিষয় ঘটিত একটী অপূর্ব্ব ঘটনার কথা প্রকটিত হইয়াছিল, আমরা পাঠিকাদিগের জ্ঞাপনার্থ তাহার সারাংশ প্রকাশ করিলাম। একদা একটী যুবতী কন্যা হঠাৎ শ্বশুরালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহার পিতাকে নিবেদন করে যে তাহার স্বামী বিষয় কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে অবস্থিতি করিতেন, সম্প্রতি বাটীতে আসিয়াই তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি মিথ্যা সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার অযথা অপবাদ দিতেছেন, কিন্তু সে বাস্তবিক নিরপরাধিনী। পিতাকন্যার দুঃখে দুঃখী হইয়া মহাক্ষুণ্ণ হইলেন এবং আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া তাহাদের দলপতির নিকট জামাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। এরূপ অপবাদ তাহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দার্হ। দলপতি মহাশয় সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যার স্বামী ও তাহার আত্মীয়বর্গকে এবং কন্যা ও তাহার পিতাকে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। যথাসময়ে সকলে উপস্থিত হইলে, স্বামী ও তৎপক্ষীয় লোকেরা কন্যার অসচ্চরিত্রের কথা উত্থাপন করিল এবং স্পষ্ট করিয়া বলিল যে অসতী ও

কুচরিত্রাকে তাহারা কথনই বাটীতে রাখিতে পারে না। ইহাতে তাহাদের বংশের অমর্য্যাদা ও কুলের কলঙ্ক হইবে। কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে সাশ্রু-মুখী হইয়া আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করে এবং তদর্থে যে কোনও পরীক্ষার ব্যবস্থা হইবে তাহা সে প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছে। ইহাতে দলপতি উভয় পক্ষের সম্মতি লইয়া প্রচলিত অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এক হস্ত লম্বা ও অর্দ্ধ হস্ত চৌড়া এক খণ্ড লৌহ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রক্তবর্ণ করা হইল। কন্যা ইত্যবসরে স্নাত ও পবিত্র হইয়া শুভ্র ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইলে, তাহাকে উক্ত উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড অগ্নি হইতে হস্ত দ্বারা উত্তোলন ও ধারণ করিয়া নিকটস্থ তৃণরাশির উপর নিক্ষেপ করিতে আদেশ করা হইল। কন্যা প্রথমতঃ যেন কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছিল বোধ হইল, কিন্তু বাস্তবিক তখন সে ইষ্টদেবতার জপ করিতেছিল। তৎপরে অবলীলাক্রমে জলন্ত লৌহপিণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া সে দর্শকদিগকে প্রদর্শন পূর্ব্বক তৃণরাশির উপর নিক্ষেপ করিল। তৃণরাশি তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। কন্যা সোৎসুকনেত্রে দলপতি ও পতির প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। প্রায় পাঁচশত দর্শকের সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা গৃহীত হয়, সকলেই কৌতুকাবিষ্ট হইয়া স্থির ভাবে দর্শন করিতেছিল। পরে কন্যার হস্ততল পরীক্ষা করিয়া সামান্য দাগমাত্রও দেখিতে না পাইয়া সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল। কন্যা সতী বলিয়া প্রমাণিত হইল, স্বামীও আগ্রহের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দলপতি মহাশয় এইরূপ অন্যায় অভিযোগ ও কন্যার অকারণ মনঃকষ্টের জন্য স্বামীর দশ টাকা অর্থ দণ্ড করিলেন। এরূপ অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা সতীত্ব প্রতিপন্ন করা কেবল ভারতেই সম্ভব।

গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব।

মিসেস থরসবাই—এক্ষণে বেলা কত, মিস্ এডাম ?

গিলিয়ান—চারিটা বাজিতে পনেরো মিনিট।

মিসেস থরসবাই—আমার নাতি এলান থরসবাই কয়টার ট্রেণে আসিতেছেন ?

গিলিয়ান ধৈর্য্যের সহিত উত্তর করিল "সাড়ে তিনটার ট্রেণে তিনি আসিতে-ছেন।" এলান থরসবাইয়ের পিতামহী ঝাড়া পঞ্চাশ বার এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গিলিয়ানকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু গিলিয়ান প্রত্যেক

বারই ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া আসিতেছিল। গিলিয়ান এলান থরসবাইকে এ পর্য্যন্ত দর্শন করে নাই। তিনি এক্ষণে কোনও জেলার এলাকাধীন এক নগরে কৃষি প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবার ইচ্ছায় এক সপ্তাহের জন্য বাটী হইতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিন অপরাহ্নে তাঁহার বাটী প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ছিল। ঘটিকা যন্ত্রে তখন সাড়ে তিনটা বাজিয়াছিল। সেই দিনই তাঁহার বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যতই তাহার বাটী পৌছিবার নিকট হইয়া আসিতেছিল, ততই গিলিয়ানের ভয় অথচ তাহাকে দেখিবার ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। এই সময় নর্টনহলের প্রাঙ্গনে শকটের চক্রধ্বনি শ্রুত হইল, এবং আপাদ মস্তক ম্যাকিনটোস কোটে আবৃত-দেহ একজন সুশ্রী যুবক বসিবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কোটের উপর তুষারবিন্দুগুলি হিরকের ন্যায় ঝলমল করিতেছিল। তিনি তুষার খণ্ডগুলি কোট হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রসন্ন বদনে তাঁহার পিতামহীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— এই স্যাঁতসেতে বর্ষাকালটাতে কেমন আছ ঠাকুরমা?

মিসেস থরসবাই মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—বৎস, আমি বেশ ভাল আছি। তোমার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। তোমার ফিরিতে এত অধিক বিলম্ব হইল কেন? সচরাচর তুমিত কোন স্থানে যাইলে ফিরিতে এত বিলম্ব কর না।”

এলান থরসবাই উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন—“কই? আমার ত মনে হয় না যে আমার ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইয়াছে।

যখন বৃদ্ধা পিতামহীর উপর ঝুকিয়া পড়িয়া এবং তাঁহাকে চুম্বণ করিয়া এলান থরসবাই এই কথা গুলি বলিলেন তখন গিলিয়ানের মনে হইল যেন এই কণ্ঠস্বর তাহার পরিচিত। কিন্তু তাহার পর তাহার মনে এই ধারণা জন্মিল যে ইহা তাহার একটা ভুল ধারণা মাত্র। কেন না এই নর্টনহলের অধিশ্বরের সহিত পূর্ব্বে কোথাও তাহার সাক্ষাৎ ঘটা অসম্ভব। যখন এলাণ থরসবাই সে কে এই প্রশ্ন সূচক ভাবে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন সে চমকিত হইয়া উঠিল। সত্যইত এই শ্যামবর্ণ ধুসর চক্ষু যুবক তাহার সম্পূর্ণ পরিচিত। ইনিই হাইডপার্ক গার্ডেনের সার আরবুথনটের ভ্রাতষ্পুত্র। সে ইহাঁরই হস্তে রাস্তায় কুড়ান পকেট বই খানি অর্পন করিয়াছিল। সে তৎপরে বিনম্র স্বরে বলিল—আপনি? আমি জানিতাম না, এবং কল্পনাও করি নাই যে আপনি নর্টনহলের অধিশ্বর। এলাণ থরসবাইয়ের আননে আনন্দের জ্যোতি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। গিলিয়ানের দিকে হস্তপ্রসারিত করিয়া তিনি বলিলেন—

আপনাকে এখানে দর্শন করা একটি অপ্রত্যাশিত আনন্দের বিষয়। যখন আপনি আমার পিতৃব্যের পকেট বই খানি আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তখন আপনার ঠিকানা না জানিয়া লওয়ার জন্য তিনি আমাকে অত্যন্ত দোষ দিয়াছিলেন। এই পকেট বই খানি তাঁহার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি স্বয়ং আপনাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছিলাম যে আমি আপনার ঠিকানা জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি ঠিকানা প্রদান করিতে অস্বিকার করিয়াছিলেন।

এই কথা বলিয়া যখন এলান থরসবাই গিলিয়ানের সহিত হস্ত বিকম্পন করিবার জন্য তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন, তখন গিলিয়ান সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আপনি অত্যন্ত দয়ালু-চিত্ত। সেই সামান্য বিষয়ের জন্য ধন্যবাদ প্রদানের কি আবশ্যক?"

মিসেস থরসবাই এই সময় গিলিয়ানের এই কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—এলান, ইনি মিস এডাম। এখানে মিস বারটনের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। এলান থরসবাই তাঁহার পিতামহীর কথার উত্তরে বলিলেন—"ঠাকুর মা, আপনি নিশ্চয়ই ইহাঁকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন?

তৎপরে গিলিয়ানের দিকে এক খানি ইজিচেয়ার প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিলেন "আমি—আপনাকে আর দাঁড়করাইয়া রাখিতে চাহিনা। অনুগ্রহ করিয়া আপনি উপবেশন করুন।

এই কথা বলিয়া এলান থরসবাই স্বয়ং অন্য এক খানি চৌকিতে উপবেশন করিলেন। এই সময় তাঁহার পিতামহ বলিলেন—"এই ঠাণ্ডায় এতদূর আসিবার দরুণ নিশ্চয়ই তুমি শ্রান্ত হয়েছ। চায়ের আয়োজন করা যাক"।

এলান বলিলেন—"হাঁ! চা আনয়ন করিবার আজ্ঞা করুন।

যখন গিলিয়ান টেবিলে চা বণ্টন করিতেছিল, তখন তাহার মন অনেকটা শূন্য হইয়াছিল। এলান থরসবাইয়ের অমায়িক পরিচিতের ন্যায় ব্যাবহারে তাহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে সে সহজে ইহাঁর সহিত বন্ধুতা সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইবে, এবং তাঁহার যে সম্পত্তি সে অপহরণ করিয়াছে তাহার অংশ গ্রহণ করাইতে সে তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিবে। তৎপরে এলান থরসবাই তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে আপনার সঙ্গে এইরূপে সাক্ষাৎ ঘটিবে। আমি আমার পিতৃব্যকে জানাইব যে আপনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"

গিলিয়াণ অপ্রতিভ স্বরে বলিল—"অনুগ্রহ করিয়া সার আরবুথনটকে আমার বিষয় কিছু বলিবেন না। সেই রাত্রির কথা স্মরণ করিলে আমার অত্যন্ত ঘৃণা উপস্থিত হয়। আমি সে সময়ে

অত্যন্ত দরিদ্র ছিলাম। আমি আশা করি যে আপনি কিছু মনে—"এলান থরসবাই তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—আমার পিতৃব্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনি তাঁহার পকেট বই খানি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। গিলিয়ান অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করিতে লাগিল, এবং মিসেস থরসবাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল "মিসেস থরসবাই আপনি যে লেসটা আজ রাত্রি-কালে সেলাই করিতে বলিয়াছেন তাহা হেন্‌সনকে আমাকে প্রদান করিতে অনুগ্রহ করিয়া আদেশ করুন।"

মিসেস থরসবাই উত্তর করিলেন—"হাঁ, আজ রাত্রিকালে সেই লেসটা আপনাকে প্রদান করিবার জন্য হেনসনকে বলিয়াছি। তৎপরে এলান থরসবাইকেও আসন ত্যাগ করিতে দেখিয়া বলিলেন—এলান, তুমিও যাইতেছ না কি ?

এলান থরসবাই তাঁহার পিতামহীর কথার উত্তরে বলিলেন—"হাঁ! কিন্তু কেবল মাত্র দু এক মিনিটের জন্য। দুগ্ধ দুহিবার সময় হইয়াছে। একবার দেখিতে হইবে গোয়ালারা কি করি-তেছে।"

তৎপরে গিলিয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তবে সেই রাত্রির কথা কি আপনার একটিবারও স্মৃতি পথে উদিত হয় না ?"

গিলিয়ান কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"কই না। আমার ত একবারও সে রাত্রির কথা স্মৃতি পথে উদিত হয় না।"

এল্যান থরসবাই মৃদু হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন—বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। আমার ত সে রাত্রির কথা আমার জীবনের একটি সুখের স্মৃতির ন্যায় অহরহ আমার স্মৃতিপথে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে।

লজ্জাবতী বসু।

যামিনীর আত্মকথা।

আমি যে বই লিখিয়া নাম কিনিব এ আমার উদ্দেশ্য নহে। আমিত এক-জন বিদুষী রমণী নহি। আমাদের লেখাপড়া শিক্ষার সময় মেয়েদের স্কুল কলেজে গিয়া ডিগ্রী লওয়ার প্রথা ছিল না। অতএব আমার শিক্ষা নিতান্ত অল্প। তবে যে এই কাহিনীটি লিখিতেছি ইহা কেবল মানবহৃদয়ের নিতান্ত বেদনার পীড়া মাত্র। এই করুণ রসের আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া কেহ তৃপ্ত হইবেন কিনা জানি না। আমি জন্ম-দুঃখিনী, আমার নিবাস এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের শ্যামল বঙ্গের স্নিগ্ধ গৃহে বটে। পিতামহ সামান্য গৃহস্থ ছিলেন

তথাচ তাঁহার কোন অভাব ছিল না। বাড়ীতে নিত্য ক্রিয়া কর্ম্ম, দেশে দুর্গোৎসব হইত। অতিথি অভ্যাগত আসিলে ফিরিয়া যাইত না, যথারীতি সমাদরে তাহাদের সেবা হইত। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিল। রোগ শোকের আক্রমণে, পিতামহ একমাত্র পুত্র লইয়া পশ্চিমে পলাইয়া গিয়া কোন এক পুণ্যতীর্থে বাস করিতে লাগিলেন।

নূতন স্থানে আসিয়াও তাঁহার একটি সামান্য চাকরীর যোগাড় হইল। কিন্তু তাহাতে সমস্ত পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত না, এজন্য তখনকার যত বুদ্ধি ও ক্ষমতা ছিল, তদ্দ্বারা তিনি তাস তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিবেন এই স্থির করিলেন।

এক এক জোড়া তাস এক টাকায় বিক্রয় হইত বটে, কিন্তু তিনি বড় সুবিধার লোক ছিলেন না, এই কারণে সংসারে সুখ ছিল না। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, তিনি অবস্থার মত চলিতে জানিতেন। কখন কেহ তাঁহার অভাব টের পাইত না। এই অনাটনের মধ্যে থাকিয়াও তিনি ছোটখাটো একখানি বাড়ী কিনিলেন। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে তিনি আরও পুত্র কন্যা লাভ করিলেন, আমার পিতা তাহার মধ্যে একজন। কিন্তু কৃতান্তের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। বারম্বার আঘাত পাইয়াও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। তিনি বিপদে স্থির হইয়া পুত্রগণের শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

ক্রমে দেখিতে দেখিতে আবার গ্রহ সুপ্রসন্ন হইল। বড় ছেলেটির একটি চাকরী হইল। ছোটগুলি লেখা পড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইল। আমাদের সমাজে শিক্ষা সম্বন্ধে যত না সতর্কতা থাকুক, আচার ব্যবহার ও সংস্কার যথাসময়ে না হইলে নিশ্চয় প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে, এ আশঙ্কা পিতা মাতার যথেষ্ট থাকে।

পিতামহী ঠাকুরাণী পুত্রগণের বিবাহের জন্য সমুৎসুকা হইতেন। কিন্তু আমার পিতা বড় স্বাধীনচেতা ছিলেন, তিনি মাতাকে জানাইলেন যে "এক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন না করিয়া বিবাহ করিব না"।

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দারগ্রহ করিয়াছিলেন, অল্পদিন পরে তাঁহার একটি কন্যা সন্তান জন্মিল বটে, কিন্তু মাতা ও পুত্রী উভয়ে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই দুর্ঘটনায় জ্যেষ্ঠ তাতের চিত্ত-বিকার ঘটিল। তিনি গৃহ পরিজন ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিলেন। বিধাতার কৃপায় তথায় একটি উপায় হইল, তদ্দ্বারা সুন্দররূপে জীবিকা অর্জ্জন হইতে লাগিল। এই সময়ে আমার পিতার অতিশয় সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইল, এই সংবাদে তাঁহার অগ্রজ ব্যস্ত হইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে আসিলেন। ঈশ্বর-কৃপায় সে যাত্রা পিতা রক্ষা পাইলেন।

একদিন প্রাতঃকালে পিতা শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার দুই একটি বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সে দিন ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমার উৎসব,

সে জন্য তাঁহার মাতা নারায়ণের পূজার আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। আগন্তুক বন্ধু-বর্গকে যথারীতি আহারাদি করান হইল। আমার পিতা তখন স্বীয় অগ্রজকে কহিলেন "দেখুন দাদা গোপীনাথের মত আমাকে একটি সার্ট করিয়া দিন"।

তাহার অগ্রজ কিছু কর্কশস্বরে উত্তর দিলেন "হাঁ এখনি অত সখ্ করে না, আগে টাকা আন"।

আমার পিতার তখন সবে ১৪ বৎসর বয়স, তাহাতে দুর্ব্বল শরীর। ভ্রাতার এই নীরস স্নেহহীন বাক্যে নিরাশ হইয়া তিনি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিয়া গেল।

অনেক সময়ে মানুষের দুঃখই সুখের কারণ হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্যগুলি পিতার হৃদয়ে খোদিত হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, বাস্তবিক আমার কি উপার্জ্জনের সময় হয় নাই, দেখিব চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?

সে দিন হইতে তাঁহার বাল্যচাপল্য ঘুচিয়া গেল, লেখা পড়াতে মন নাই, কেবল অহরহ অর্থ চিন্তা। বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কেবল স্কুলের হেডমাষ্টারকে কহিলেন। "মহাশয় আপনি আমাকে নিতান্ত স্নেহ করেন, সেই সাহসে আপনাকে কিছু বলিতে চাই"। হেডমাষ্টার অতি সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন, পিতার বিষণ্ণ মুখের প্রার্থনায় তাঁহার চিত্ত দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল। পিতার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে কাছে বসাইয়া পিঠে হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে তিনি কহিলেন "কি চাও বাপু বলত"।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইংরাজী অনার।

দ্বিতীয় বিভাগ।

হানা গুহ—ডাইওসিসন।

লউড জোনা—প্রাইভেট।

ষ্টেলা বসু—ডাইওসিসন।

গাটুডক্লারিস রাহা—ডাইওসিসন।

পারদর্শিতার সহিত।

সিসিলিয়া কর্ণেলিয়স—প্রাইভেট।

গিলডেনমিল্লিমেণ্ট—ডাইওসিসন

আইরিণ মিত্র— ”

নাথানিয়্যাল উইলহেলমিন— ”

পাশ লিষ্ট।

সুশীলা বাগচী—ডাইওসিসন।

ভক্তিলতা চন্দ—প্রাইভেট।

বিনয়িনী দাস— ”

অমলা দাস—বেথুনকলেজ

শৈলজা চৌধুরী—প্রাইভেট।

সরোজিনী দত্ত— ”

সুবর্ণপ্রভা দত্ত-বেথুন কলেজ।

লাবণ্যবালা ঘোষ বেথুন কলেজ।
ক্ষেমদা রায়— „
আশালতিকা হালদার—প্রাইভেট
সিকুইরা লুসী—বেথুনকলেজ

এ বৎসর কুড়িজন বঙ্গমহিলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে চারি জন ইংরাজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং পারদর্শিতার সহিত চারি জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অবশিষ্ট বার জন পাশকোর্সে পাশ হইয়াছেন। গত বৎসর ছয় জন বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আগামী বর্ষের অপেক্ষা এ বৎসর চৌদ্দ জন অধিক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, দিন দিন শিক্ষার প্রতি মহিলাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে। এই শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি ও উন্নতিতে অতি আনন্দের ও আশার বিষয় এই যে, যে সকল মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন ইঁহাদের দ্বারা দেশের উন্নতির সাহায্যের অনেক আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিতা মহিলারা ডাক্তারী এবং শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্যে যাইতেছেন না। এতদ্ভিন্ন অনেক বিষয় আছে যাহাতে ইঁহাদিগের সাহায্য আবশ্যক। আমরা আশা করি মহিলারা ক্রমে দেশের সকল কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিবেন।

হাঁসপাতালের রোগীদিগের ভোজ—কুচবিহারের মহারাণী হাঁসপাতালের রোগীদিগকে বিগত ২৫শে জুন উপাদেয় খাদ্যাদি দ্বারা পরিতুষ্টরূপে ভোজন করাইয়াছেন। সহৃদয়া মহারাণী প্রতি বৎসরই রোগীদিগকে এইরূপে ভোজন করান।

পরলোকগমন—আমরা অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ১৪ই জুন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বহুকাল অবধি রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ কমে নাই। এই রুগ্নদেহে বৃদ্ধাবস্থাতেও যুবার ন্যায় তেজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। বিশ্বপিতা প্রিয়সন্তানকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান করুন।

মুসলমান যুবকদিগের জন্য জুবিলী ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ লায়েক ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটির অন্যতম কমিশনার নবাব বদিরুদ্দিন হাইদার খাঁ বাহাদুর, মুসলমান সমাজের এই দুই জন বিখ্যাত ব্যক্তিও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

তুরস্কের ষড়যন্ত্রকারীদিগের দণ্ড—তুরস্কের ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ বিচার সাধারণের মনে ন্যায়সঙ্গত হয় নাই এইরূপ ধারণা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে এই কারণে তুরস্কে পুনরায় ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা হইতেছে।

ডিউক অব কনট্—ক্যানাডার গবর্ণরজেনারেল ডিউক অব কনট্ আরও এক বৎসর এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

ভিক্ষুক।

ভিক্ষুক দাঁড়ায়ে আজি জগতের দ্বারে
শূন্য ঝুলি নিয়ে করে,
ক্ষুধা তৃষ্ণায় মাথা ঘোরে।
কে গো দিবে মুষ্টি ভিক্ষা? ডাকি গো কাতরে,
নাহি যে গো কানা কড়ি
নিঃসম্বল এ ভিখারী.
তাই হায়! মুখ চেয়ে ফিরি দ্বারে দ্বারে।
নাহি কো বিশ্বাস ক্ষুধা
ভক্তি অন্ন, প্রেম সুধা,
শূন্য এ হৃদয় ঝুলি, কি করি উপায়?
নাহি পেলে অন্ন জল
কেমনে বাঁচিব বল?
তাহে যে বিষম ব্যাধি, প্রাণে বাঁচা দায়!
ক্ষুদ্রত্ব আমিত্ব রোগে,
আমার কুপথ্য ভোগে
হয়েছে সংশয় প্রাণ, নাহি প্রতিকার!
জীর্ণ দেহ এ সাধন
করে বুঝি পলায়ন
দেখ তাহে হইয়াছে স্বার্থের বিকার।
করিও না অবহেলা
ভিক্ষা দেহ এই বেলা,
পারি না দাঁড়াতে আর হয়েছি বিকল।
যদিও অসাধ্য জানি
তবু শুনে দৈব-বাণি
নির্জীব জীবন কিছু হয়েছে সবল।
জগতের পদরেণু
মাখিলে এ ভগ্ন তনু
হইবে আরোগ্য নাকি আসিয়াছি তাই।
তোরা হয়ে কৃপাবান্
নাহি দিলে পদে স্থান
এ অধম অগতির গতি আর নাই।
দেহ গো এ দীনে অন্ন
খুঁজিয়াছি তন্ন তন্ন
নাহি পেয়ে মুষ্টিমেয় দুঃখ হতাশায়,
হইয়াছি ম্রিয়মাণ
এ মুমূর্ষে প্রাণদান
কর আজি কৃপা করে রাখ পদছায়,
ভিক্ষা ঝুলি নিয়ে করে ভিক্ষুক দাঁড়ায়।

শ্রীঅম্বিকা সেন।

সংসারে রমণীর অধিষ্ঠান।

সংসারক্ষেত্রে রমণীর অধিষ্ঠান কোথায়? কোন মহাত্মা বলিয়াছেন— "রমণী দুর্গম পর্ব্বতে শীতল নির্ঝরিণী, মরুভূমে পান্থপাদপ।" এই পরীক্ষাপূর্ণ

দুর্গম জীবন-পথে চলিতে চলিতে মানুষকে কতই শ্রান্ত ক্লান্ত ও নিরাশার গভীর অন্ধকারে পড়িতে হইতেছে। কত বাধা ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, ইহার কি শান্তি নাই?—শান্তি আছে ঐ শীতল নির্ঝরিণী সম স্নেহময়ী রমণীর নিকট। পরিশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত, দুঃখ তাপে তাপিত মানবের জন্য স্নেহময়ী রমণী সকল-তাপ-হারি কোমল হৃদয় লইয়া সেবা-হস্ত প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। অন্যের সুখ শান্তির জন্য নিজের সুখ শান্তি চিরতরে বিদায় দিয়া আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছেন।—শ্রান্ত, ক্লান্ত মানব তাই আত্মত্যাগিনী রমণীর নিকটে আসিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়। সেই জন্যই মহাত্মারা বলিয়াছেন "দুর্গম পর্ব্বতে শীতল নির্ঝরিণী, রমণী, মরু-ভূমিতে পান্থপাদপ, রমণী"। সকল সুখ-দাত্রী এই যে রমণী, সংসারে ইহার স্থান কোথায়? ভারতের ঋষিগণ ইহাঁদের স্থান অতি উচ্চে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ইহাঁদিগকে সংসারের কর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, শুধু তাহা নয়, মানবজীবনেরও কর্ত্রী করিয়া গিয়াছেন। একটী রমণী কতকগুলি সন্তানের মাতা, কতকগুলি জীবনের ফলাফল তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে দেবতারূপে গড়িতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে পশুরও অধম করিয়া নরকের কীট সৃষ্টি করিতে পারেন। এই সংসারকে নারী স্বর্গ করিতে পারেন, আবার ইহাকে নরকেও পরিণত করিতে পারেন।

প্রত্যেক নরনারী লইয়া সংসার, সমাজ ও জাতি গঠিত। এই নরনারীর জীবনের কল্যাণ অকল্যাণ সমাজ এবং জাতির কল্যাণ অকল্যাণের উপর নির্ভর করিতেছে।

যে জাতির নারীগণ শিক্ষিতা নন, সুতরাং সংসার ও সন্তান পালনে অক্ষম, সেই জাতির উন্নতি নাই। যে সমাজের নারীগণ কোমলতা পবিত্রতা প্রভৃতি রমণীর ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অক্ষম, সে সমাজের কল্যাণ নাই। যে জাতি বা সমাজ নারীকে ঘৃণা করে, নারীকে নির্য্যাতন করে, নারী-হৃদয়ের গুণ সকল বিনাশ করে, সে জাতি বা সমাজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই জাতি বা সমাজ নারীহৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি হইতে দেয় না। অতএব দেখা যাই-তেছে যে, রমণীই সংসারের প্রাণ, নারীকে বাদ দিয়া সংসার চলিতে পারে না। গৃহের কর্ত্রী নারী, তৃষ্ণায় তৃপ্তিদায়িনী নারী, সুখালাপে পরিতোষিণী, বিষয় কর্ম্মে মন্ত্রি-স্বরূপিণী, সৎকর্ম্মের সহকারিণী, দুঃখ, বিপদ, রোগ, শোকে সন্তাপহারিণী, সর্ব্ব-কল্যাণ-দায়িনীই রমণী। এই যে সংসারের প্রাণরূপিণী রমণী ইহাঁর স্থান কত উচ্চে তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন, এবং সুশীলা, সুশিক্ষিতা রমণীই যে এই সকল গুণের একমাত্র অধিকারিণী

তাহাও বুঝিতে পারিবেন। প্রাণরূপিণী রমণী সংসারে না থাকিলে সংসার থাকিতে পারে না। সংসারের সর্ব্বোচ্চ স্থানেই রমণীর অধিষ্ঠান।

মহম্মদ

মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ ইং ৫৭১ অব্দে ১০ই এপ্রিল তারিখে মক্কা নগরে কোরেস নামক বিখ্যাত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবহুল্লা এবং মাতার নাম আমিনা। মহম্মদের জন্মের কয়েক মাস পূর্ব্বে আবহুল্লা বাণিজ্য করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়ে মদীনা নগরে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে গতাসু হন। মহম্মদ পুরুষানুক্রমে কাবা নামক মন্দিরের রক্ষক।

আমিনা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ও প্রখর-বুদ্ধিশালিনী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য আদৌ ভাল ছিল না। স্তন্যদানে স্বীয় সন্তানকে প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া তিনি বেদুইনা নামক একজন ধাত্রীর উপর মহম্মদের লালনপালনের ভার অর্পণ করিতে বাধ্য হন। বেদুইনা স্বীয় গর্ভজাত সন্তান নির্ব্বিশেষে মহম্মদকে স্তন্যদানে প্রতিপালন করিতে থাকেন। মক্কানগরী নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান, এইজন্য উক্ত ধাত্রী তাঁহাকে লইয়া একটি প্রান্তরে বাস করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর তথায় অবস্থানের পর মহম্মদ রোগগ্রস্ত হন। ধাত্রী ভীতা হইয়া তাঁহাকে মক্কা-নগরে তাঁহার জননী আমিনার নিকট লইয়া আইসেন। মহম্মদ মক্কায় আনীত হইবার কয়েকমাস পরেই আমিনার মৃত্যু হয়। এই সময় মহম্মদের বয়ঃক্রম ছয় বৎসর মাত্র। পিতৃমাতৃহীন বালক মহম্মদকে প্রথমে স্বীয় পিতামহ আবহুল মতাল্লব এবং তাঁহার মৃত্যুর পর পিতৃব্য আবুতালেব পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তাঁহারই যত্নে মহম্মদ কবিতা রচনা, যুদ্ধবিদ্যা ও অশ্বারোহণ প্রভৃতি কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ বাল্যকাল হইতেই নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে ভাল বাসিতেন। তিনি অন্য বালকদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে বৃথা সময় অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিতেন না। পুস্তকাধ্যয়ন অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের সহিত কথোপকথন দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনে তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল। মক্কা নগরে বাণিজ্যার্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের সমাগম হইত। মহম্মদ তাহা-দিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া সেই সকল দেশের ভাষা, রীতি, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করিতেন। উত্তর কালে তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার ভিত্তি ঐ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে

মহম্মদ স্বীয় পিতৃব্যের অনুরোধে খাদাইজা-নাম্নী এক ধনবতী বিধবার কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করেন। খাদাইজা মহম্মদের সৌন্দর্য্যে ও কার্য্যদক্ষতায় অতিমাত্র প্রীত হন। ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে এতাধিক প্রণয়ের সঞ্চার হয় যে, অবশেষে তাঁহারা উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

খাদাইজার অপকট প্রেমানুরাগ ও অতুল ঐশ্বর্য্যে মহম্মদ পঞ্চদশ বর্ষ নির্ব্বিঘ্নে সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেন। গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের চিন্তা না থাকায় তিনি ধর্ম্মচিন্তা করিবার প্রচুর অবসর প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মচিন্তায় তিনি সময় সময় এরূপ চঞ্চল হইয়া পড়িতেন যে, লোকে তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া জ্ঞান করিত।

মহম্মদ পৈতৃক রীত্যনুসারে রমজান মাসে হিরানামক পর্ব্বতের গহ্বরে গিয়া উপাসনা করিতেন। একদা তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় পত্নী খাদাইজাকে বলিলেন, "রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় স্বর্গ হইতে দূত আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন, 'মহম্মদ, তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত।' খাদাইজা তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিলেন। মহম্মদের উপদেশে তিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। জয়েদ নামক একজন ক্রীত দাস তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করায় মহম্মদ তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন দেখিয়া আরও অনেক ক্রীত দাস তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল। অন্যান্য শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেবের পুত্র আলি সহজেই তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

৬১৪ খৃঃ অব্দে মহম্মদ প্রকাশ্যভাবে মক্কার পথে পথে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে তথাকার প্রধান প্রধান লোক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেশান্তরিত করিবার জন্য আবুতালেবকে অনুরোধ করেন। আবুতালেব মহম্মদকে মত পরিবর্ত্তন করিতে বলায় তিনি বলেন, "আমার বাম হস্তে চন্দ্র এবং দক্ষিণ হস্তে সূর্য্য দিলেও আমি স্বীয় মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না। যতদিন না ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মের সন্ধান পাই ততদিন আমি এই ধর্ম্ম প্রচারে কখনই বিরত হইব না।"

মহম্মদ কখন উপেক্ষিত, কখন উপহসিত, কখনও বা উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মোন্মত্ততা দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর ভাব ধারণ করিল। তিনি নির্ভয়ে প্রকাশ্যভাবে আত্মীয় স্বজনকে সমবেত করিয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

খৃষ্টীয় ৬২১ অব্দে মহম্মদের পত্নী খাদাইজা কালগ্রাসে পতিতা হন।

মহম্মদের পিতৃব্য আবুতালেবও ঠিক এই সময়ে মানবলীলা সংবরণ করেন। কোরেসদেশীয় লোকেরা এই সুযোগে আবু সোফিয়ানের কর্ত্তৃত্বাধীনে সমবেত হইয়া মহম্মদকে নিপাত করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

মহম্মদ অনন্যোপায় হইয়া আলির সাহায্যে মক্কা হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া প্রথমে তৌরনামক পর্ব্বতগহ্বরে লুক্কায়িত হন, পরে তথা হইতে বাহির হইয়া মদীনা নগরে গমন করেন। মহম্মদের এই পলায়নের তারিখ হইতে হিজিরা নামক সনের গণনা আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বে মদীনাস্থ বণিকগণ মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এই হেতু তাহারা অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। মহম্মদও জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া বিজয়ী নরপতির ন্যায় নগরে প্রবিষ্ট হইলেন।

মদীনায় গিয়া মহম্মদ আবুবেকরের পরম সুন্দরী অনূঢ়া কন্যা আয়েসার পাণি গ্রহণ করেন। এক আয়েসা ভিন্ন অন্য কোন অনূঢ়া রমণীকেই তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন নাই। মহম্মদ শিষ্যগণকে চারিটীর অধিক বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং উহা অপেক্ষা অনেক অধিক রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ও তর্ক বিতর্ক করিয়া শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বিশেষ রূপে চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিলেন আশানুরূপ ফল হইতেছে না, তখন তিনি অস্ত্রের সাহায্যে নিজ ধর্ম্ম-প্রচারে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর আমার হাতে যে খড়্গ অর্পণ করিয়াছেন ইহা স্বর্গ ও নরকের সোপান। যাহারা আমার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিবে, আমার শিষ্যগণ কোন তর্ক বিতর্ক না শুনিয়া খড়্গ দ্বারা তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিবে।" তিনি নিজ শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন, "যে কেহ সত্য ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিবে, সে রণে হত বা মৃত হইলেও উত্তম পুরস্কার পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই"। মহম্মদ যে খড়্গ ব্যবহার করিতেন। তাহাতে খোদিত ছিল —"কাপুরুষতা লজ্জাজনক, ধর্ম্মোদ্দেশে যুদ্ধ করণে যশঃ, পলায়নে ভাগ্যফল অনিবার্য্য।" তাঁহার উষ্ণীষে লিখিত ছিল, "ঈশ্বর উপকার করেন, পলায়িত ব্যক্তি নরক হইতে কখনই পলাইতে পারে না।"

বেদারের যুদ্ধে মহম্মদ প্রথম অস্ত্র গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে আবুসফিয়া পরাজিত হয়। ইহার পর আরও অনেক যুদ্ধ হয়, তাহার কোন যুদ্ধে মহম্মদ বিজয় লাভ করেন, কোন যুদ্ধে বা পরাজিত হন, কিন্তু পরিশেষে তিনি সর্ব্বজয়ী হইয়া উঠেন। দলে দলে লোকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল।

মহম্মদ ৬৩০ খৃঃ অব্দে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবারে তিনি তথায় রাজা ও ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্মস্থাপয়িতা বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে আরবদেশে

লাদয়ে গৃহীত হন। তিনি পূর্ব্ব শত্রুগণের প্রতি কোন প্রকার ঈর্ষা প্রকাশ না করিয়া তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ৩৬০টী দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া কাবা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ব্যবস্থা করেন অতঃপর কোন অবিশ্বাসী মক্কা নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সমস্ত আরবদেশ তাঁহার অধিকৃত হইল। তিনি পারস্য ও তুরস্কের রাজার এবং হিরাক্লিয়াসের নিকট দূত প্রেরণ করেন।

মহম্মদ যখন রোম রাজ্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং সিরিয়া বিজয়ের জন্য উদ্যোগ করেন, সেই সময়ে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। তিনি চতুর্দ্দশ দিবস জ্বর ভোগ করিয়া ৬৩২ অব্দে ৭ই জুন মদিনা নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

মহম্মদের সুখ্যাতি ও অখ্যাতির অনেক কাহিনী ও উপকথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এ সব সত্বেও তিনি যে অন্তর্দৃষ্টি-শালী মহাপুরুষ ছিলেন, গভীর চিন্তাশীল ও একান্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন এবং পুস্তক-অধ্যয়ন-জনিত জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশিষ্ট জ্ঞানী না হইলেও যে ভগবৎ-জ্ঞানে মহা-জ্ঞানী ও তৎপ্রেমে উন্মত্তহৃদয় ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্মথ নাথ সিংহ।

বিজ্ঞান-রহস্য।

দেহতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

"আর্ত্তবকাল ধাতুনাং মলাস্তুপধাতবঃ।
আশয়াশ্চ কলাশ্চাপি মর্ম্মাণ্যথ সন্ধয়ঃ॥
শিরাশ্চ স্নায়বশ্চাপি ধমন্তঃ কণ্ডরাস্তথা।
রন্ধ্রানি ভূরি স্রোতাংসি জালাঃ কূর্চ্চাশ্চ রজ্জবঃ।
সেবন্তশ্চাথ সঙ্ঘাতাঃ সীমন্তাশ্চ তথা ত্বচঃ।
লোমানি লোমকূপাশ্চ দেহ এতন্ময়ো মতঃ॥"

আর্ত্তব (ঋতু) ধাতুর মল, উপধাতু, আশয়, কলা, মর্ম্ম, সন্ধি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, কণ্ডরা (স্থূল স্নায়ু), রন্ধ্র (ছিদ্র), স্রোত, জালা, কূর্চ্চ, রজ্জু, সেবনী, সংযোগ, সীমন্ত, ত্বক্, লোম ও লোমকূপ এই সমুদায়ের সমবায়কে দেহ কহে।

আপাদমস্তক সমস্ত অবয়ব দেহের অন্তর্গত। ষড়ঙ্গ বলিলে মস্তক, শরীরের মধ্যভাগ, দুই হস্ত ও দুই উরুকে বুঝায়, কিন্তু শরীর অষ্ট-অঙ্গ-বিশিষ্ট। যথা;— আত্তঙ্গ বা উত্তমাঙ্গ (মস্তক)—কেশ, অভ্যন্তরাঙ্গ মস্তিষ্ক (মাথার ঘি), কপাল, ভ্রূদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় ও তদন্তবর্ত্তী কনীনিকাদ্বয়, অক্ষিতারা (কৃষ্ণবর্ণ গোলদ্বয়, শুক্ল মণ্ডল-

দ্বয় (চক্ষুদ্বয়ের শ্বেতবর্ণ দাগ), অক্ষিপক্ষ্ম (নেত্রঞ্জন), অপাঙ্গ (নেত্রকোণ), কূর্প (নাসিকার ঊর্দ্ধ ভাগ), কূর্চ্চ (ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থল), শঙ্খদ্বয় (ললাটের অস্থি), কর্ণদ্বয় ও তদন্তবর্ত্তী কর্ণপালি-দ্বয় ও শষ্কুলীদ্বয় (কর্ণের ছিদ্র), গণ্ডদ্বয়, নাসিকা ও নাসারন্ধ্র, ওষ্ঠ, অধর, সৃক্কণীকূল্লীদ্বয় (ওষ্ঠের প্রান্ত), মুখ, তালু, হনুদ্বয় (গণ্ডস্থলের উপরি ভাগ) দন্ত, দন্তবেষ্ট, জিহ্বা, চিবুক (অধরের অধোভাগ) ও গলদেশ এই সমস্ত মস্তকের অপাঙ্গ।

দ্বিতীয় অঙ্গ—গ্রীবা, ইহার উপর মস্তক অবস্থিতি করে।

তৃতীয় অঙ্গ—বাহু যুগল যাহার উপর স্কন্ধদ্বয় অবস্থাপিত। ইহার উপরিস্থিত প্রগণ্ডদ্বয় (কুর্পরাবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত বাহু-যুগল) কূর্পরদ্বয়, কণ্ঠ, প্রকোষ্ঠ দ্বয় (কূর্পর হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত) মণিবন্ধ বা কর গ্রন্থি, করতলদ্বয় ও তদন্তবর্ত্তী অঙ্গুলি, নখ ও ছেদ্য নখ (নখের যে অংশ ছেদন করা যায়)।

চতুর্থ অঙ্গ, বক্ষঃ ইহার উপাঙ্গ সকল—স্তনদ্বয়, হৃদয়—ইহা পুণ্ডরীক বা পদ্মের ন্যায় অধোমুখে অবস্থিত, জাগ্রতাবস্থায় বিকসিত, নিদ্রিতাবস্থায় নিমীলিত থাকে। ইহা ওজো ধাতুর আশ্রয় ও উৎকৃষ্ট চৈতন্যস্থান, এ কারণ তমোগুণ দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইলে প্রাণিগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে, কক্ষ বা বাহুমূল বক্ষ (ইহার উভয় মধ্যসন্ধিতে কণ্ঠের উভয়পার্শ্বস্থ অস্থি-দ্বয়, উভয় কক্ষ (বগল) ও বঙ্ক্ষণদ্বয় (উরুসন্ধি-স্থল)।

পঞ্চম অঙ্গ উদর। ষষ্ঠ অঙ্গ পার্শ্ব-দ্বয় এবং সপ্তম অঙ্গ পৃষ্ঠবংশের সহিত সমস্ত পৃষ্ঠ। তাহার উপাঙ্গ সকল প্লীহা রক্ত ইহা হইতে উৎপন্ন, বামপার্শ্বে হৃদয়ের অধোদেশে অবস্থাপিত। প্লীহা রক্তবাহিনী শিরা সকলের মূল। ফুস্ফুস্—রক্তফেণ জাত, হৃদয়ের বামপার্শ্বে অবস্থাপিত। যকৃৎ (শোণিতজাত) দক্ষিণ পার্শ্বে হৃদয়ের অধোভাগে অবস্থিত। যকৃৎ রঞ্জকনামক পিত্তের আবাসস্থান। ক্লোমবায়ু ও রক্ত হইতে উৎপন্ন। ক্লোম জলবাহিনী শিরা সকলের মূল ও তৃষ্ণাচ্ছাদক। বায়ুসংযুক্ত রক্ত হইতে কাণীয়ক সমুদ্ভূত হয়। মেদ ও রক্তের সারভাগ হইতে বৃক্কদ্বয় উৎপন্ন হয়। এই বৃক্কদ্বয় হইতে উদরস্থ মেদের পোষণ হইয়া থাকে। অন্ত্র নাড়ী পুরুষের সাড়ে তিন ব্যাম (পার্শ্বভাগে সম্পূর্ণ বিস্তৃত বাহুদ্বয়ের পরিমাণ), স্ত্রী-লোকের তিন ব্যাম। উণ্ডুক, কটি, ত্রিক, (মেরুদণ্ডের নিম্নদেশ) বস্তি, নাভির অধোভাগ, তলদেশ ও বঙ্ক্ষণ (উরু সন্ধি কূর্চ্চ) কণ্ডরাসমূহের মূল, উহা বীর্য্য ও মূত্রের আবাসস্থান। মেঢ্র দ্বারা গর্ভাশয়ে গর্ভাধান হয়। যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থাপিত। কফ, রক্ত, মাংস ও মেদের সারাংশ হইতে মুষ্ক-দ্বয় উৎপন্ন হয়। মুষ্ক হইতে শুক্র বাহির হয়, ইহা বীর্য্যবাহিনী শিরার আধার। ভুক্ত দ্রব্য বিশেষরূপে পরিপাক হইলে তাহা

হইতে যে সূক্ষ্ম সারাংশ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়। শুক্রই বীর্য্য অর্থাৎ দেহের বল।

শ্রোণিই যোষিতের নিতম্ব। উহার কুকুন্দরদ্বয় (নিতম্বস্থ ও আবর্ত্তাকার গর্ত্তদ্বয়) হইতেই অষ্টমাঙ্গ উরু মূল। ইহার উপাঙ্গ সকল, জানুর পিণ্ডিকা (জানুর অধোভাগস্থ মাংসল প্রদেশ—গুল্ফ হইতে জানু পর্য্যন্ত), ঘুণ্টিকাদ্বয় (গুল্ফ), পাষ্ণিদ্বয়। গুল্ফের (অধোদেশ), পদতলদ্বয়, প্রপদ, পদদ্বয় পদাঙ্গুলি, পদনখ ইত্যাদি।

উপরে কেবল প্রধান প্রধান উপাঙ্গগুলির উল্লেখ হইল, এতদ্ব্যতীত অনেক অপ্রধান প্রত্যঙ্গ আছে, অনাবশ্যক বোধে এখানে তাহাদিগের বিষয় বিবৃত হইল না। (শরীর বিজ্ঞান হইতে গৃহীত।)

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোমরাজ্যের ইতিহাস।)

১৭ অধ্যায়।

শ্লেভ বা কৃতদাসদিগের যুদ্ধ।

১। স্পেনের যুদ্ধের অনতিবিলম্বেই ক্রীতদাসদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ২। সিরিয়াদেশজাত এনস নামে এক ব্যক্তি তাহাদিগের অধ্যক্ষ ছিল। সে আপনার দৈবশক্তি জানাইয়া সঙ্গী দাসগণকে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করে। ৩। ঐ ব্যক্তি প্রায় ৭০ সহস্র দাস একত্রিত করিয়া চারি জন রোমীয় সেনাপতিকে পরাভূত করিয়াছিল, কিন্তু পরে ৬২২ রোমাব্দে সে কন্সল রুপিলিয়স কর্ত্তৃক পরাজিত হইল।

১৮ অধ্যায়।

জুগার্থা ও মিথ্রিডেটিসের যুদ্ধ।

১। নিউমিডিয়া রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী মিসিপ্সা রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিম্পসলকে বধ করিয়া ও তদীয় কনিষ্ঠ আড্রবলকে সিংহাসনলাভে বঞ্চিত করিয়া জুগার্থা আপনি ঐ দেশের রাজা হইয়াছিলেন। ইহাতে আড্রবল রোমের সাহায্য প্রার্থনা করে। এই হেতু জুগর্থার সহিত রোমের বিবাদ হয়। ২। জুগার্থা মেসেনেসার পৌত্র ও মিসিপসার ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি প্রথমে অর্থ সাহায্যে রোমের সহিত অনেক চাতুরী করেন। কিন্তু অবশেষে মেরিয়স কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রোমে নীত হন এবং তথায় কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন।

৩। মেথ্রিডেটিসের সহিত ৬৬০ রোমাব্দে যুদ্ধারম্ভ হয়। ঐ ব্যক্তি আসিয়াস্থ তুরুস্কের অন্তঃপাতী পোণ্টসের রাজা এবং তৎকালের একজন প্রধান যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি

যদিও বারম্বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, তথাপি নিরুৎসাহ না হইয়া আপনার মহত্ত্ব স্থাপনে ক্ষণকালের জন্য ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁহার অনেক গুণ ছিল বটে, কিন্তু তিনি অকৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠুর ছিলেন।

৪। তিনি কাপাডোসিয়াধিপতি আরিক্ত বার্জিনিস ও বিথিনিয়াধিরাজ নইকোমিডিয়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য অধিকার করেন, তাহাতে ঐ সিংহাসন-ভ্রষ্ট ভূপতিরা রোমের শরণাপন্ন হয়, এই জন্য যুদ্ধ ঘটে।

৫। এই যুদ্ধ প্রায় ৬০ বৎসর চলিয়াছিল, তথাপি কাহারও সম্পূর্ণ জয় পরাজয় নিশ্চয় হয় নাই। অবশেষে মিথ্রিডেটিস সর্ব্বস্বান্ত হইয়া (খৃঃ পূঃ ৬৩) বিষপানে প্রাণত্যাগ করিল এবং ইহাতে সমরেরও শান্তি হইল।

১৯ অধ্যায়।

পেট্রিসীয় ও প্লীবীয় অথবা রোমের ভদ্র ও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিবাদ।

১। সাধারণ তন্ত্রের মধ্যে ভিন্ন জাতির সহিত রোমানদিগের যে কয়েকটি প্রধান যুদ্ধ ঘটনা হয়, এক একটী করিয়া সেগুলি বর্ণিত হইল। এক্ষণে রোমানদিগের আপনাদিগের মধ্যে যে বিবাদ কলহ ঘটিয়াছিল এবং যদ্দ্বারা রোম রাজ্যের বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় অর্থাৎ রোমের ভদ্র ও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে যে বিবাদ হয়, তাহাই অধিক প্রয়োজনীয় ও বহুকালস্থায়ী হইয়াছিল। অতএব প্রথমে তাহারই বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

২। রাজাতন্ত্রের সময়ে প্লীবীয়দিগের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ও সুখ স্বচ্ছন্দতা ছিল, কিন্তু সাধারণতন্ত্রের সূত্রপাত হইতে হইতেই ভদ্রলোকেরা উহাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে প্রধান উপদ্রব এই ছিল যে, ভদ্রলোকেরা ঐ দুঃখী লোকদিগকে অর্থ ঋণ দিয়া ক্রমশঃ দুর্ভেদ্য ঋণশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ক্রীত দাসের মত তাহাদের প্রতি ব্যবহার করিতেন এবং প্রহার ও তাড়না করিয়া তাহাদিগকে অনেক নিগ্রহ করিতেন।

৩। পেট্রিসিয়ানেরাই রোমের মধ্যে ভদ্র ও ধনী ছিলেন। তাঁহারাই কেবল সেনেট সভার সভাসদ হইতেন এবং রাজকীয় কার্য্য সকলের উপর আধিপত্য করিতেন।

তাঁহারাই সৈন্যগণকে যুদ্ধে পরিচালন ও নগর শাসন করিতেন। সমুদায় বিচারের ভার তাঁহাদিগের উপরেই সমর্পিত ছিল এবং বলিদান প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহাদিগেরই প্রভুত্ব ছিল। প্লিবীয়েরা সকলেই নীচ ও দরিদ্র লোক, তাহারা শ্রমজীবী ছিল এবং যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করিতে যাইত। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যান্য বিষয়েও বিস্তর বিভিন্নতা

ছিল এবং তাহাদের পরস্পরের সহিত বিবাহ চলিত না।

৪। প্লিবিয়েরা বহুদিবস পর্য্যন্ত নীরব থাকিয়া সকলই সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে আর নিগ্রহ সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে মিলিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা এককালে রোম পরিত্যাগ করিয়া মন্সেসর পর্ব্বতে বাস স্থাপন করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল রোম উচ্ছিন্ন হউক আর পেট্রিসিয়দিগের অধীন হইব না, আমরা এইখানেই থাকিব।

৫। প্লীবিয়েরাই পেট্রিসিয়দিগের জীবন, অতএব ইহাঁরা একক্ষণে বিষম বিপদে পড়িলেন। অবশেষে সেনেটরেরা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বুঝাইয়া তাহাদিগের ক্রোধশান্তি করিলেন এবং তাহাদিগের প্রার্থনামতে তাহাদিগকে ছয়জন ট্রাইবিউন মনোনীত করিয়া লইতে বলিলেন।

৬। ট্রাইবিউনেরা সেনেট গৃহের দ্বারের সম্মুখে বসিতেন এবং সর্ব্বদাই সাধারণ লোকদিগের হিতাহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহারা প্রতিবৎসর নিযুক্ত হইতেন ও তাঁহাদের শরীরে কেহ হস্তোত্তোলন করিতে পারিত না। ট্রাইবিউন-নিয়োগ সামান্য লোকদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রথম সোপান, তৎপরে ক্রমশঃ ইহারা প্রবল হইয়া ভদ্র লোকদিগের উপরেও কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ করিল।

৭। ট্রাইবিউনেরা আপনাদিগের ক্ষমতা প্রদর্শনার্থ দিন দিন নূতন আপত্তি উত্থাপিত করিতে লাগিল। ৪৪৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা প্রস্তাব করিল যে, প্লীবীয়েরা কন্সল ও অন্যান্য উচ্চপদাভিষিক্ত হইবে। পেট্রিসিয়েরা কোন মতে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে সম্মত হইল যে, দুই জন কন্সলের পরিবর্ত্তে ৬ জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবে ও তাহাদের অর্দ্ধেক পেট্রিসীয় ও অর্দ্ধেক প্লীবীয় হইবে। অতঃপর দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইল।

নূতন সংবাদ।

১। বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার ভাইসপ্রেসিডেণ্ট স্যার গাই ফ্লিটউড উইলসন সাহেবের স্থানে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিব স্যার হারকোর্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

২। একজন ইটালীয় যুবক তারহীন তড়িৎ যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিমূর্ত্তি ও হস্তাক্ষর ইত্যাদি প্রেরণ করিবার এক আশ্চর্য্য প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন।

৩। মিশরদেশের বিচারালয়সমূহে স্ত্রীলোকদিগকে ওকালতী ও ব্যারিষ্টরী করিবার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে মিশরের আইন ব্যবসায়িদিগের মধ্যে শ্রীমতী হ্যাপালি নিকেল সর্ব্বপ্রথম ব্যারিষ্টার। ইনি আইন শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিতেছেন।

৪। শুনা যাইতেছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় কোন ইয়ুরেশীয়ান বালিকাকে বৎসরে ৩০০০৲ টাকা বৃত্তি দিবেন স্থির হইয়াছে। বৃত্তিধারিণীকে ইংলণ্ড কিম্বা স্কটলণ্ডের কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে হইবে এবং সে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি লইয়া অন্য দেশেও পড়িতে যাইতে পারিবে। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হইবে।

৫। বিলাতে Indian Women's Education (ভারতবর্ষীয় নারীগণের শিক্ষাসমিতি) নামে একটী সমিতি আছে, ইহার উদ্দেশ্য ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন। এই সমিতি ভারতের শিক্ষয়িত্রীগণকে সহজ উপায়ে শিক্ষা দিবেন। সমিতির পরিচালিকা লেডী মিউর মেকেঞ্জি। সম্প্রতি স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে এই সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বক্তৃতা করেন তিনি বলেন "ভারতীয় নারীদিগের শিক্ষার সহিত ভারতবাসীরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, উহা তাঁহাদিগেরই সাফল্যের বিষয়। সেই জন্য এ বিষয়ে আমি আপনাদিগের সমক্ষে ভিক্ষার্থিরূপে দাঁড়াইতে পারিব না। আপনারা আমার প্রতি যে সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মহামূল্য বলিয়া জানি। সুতরাং সেই সৌজন্য আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়রূপে পরিণত করিতে আমি অক্ষম। আমাদের দেশের স্ত্রী কিম্বা পুরুষ উভয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান আমাদের দেশের লোকের দ্বারাই হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা যে যথার্থই শিক্ষার অনুরাগী হইয়াছি, তাহা আমাদের আত্মত্যাগের দ্বারাই প্রতিপন্ন হওয়া উচিত, কারণ পরানুগ্রহে বিনাক্লেশে যে ফল ফলিবে, আমাদের নিজের চেষ্টায় ঐ বিষয়ের উন্নতি ও বিস্তার সাধনে আমরা সফলমনোরথ হইলে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা।"

৬। যুক্তরাজ্যের বোষ্টন নগরে "হিরাম" নামক একখানি জাহাজ কেবল মাত্র স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে নাকি পুরুষের কোন সম্পর্ক নাই।

ভ্রম সংশোধন।

গত আষাঢ় সংখ্যার ৬৬ পৃষ্ঠায় উদাসীনের চিন্তার শেষে শ্রীমতী কিশোর কুশারীর স্থানে—শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী হইবে।

বামারচনা।

বেথুন-স্মৃতি।

হে মহাত্মন! হে দেবতা স্বর্গলোকবাসী
লও প্রীতিরাশি,
কবে সেই সে অতীতে তোমা কর ধরে
মাতৃ অঙ্ক পরে,
এসেছিলে হে ধীমান্! বঙ্গ নারীতরে
জ্ঞানালোক করে
অভাগা দেশের তরে কেঁদেছিল প্রাণ
আহা কি মহান্?
তুমি বিশ্বপ্রেমী ওগো মহৎ সুজন
বিশ্বেরি আপন
এই বঙ্গ তরে তব আশা যে সুন্দর
বড় মনোহর
অভাগা বঙ্গের নারী সরস্বতী সমা
হবে নিরুপমা
বঙ্গের উন্নতি তরে ভাবিতে শিখিবে
সত্য প্রতিষ্ঠিবে।
বঙ্গভূমি যোগ্য মাতা যোগ্য বধূ হবে
সুপত্নী গৌরবে
গার্গী মৈত্রী অরুন্ধতী সম তারা আসি
দেবে তম নাশি।

ভবিষ্যৎ চিত্র আঁকি প্রাণ মন দিয়ে,
পরম উৎসাহে
বঙ্গ-নারী-শিক্ষা তরে আত্মা মন প্রাণ
করেছিলে দান
নারীজাতি সম হৃদে তব মহিমায়
ভরা রবে তায়
কাল-পটে আছে তব কীর্ত্তি অনুপম
যাবে না কখন।
তোমার স্মৃতির জলে তর্পণের তরে
শ্রদ্ধাঞ্জলী তরে
কল্যাণীরা কৃতজ্ঞতা পুষ্পরাজি লয়ে
এসেছে উৎসাহে
আশীর্ব্বাদ কর দেব স্বর্গলোক হতে
যেন গো ভারতে
জ্ঞানালোকে ধুয়ে আঁখি অমৃত সন্ধানে
নারী সত্য প্রেমে
মাতৃভূমি তরে হোক সার্থক সুকন্যা,
জগতে সুধন্যা,
বঙ্গভূমে লয়ে যাক বিশ্বপ্রেম পথে
শোভার সম্পদে।

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

অমরার শিশু।

কে তুই রে স্বরগের শিশু
উষার সে সুবিমল প্রাতে,
দেবতার স্নেহাশীষরূপে
ধীরে নামি এলি এ ধরাতে।

মন্দারের পবিত্র সুবাসে
সুবাসিত করিল এ গেহ,
পুন ওই দগ্ধ হৃদিমাঝে
উথলিল অজানিত স্নেহ।
বুঝিনিরে অবোধ আমরা
এ যে তোর ছলনা অপার,
খেলিবে যে তুদিনেরই তরে
অশ্রুধারা বহাবে আবার।
ধূলিলিপ্ত এ ধরণীবুক
তোর যোগ্য নহে রে এ স্থান,
তাই ত্বরা চলে গেলি ওরে
তুই পূত স্বর্গীয় অম্লান।
তুই যেরে অমরার ফুল
হেথাকার উত্তাপিত বায়,
সহিল না ও পেলব অঙ্গে
তাই ধীরে গেলিরে শুখায়ে।
ছিলি না ত তুই হেথাকার
ওযে শুভ্র পারিজাত হার,
চিনিতে পারিনি তোরে মোরা
ভুলে ভেবেছিনু আপনার।
হেথাকার ধূলি মলিনতা
তোমার ও সুকোমল অঙ্গ
কলঙ্কিত করে এই ভয়,
তাই খেলা করিলে কি সাঙ্গ ?
দেবতার নির্ম্মাল্য যে তুমি
স্তব ওই পবিত্র বয়ান,
নিবেদিয়া তাঁহারই চরণে
সুখে আজি করিলে প্রয়াণ।
অভিশপ্ত আমাদের প্রাণ
শুধু আজি করে হাহাকার,
আঁধার কালিমা লিপ্ত গেহ
হল আজি দ্বিগুণ আঁধার॥

শ্রীঅমলা দেবী।

পরলোক।

অজানা অজ্ঞাত কোথা দেশ পরলোক,
মরণের পরে যেথা মানবের গতি ?
জানিলে সে দেশ মোরা দেখিতাম গিয়ে,
কেমনে রয়েছে তথা লুকায়ে সকলে।
অদৃশ্য কল্পনাতীত একি চমৎকার,
ভাবিলে বিস্ময়ে মন হয় অভিভূত,
কালের করাল গ্রাসে অহরহ সবে
পশিতেছে, কিন্তু তার কেমন নিয়ম,
কেহই জানে না কভু সে দেশ কোথায়।
যাহা যার ইচ্ছা সেই যুক্তি তর্ক করি,
নানারূপ প্রবাদ সে করেছে চলিত।
ইচ্ছা হয় পৃথ্বীময় খুঁজিয়া বেড়াই,—
কেহ কি কহিবে মোরে ইহার নির্ণয় ;
কেহ কি দেখায়ে দেবে সে দেশের পথ,
হেন যোগী সাধু কেহ আছে কি ভুবনে ?
গিয়াছে যাহারা সেই পরলোক-ধামে,
দেখা কি হইবে মম মরণের পরে,
এ এক বিস্ময় মনে রহিয়াছে সদা,
জানি না যে কত দিনে মিটিবেক ইহা।

স্বর্গীয়া হেমন্ত কুমারী সেন গুপ্তা।

১৩।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 601. September, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০১ সংখ্যা। } ভাদ্র, ১৩২০। সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ { ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

জন্মদিনে।

এই ঘূর্ণায়মান জগতের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে আর এক বৎসর অতিক্রম করিয়া এই নির্ম্মল প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আমি আজ নব বর্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। আজ আমার ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল, আমি ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিলাম। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই মহানগরীতে কয়েক জন মহাত্মার হৃদয় নিঃসৃত শুভ ইচ্ছা হইতে আমার জন্মলাভ হইয়াছিল। সেই সময় এই ভারতের অবস্থা অতি সংশয়াকুল ছিল। ভারতবাসীর শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞানগরিমার চরম গতি যে কোথায় হইবে, তখন তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না, তখন ভারতের নারীগণের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। সেই সময়ে ভারতের পুরুষগণ সকলেই প্রাণে এক মহা আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। সদ্য সুপ্তোত্থিত মানব যেমন কার্য্যের জন্য ইচ্ছুক হয় অথচ জড়তা বশতঃ কিছুই করিতে পারে না, কিন্তু তাহার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেইরূপ বঙ্গবাসীর জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুত্থানের প্রথম উন্মেষের সময় আমার জন্ম হয়। রাবণবিনাশের জন্য ঋষিশোণিত হইতে সীতার উৎপত্তি হইয়াছিল, বামাগণের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান ও ধর্ম্মে তাহাদিগকে বিভূষিত করিয়া তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশের জন্য বামাহিতার্থী মহাত্মাগণ একান্ত ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের শুভ ইচ্ছার দ্বারা আমার জন্ম দিলেন। তখন আমি

সদ্যপ্রসূত বালিকা, বর্ষাকালের ঘন অন্ধকারময় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। পিতা সেই সময় বিশ্বপিতার নামে আমাকে উৎসর্গ করিয়া জগতের অসংখ্য রমণীদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, বৎসে! এই যে রমণীদিগকে দেখিতেছ, ইহাঁরা তোমার ভগিনী, তুমি ইহাঁদের নিকট যাও, ইহাঁরা ঐ আকাশের ন্যায় অজ্ঞানতার মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, আমরা তোমার হৃদয় যে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিয়া দিলাম, সেই আলোক ইহাঁদের মধ্যে বিতরণ কর। ঐ উর্দ্ধে আকাশে যে ঘন অন্ধকারময় মেঘ দেখিতেছ, উহা প্রবল বারিপাতে বিদূরিত হইয়া গেলে যেমন নব আলোক প্রকাশিত হইবে, আমরা আশা করি, তুমিও তোমার হৃদয়নিঃসৃত জ্ঞানালোক দ্বারা রমণীগণের হৃদয়ের এই অজ্ঞানতার নিবিড় অন্ধকার দূর করিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে সেইরূপ নব আলোকে আলোকিত করিতে সক্ষম হইবে। পিতার আদেশে আমি আমার ক্ষুদ্র দেহখানি লইয়া অতি ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইলাম। এই অসংখ্য জনমণ্ডলীর মধ্যে আমার প্রাণ কয়দিন বাঁচিবে ও আমার জীবনের ব্রত সফল হইবে কিনা তখন তাহা জানিতাম না। কারণ তখনকার সেই ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ বঙ্গবাসীর অন্তঃপুরে আমার প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। পাঠিকাগণ আপনারা বোধ হয় সে কথা এখন কল্পনাও করিতে পারেন না। তখন লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হইবে, এই সংস্কার নারীদিগের হৃদয়ে দৃঢ়মূল ছিল। পুরুষদেরও এই সংস্কার ছিল যে, নারীর লেখা পড়া শিখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সংসারের গৃহকার্য্যের জন্যই নারীর সৃষ্টি। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আমার সঙ্কল্প ও ব্রত যে সফল হইবে তাহা একরূপ দুরাশা মাত্র। কিন্তু মহাত্মাগণের শুভ ইচ্ছায় ও সর্ব্বোপরি পরম পিতার আশীর্ব্বাদে আমি আজ এই পঞ্চাশ বৎসর কাল আমার ভগিনীগণের সেবায় ও নিজ সঙ্কল্পিত ব্রত পালনে কিয়ৎপরিমাণে সক্ষম হইতে পারিয়াছি, এজন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতাভরে সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে। আজ তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন তাঁহার আদেশ মস্তকে লইয়া তাঁহারি সেবায় অনন্তকাল নিয়োজিত থাকিতে পারি।

উদ্বোধন।

হে সর্ব্বেশ্বর! ঐ দেখ! দাসীর প্রাণশূন্য দেহ তোমার পদতলে পড়িয়া আছে। হে প্রাণময় পুরুষ! যাহার প্রসাদে মৃতও জীবিত হয়, শূন্যও পূর্ণ হয়, যাহার প্রসাদে—

শ্মশানে শবের অস্থি, শীর্ণ, বিগলিত,
প্রাণ পেয়ে নাচে প্রেমে হ'য়ে পুলকিত।

তোমার সেই চরণরেণু এ শবদেহে দান কর। যাহার প্রসাদে অহল্যা পাষাণ হইয়াও প্রাণ লাভ করিল, নৌকা

কাষ্ঠময় হইয়াও সুবর্ণময় হইল, গুহক চণ্ডাল হইয়াও দেবপূজ্য হইল, শ্রমণা চণ্ডালিনী হইয়াও বৈকুণ্ঠবাসিনী হইল, বিভীষণ রাক্ষস হইয়াও অমর হইল, তোমার সেই মৃত-সঞ্জীবনী চরণধূলি এ শবদেহে দান কর।

প্রার্থনা।

হে নরকান্তকারি হরি!
দিবি বা ভুবি মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশরদিন্দুবিম্বৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥

স্বর্গেই বসতি কিম্বা মর্ত্তেই বসতি,
অথবা হউক মোর নরকেই গতি,
শরতের পূর্ণচন্দ্র যার কাছে ছার,
মলেও ভুলি না যেন সে পদ তোমার।

নচ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

সহস্র সহস্র বার লভি না জনম,
পশু পক্ষী হই কিম্বা হই কীটাবাস,
যে যোনিতে ওহে নাথ! করি না গমন,
তোমাতে একান্ত ভাবে থাকে যেন মন।

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তি স্থিরা ত্বয়ি॥

অখিল বিশ্বের মূল তুমি ভগবান্!
তোমাতেই আত্মা যেই করে সমাধান,
তাহার হস্তেই মোক্ষ থাকে অনুক্ষণ।
ধর্ম্ম অর্থ কামে তার কিবা প্রয়োজন?

"সুপ্তা কিং নু মৃতানু কিং—
তব পদে লীনা বিলীনা নু কিং

—হে দেব! এ দাসী তোমার পদতলে নিদ্রিতা? না মৃতা? লীনা? না বিলীনা?

জ্যোতির্ম্ময়! তোমার ধ্যানমাত্রেই এ দাসীর হিমাঙ্গ দেহ অগ্নিময় হইতেছে, প্রাণে শত শত বিদ্যুৎ চমকিতেছে, হৃৎপদ্মে কোটী কোটী সূর্য্যের উদয় হইতেছে।

জয় জগদীশ বিশ্বকারণ পালন,
বিশ্বপিতা বিশ্বমাতা জগৎ-তারণ।
তুমি জন্মদাতা পিতা পালক আমার,
জননী করুণাময়ী স্নেহ-পারাবার,
তুমি গুরু জ্ঞানদাতা নয়ন-অঞ্জন,
তুমি বন্ধু সখা প্রিয়তম প্রিয়জন।
তুমি প্রভু ন্যায়কারী শুভ দণ্ডদাতা,
তুমিই আশ্রয় গৃহ চির-শান্তি-ধাম;
তুমি জীবনসম্বল পরম রতন,
তুমি বল শক্তি সর্ব্ব জীবন জীবন।
তুমিই চৈতন্য জ্ঞান বুদ্ধি চিরকাল,
তুমি সুখ শান্তি চির আনন্দ আমার
দাতা তুমি সর্ব্ব সুখ করিছ বিধান,
বিপদভঞ্জন মুক্তিদাতা বিধাতা মহান্।

বামাবোধিনীর জুবিলী উপলক্ষে

ধীরে ধীরে ধীরে অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত
হইল আজ,
কত শত বাধা ঝঞ্ঝা, আসিল, কত বা
পড়িল বাজ,
তবু দয়াময় তোমারি করুণা, শুভ
স্নেহাশিষ—
বামাবোধিনীর শুভ্র শিরে পড়েছিল
জগদীশ।
তাই আজ মোরা স্মরি আনন্দোৎসবে—
তব নাম।
ভ্রাতা ভগিনী, বান্ধব যত, করিতেছি
প্রণিপাত।
হে শুভময় সুন্দরতম! নিখিলের
অধিপতি—
দাও উৎসাহ নব, জাগ্রত কর হে শকতি,
যেন গো দেবতা সদা সর্ব্বদা তোমারে
হৃদে ধরে—

বামাবোধিনীর কর্ত্তব্য যত সাধিতে
বল হয়।
ওগো সহৃদয় বন্ধু বামাবোধিনীর যত প্রিয়,
কৃতজ্ঞতা সহ অন্তর হ'তে প্রণাম
সবে লয়ো।
পিতঃ প্রণিপাত! স্বরগ হইতে নয়ন
মেলি হের
এই শুভ বাসরে, কর সন্তান সবে
আশির্ব্বাদ।
লহ ভক্তি উপহার
দুই বিন্দু অশ্রু সার,
অধম সন্তান, দীন হীন পাব আর
কি কোথায়—
যোগ্য উপহার তোমারে দিতে কিছু
নাই পিতৃদেব!

ভক্তাধীন
শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

"পারস্য প্রবাদ"

"যখন তুমি এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলে, তখন সমস্ত পৃথিবীস্থ ব্যক্তিগণ হাস্য করিতেছিল এবং তুমি নিজে কাঁদিতেছিলে, কিন্তু যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তখন তোমার মুখমণ্ডলে হাসির রেখা উদ্ভাসিত হইল, কিন্তু সমস্ত জগদ্বাসী তখন ক্রন্দন করিতেছিল।"

উক্ত প্রবাদটী পারস্য দেশে প্রচলিত। পূর্ব্বোক্ত প্রবাদটীর দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে, দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ মতে। কাহারও নিকট প্রথমভাবে ব্যাখ্যা বোধগম্য হয়, কাহারও নিকট দ্বিতীয় ভাবের ব্যাখ্যা বোধগম্য হয়।

প্রথমতঃ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে উহার ব্যাখ্যা করিলে এই অর্থ হয় :—

আত্মা জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে মুক্ত ভাবে স্বেচ্ছামত অবস্থান করে, তখন তাহার কোনরূপ যাতনা বা সুস্থতা প্রভৃতি যাবতীয়-সুখদুঃখ-বোধক কোন ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকে না। কিন্তু আত্মা যখন মানবদেহ ধারণপূর্ব্বক ধরাতে জন্ম গ্রহণ করে ও অবতীর্ণ হয়, তখন তাহাকে ইন্দ্রিয়সমূহের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়; তখন তাহার পূর্ব্বের ন্যায় সে স্বাধীন ও মুক্ত ভাব থাকে না, পৃথিবীতে সুখ, দুঃখ, যাতনা, আশা, নৈরাশ্য, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়রিপুর দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়। ফলতঃ পরীক্ষা-স্থানরূপ ধরাতে আগমনপূর্ব্বক তাহাকে পূর্ব্বোক্ত রিপু-সমূহের ভিতর দিয়া নিজে সংগ্রাম করিয়া স্থির ভাবে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এই সকল স্মরণ করিয়া মানব-দেহরূপী আত্মা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার সময় ক্রন্দন করে। কিরূপে এই পৃথিবীরূপ পরীক্ষাস্থল হইতে উদ্ধার পাইবে তাহা স্মরণপূর্ব্বক বিমর্ষ হয়। জগতের লোকসমূহ তাহাতে হর্ষ প্রকাশ করে, কারণ তাহারা ভাবে যে আমরা এই পরীক্ষাস্থলে অবস্থান করিয়া ষড়রিপু, আশা, নৈরাশ্য, দারিদ্র্য, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির সংগ্রাম দ্বারা নিষ্পেষিত হইতেছি, তথাপি যাহা হউক আমাদের আর একজন সাথী হইল, সে আমাদের এই দুঃখের ভাগী হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত :—

কোন কার্য্যের নিমিত্ত যদি অনেককে তিরস্কৃত হইতে হয়, তাহাতে সেই তিরস্কার ততটা গায়ে লাগে না। সেইরূপ সকলে একত্রে কোন কষ্ট ভোগ করিলে, তবু যেন কষ্টের একটু লাঘব বোধ হয়। তাহার পর মৃত্যুর সময় মানবদেহধারী আত্মা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করে, কেননা, সে যে পরীক্ষাস্থলে উপনীত হইয়াছিল তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে প্রস্থান করিতেছে ও জন্মের পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় স্বীয় স্বাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, ইহা স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যু-মুখে পতিত হয় ও ভগবানের বিমল ঐশ্বর্য্য স্বরূপ ভগবৎ-ধ্যান ও জ্ঞানে সময় অতিবাহিত করিবে, এই নিমিত্ত হর্ষ প্রকাশ করে। কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর লোকসমূহ ক্রন্দন করে, এইজন্য যে তাহাদের একজন সাথী কেমন সংসার-রূপ সংগ্রামস্থলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থান করিল, আর তাহারা এখনও পৃথিবীর দুঃখ ভোগ করিবার জন্য রহিল বলিয়া বিলাপ করে। ও প্রস্থান করিল, আর আমরা রহিলাম, এই বিলাপ-ধ্বনি স্বার্থপরতা-সূচক।

দ্বিতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ মতে উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

যখন কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, সে জন্মিবামাত্রই ক্রন্দন করে, কেননা এতদিন মাতৃ-উদরে সুখে অবস্থান করিয়া, পঞ্চভূতের

সংস্পর্শরহিত হইয়া সুখে ছিল, কিন্তু এক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে ও বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূতের দ্বারা স্পৃষ্ট হইতে হইবে, এজন্য ক্রন্দন করে। একেবারে পঞ্চভূত সংস্পর্শ-বিহীন হইয়া ছিল, কিন্তু জন্মমাত্র বায়ু, আলোক প্রভৃতির স্পর্শে কষ্ট অনুভব করিয়া ক্রন্দন করে। যে বাড়ীতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহারা তখন সকলে হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে, কারণ সে একটী নূতন লোক আসিল, তাহাকে তাহারা ভালবাসিতে পারিবে ও সে তাহাদের প্রতি ভালবাসা দেখাইতে পারিবে। বৃদ্ধ বয়সে সে তাহাদের প্রতিপালক হইবে, ও ভবিষ্যতে তাহাদের বংশের উন্নতি ও মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে, এই সকল স্মরণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, পুত্রহীন পিতা মাতাকে নিরয়গামী হইতে হয়, সুতরাং পুত্রই উদ্ধারকর্ত্তা, এই জন্য তাহারা সন্তানের জন্মগ্রহণে হর্ষ প্রকাশ করে। তৎপরে সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে প্রকৃত হাসে না, কারণ মৃত্যুসময়ে মনুষ্যের মুখ বিকৃত হয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়, সুতরাং ঐ মুখবিকৃতিকে সাধারণে হাসি বলিয়া কল্পনা করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা হাসি নয়, কেবল মৃত্যুসময়ের মুখবিকৃতি মাত্র। জগতের লোক তাহার মৃত্যু দর্শনে ক্রন্দন করে, কারণ তাহাদের এক জন নিকটস্থ প্রিয় আত্মীয় বিয়োগ হইল। তাহার প্রতি সকলেই মমতা-পরবশ ছিল, তাহাকে সকলেই ভালবাসিত, সে সকলের একমাত্র আশা ভরসা, নয়নের মণি ও জীবনের লক্ষ্য, এবং আদরের বস্তু ছিল। যে তাহার স্নেহ মমতা দ্বারা সকলকে বশীভূত ও আকৃষ্ট করিয়াছিল সেই প্রিয় বস্তুর বিয়োগে, সেই আদরের সামগ্রী সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রস্থান করিল, এই ভাবিয়া সকলে ক্রন্দন করিতে থাকে ও নিয়তির অপূর্ব্ব বিধানের উপর দোষারোপ করে।

এই প্রবাদটীর উপরি উক্ত দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এই প্রবাদটীর সমস্তই সত্য। যে ভাবে ব্যাখ্যা করিবে সেই ভাবের মধ্যেই এমন একটী বিশেষত্ব আছে যে, তাহা দ্বারা মনুষ্যের মন আকৃষ্ট হয় ও জগতের লোকের উপকার হয়। যে গ্রন্থে ইহা লিখিত, সে গ্রন্থ যে জগতের মধ্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ তাহার লেখককে ও যে দেশে লিখিত হইয়াছে, সেই পারস্য দেশকে বিপুল গৌরবে ভূষিত করিয়াছে, ও ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে একটী অমূল্য নিধি স্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। উক্ত উপদেশ দ্বারা জগতের যে কি সুমহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত।

কুমারী মণিকা রায় চৌধুরী।

গোলাপ

ফুলের যত প্রকার গুণ থাকা আবশ্যক, গোলাপের মধ্যে সে সকল গুলিই বর্ত্তমান। ইহার সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। পারস্য ভাষায় গুল অর্থাৎ "ফুল" বলিলে (the flower) গোলাপকে বুঝায়; অন্য ফুলের নাম করিতে হইলে গুলের সহিত একটী বিশেষণের আবশ্যক, যথা—গুল-মখমল, গুল-সবেবা ইত্যাদি। ইংলণ্ড এবং পারস্যের কবিগণ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গোলাপের সহিতই তাহার তুলনা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে গোলাপ ছিল না, থাকিলে ভারতীয় কবিগণও গোলাপকে পদ্মের ন্যায় উচ্চ স্থান প্রদান করিতেন।

পদ্মের শোভা স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে জড়িত, ইহা যত্নের অপেক্ষা করে না,সরোবর এবং হ্রদে আপনা আপনিই জন্মিয়া থাকে এবং ফুটিয়া চারি দিক আলোকিত করে। জনশূন্য স্থানে, কেহ দেখুক বা নাই দেখুক, ইহা চারি দিকে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার যশ কীর্ত্তন করে। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে শোভিত সরোবর বা হ্রদ দেখিলে হৃদয় মন পবিত্র হয়। পদ্মের পবিত্রতাপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ভারতীয় কবিগণ মুগ্ধ হইয়া যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র তাহাই পদ্মের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

একটী উৎকৃষ্ট এবং সুপ্রস্ফুটিত গোলাপ এবং একটী পদ্মফুল লইয়া তুলনা করিলে পাঠক বোধ হয় গোলাপকেই উচ্চ স্থান দিবেন। গোলাপের একটী ফুলেই যেন চারি দিক আলো করে এবং ইহার স্নিগ্ধ সৌরভে প্রাণকে আমোদিত করে। কিন্তু পদ্ম যেমন আদর ও যত্নের অপেক্ষা করে না, গোলাপ সেরূপ নহে। গোলাপ গাছের বিশেষ যত্ন করিলে তবে উৎকৃষ্ট ফুল পাইবার আশা করা যাইতে পারে। গোলাপ সুরক্ষিত উদ্যানের বস্তু, মানুষের যত্নে প্রতিপালিত।

এমন সুন্দর ফুলের গাছ সকল গৃহস্থের বাটীতেই থাকা আবশ্যক। বাটীর সংলগ্ন ভূমি না থাকিলেও টব বা গাম্‌লাতে গোলাপ গাছ রাখা যাইতে পারে। টব বা গামলায় রাখিতে হইলে ১ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট টব বা গাম্‌লাই উপযোগী। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গোলাপের সর্ব্বশুদ্ধ এক বা দুই ডজন গাছ থাকিলেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা এবং বেহারের মৃত্তিকা গোলাপের পক্ষে উপযোগী। উত্তর পশ্চিম এবং পঞ্জাবেও গোলাপ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। যত্ন করিলে গোলাপ সকল স্থানেই উৎপাদন করা যাইতে পারে।

মুসলমান রাজাদিগের আধিপত্যকালেই বোধ হয় গোলাপ সর্ব্বপ্রথম এদেশে আনীত হয়। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত বস্‌রাই

প্রভৃতি অল্প কয়েক প্রকার মাত্র গোলাপ এদেশে জন্মিত। ইংরাজদিগের সময়ে বিদেশ হইতে নানাপ্রকার গোলাপ আনীত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে অসংখ্য প্রকারের গোলাপ এদেশে জন্মিয়া থাকে। সে সকলের নাম পাঠকপাঠিকা-গণের গোচর করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে যে প্রকারের অল্পসংখ্যক উৎকৃষ্ট গোলাপ বাটীতে বা উদ্যানে রাখিলে সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারা যায়, তাহাদেরই তালিকা ও সঙ্ক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

ক। লাল গোলাপ—

১। Monte Cristo—মন্টি ক্রিষ্টো। ইহার বর্ণ খুব ঘোরাল লাল, অনেক সময় রং কাল বলিয়া মনে হয়। ইহার বড়, ঘন-দল, সুগন্ধবিশিষ্ট ফুল হয়।

২। Black Prince—ব্ল্যাক প্রিন্স। ইহার রং খুব ঘোরাল লাল। অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ফুল অতি সুন্দর। ফুলটী সমস্ত ফুটিয়া গেলে ইহার রং তত ঘোরাল থাকে না। ইহার ফুলও খুব বড় এবং সুগন্ধবিশিষ্ট হয়।

৩। Paul Nero—পল নিরো। ইহার ফুল সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। রং গোলাপী, ফুল সুগন্ধবিশিষ্ট।

৪। La France—লা ফ্রান্স। গোলাপী রং, বড় সুগন্ধি ফুল। বারমাসই ফুল হয়।

৫। Damask Rose—বস্‌রাই গোলাপ।

৬। Reine Marie Henrietta—রেন মেরী হেনরিয়েটা—লাল লতানে গোলাপ।

৭। Rose Edward—রোজ এডওয়ার্ড—সুন্দর গোলাপী রং।

খ। হলুদে গোলাপ—

১। Marchal Neil—মার্শেল নিল। ইহার গাছ লতানে হয় এবং গাছে অসংখ্য ফুল হয়। অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ফুল অতি সুন্দর। ইহার গন্ধ স্নিগ্ধ।

২। Augusta Vacher—আগষ্টা ভ্যাচার। ফুলের বর্ণ তামার ন্যায়। অতি সুন্দর।

৩। Gloire de Dijou—গ্লয়ার ডি ডিজো। ইহার গাছ এবং ফুল মার্শেল নিলের ন্যায়।

গ। সাদা গোলাপ—

১। Acidah (Tea rose)—এসিডা টিরোজ—স্নিগ্ধগন্ধবিশিষ্ট।

২। Citrodora—সাইট্রোডোরা—লতানে গাছ। অনেক ফুল হয়। এই গাছ অতি শীঘ্র হয় এবং ইহার ফুল অতি সুন্দর।

৩। Madame Noman—ম্যাডাম নোমান—ছোট গাছ, ফুল অধিক হয়।

৪। La Marquis—লা মার্কুইস—সাদা লতানে গোলাপ। অনেক ফুল হয়।

উক্ত কয়েক প্রকার গোলাপের মধ্যে বাছিয়া ইচ্ছামত গাছ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

নবেম্বর মাস গোলাপ রোপণের প্রশস্ত সময়। গাছ রোপণের সাধারণ নিয়ম এই যে, যে গাছের যে ঋতুতে নূতন পাতা ও ডাল বাহির হয়, সেই গাছ সেই ঋতুতে রোপণ করিতে হয়। নবেম্বর মাসে গোলাপ গাছের নূতন পাতা বাহির হয় ও স্বভাবতঃই গাছের তেজ হয়। সুতরাং এই সময়ই ইহা রোপণের উপযুক্ত সময়। অপর সময়ে যে গাছ রোপণ করা যাইতে পারে না এরূপ নহে, তবে তাহা অপেক্ষাকৃত যত্নসাধ্য।

গোলাপ গাছ প্রথম রোপণ করিবার সময় কোন প্রকার সার না দেওয়াই ভাল। কারণ গাছের প্রথম অবস্থায় সার দিলে তাহাতে উই ধরিবার সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ব্যতীত গাছের অবস্থানুযায়ী যতটুকু আহার প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত সার থাকায় গাছ ভাল হয় না। গাছ রোপণের পর মাটীতে গাছ লাগিয়া গেলে, তাহাতে প্রথমে অল্প অল্প পরিমাণে জলীয় সার দেওয়াই ভাল। পরে গাছ যেমন বড় হইবে, সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। এক বৎসরের পুরাতন গাছে ইচ্ছামত সার দেওয়া যাইতে পারে। গাছ নূতন রোপণ করিবার পর গোড়ার মাটী ফাটিয়া গেলে তাহা খুলিয়া বন্দ করিয়া দিতে হইবে, নতুবা ফাট দিয়া বাতাস গিয়া গাছকে নষ্ট করিয়া দিবে।

গোলাপের পক্ষে গোবরই উৎকৃষ্ট সার। নূতন গাছে পাতা সার বা পুরাতন গোবরের সার জলে গুলিয়া সেই জল দিতে হইবে। পুরাতন গাছের গোড়ায় মাটী সরাইয়া সেই স্থানে সার পুতিয়া দিতে হইবে। পুরাতন গাছের গোড়ায় টাট্‌কা গোবর দিয়া উচ্চ হইতে সেই স্থানে জল ঢালিয়া দিলে খুব বড় এবং সুগন্ধি ফুল হয়।

একটী কলসীতে টাট্‌কা গোবর জলে গুলিয়া রাখিয়া সেই জল স্থির হইলে উপরের জলীয় ভাগ গাছের গোড়ায় দিতে হইবে এবং অবশিষ্ট গোবরে পুনরায় জল দিয়া রাখিয়া এক সপ্তাহ পরে পুনরায় সেই জল দিতে হইবে। এইরূপে কলসীর গোবর ৩ ৪ সপ্তাহ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই প্রকার সারে খুব উপকার হয় এবং ফুল খুব ভাল হয়।

হাড়ের গুঁড়া গোলাপ গাছে দিবার নিয়ম এই যে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এক ভাগ হাড়ের গুঁড়া ও দুই ভাগ গোবর জলে মিশাইয়া একটী কলসীতে রাখিয়া ৩ মাস পচাইতে হইবে। এমোনিয়া গ্যাস উড়িয়া না যায়, এই জন্য কলসীর মুখে ঢাকা দেওয়া প্রয়োজন। এমোনিয়া অতি উপকারী সার। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ঐ মিশ্রিত সার অবস্থানুসারে গোলাপ গাছের গোড়ায় দিতে হইবে।

গোলাপ গাছে সার দিবার পক্ষে নবেম্বর মাসই উৎকৃষ্ট সময়। এই সময় গাছের গোড়া খুরপী দিয়া খুঁড়িয়া দিয়া তাহার মাটী সরাইয়া দিতে হইবে, তাহাতে গাছের গোড়ায় ও শিকড়ে শিশির ও

রৌদ্র লাগে। এইরূপে দুই সপ্তাহ কাল শিশির ও রৌদ্র খাওয়াইয়া তৎপরে সেই খনিত স্থান সার দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে সকল গাছ এক বৎসরের অধিক পুরাতন, তাহাতেই এই প্রকারে সার দিতে হইবে। নূতন গাছে এরূপ গোড়া খুঁড়িয়া সার দিলে গাছ মরিয়া যাইবে।

মন্টিক্রুষ্ট প্রভৃতি ঘোরাল রং বিশিষ্ট ফুল গাছের গোড়ায় লৌহচূর্ণ দিলে ফুলের রং খুব ভাল হয়। একটী লৌহের পেরেক গোড়ায় মাটীতে পুতিয়া দিলেও চলিতে পারে।

ডাল কাটা।

লতানে গোলাপ এবং Tea Rose ব্যতীত আর সকল গোলাপ গাছের প্রতি বৎসর ডাল কাটা আবশ্যক। ডাল না কাটিলে ভাল ফুল হয় না। নবেম্বর মাসে যে সময় গাছের গোড়ার মাটী সরান হয়, সেই সময় গাছের ডাল কাটিয়া দিতে হইবে। দুই বৎসরের অধিক পুরাতন ডালগুলি একেবারে নির্ম্মূল করিয়া কাটিতে হইবে। অপর ডালগুলি দেড় হাত রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। একটী গাছে ৩।৪ টীর অধিক ডাল না রাখাই ভাল। যে সকল গাছ নূতন রোপণ করা হয়, তাহার ডাল কাটিতে নাই। গাছ এক বৎসরের পুরাতন হইলে ডাল কাটিবার উপযুক্ত হয়।

কিন্তু লতানে গোলাপের এবং Tea Rose-এর ডাল কাটিলে গাছ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাতে ফুল ভাল হয় না। এ সকল গাছের কেবল শুষ্ক ডালগুলি কাটিয়া দিতে হয় এবং গোড়ায় ঝোপ হইলে ডাল কাটিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, গোলাপ গাছে উৎকৃষ্ট ফুল পাইতে হইলে নবেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত নিয়মগুলি রক্ষা করা আবশ্যক—

১। নবেম্বর মাসে গাছের ডাল কাটা এবং গোড়া খুঁড়িয়া মাটী সরাইয়া দেওয়া।

২। দুই সপ্তাহ কাল গাছের গোড়ায় শিশির এবং রৌদ্র খাওয়ান।

৩। দুই সপ্তাহ পরে গাছের গোড়া সার দ্বারা পূর্ণ করা এবং গোড়া এরূপ ভাবে গাম্‌লার ন্যায় করিয়া দেওয়া যে, তাহাতে জল দিলে জল গোড়ায় বসিতে পারে।

৫। গোড়ায় কাঁচা গোবর দিয়া উচ্চ হইতে জল ঢালা, অথবা কলসীতে জল দিয়া গোবর গুলিয়া গাছের গোড়ায় সেই জল দেওয়া। এইরূপ জল সপ্তাহে একবার বা দুইবার করিয়া দিতে হইবে।

৩। ৩।৪ দিন অন্তর গাছের গোড়া খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

৬। এক দিন অন্তর গাছের গোড়ায় জল যথেষ্ট পরিমাণে দিতে হইবে।

৭। শুষ্ক ফুলগুলি বোঁটা শুদ্ধ কাটিয়া দিতে হইবে। গাছে অধিক কুঁড়ি ধরিলে তাহার কতকগুলি কাটিয়া দিতে হইবে।

৮। লতানে গোলাপ ও Tea Rose-

এর পক্ষে ডাল কাটা ব্যতীত উক্ত সকল প্রকার নিয়ম রক্ষা করা আবশ্যক।

বসরাই এবং দেশী গোলাপের ডাল ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসে কাটিলেই ভাল হয়। কারণ ইহাদের ফুল নাবি হয় এবং এই জন্য ইহাদের ডাল কাটা ও গোড়ায় সার দেওয়া বিলম্বে হইলেই ভাল হয়।

উক্ত প্রকারের নিয়মগুলি পালন করিলেই উৎকৃষ্ট ফুল পাইতে পারা যায়।

গোলাপের কলম।

গোলাপের কলম প্রস্তুত করা অতি সহজ। নিজের গোলাপ গাছ হইতে ইচ্ছা করিলেই অনেক কলম করা যাইতে পারে। নিম্নে কয়েক প্রকার সহজ উপায় লেখা হইল।

১। নবেম্বর মাসে যখন গোলাপ গাছের ডাল কাটা হইবে, সেই সময় ডালগুলি হইতে এক বৎসরের বা তাহা অপেক্ষা অল্প পুরাতন ডাল বাছিয়া লইয়া সেই ডালগুলি ৪ ইঞ্চ লম্বা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিতে হইবে। পরে সেই টুক্‌রাগুলি একত্রে আটি বাঁধিয়া কোন শীতল স্থানে আটিটী সোজা ভাবে অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত মাটীতে পুতিয়া একমাস কাল রাখিতে হইবে ও প্রতিদিন তাহাতে জল দিতে হইবে। কিছু দিনের মধ্যে সেই টুক্‌রাগুলি কতক শুকাইয়া যাইবে এবং কতকগুলি হইতে নূতন শাখা ও পত্র বাহির হইবে। এক মাস পরে আটিটী খুলিয়া যে টুক্‌রাগুলি সতেজ আছে দেখিবেন, সেই গুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া একটী ছায়াযুক্ত কেয়ারিতে ৬ ইঞ্চ অন্তর অন্তর সারবন্দী করিয়া রোপণ করিবেন এবং কেয়ারিতে প্রত্যহ জল দিবেন। গাছগুলি এই ভাবে পরবর্ত্তী নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত কেয়ারিতে থাকিবে। কেয়ারিতে যে সকল গাছ হইবে, তাহা নবেম্বর মাসে গাম্‌লায় বা অন্য স্থানে রোপণ করা যাইতে পারে।

উপরি-উক্ত প্রকারের টুক্‌রাগুলি, আটি খোলার পর কেয়ারিতে রোপণ না করিয়া যথাস্থানেও রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রতিদিন জল দিতে এবং তাহার উপর কোন প্রকারে ছায়া করিয়া দিতে হয়।

২। Gigantia—জাইগ্যানসিয়া নামক এক প্রকার জঙ্গলী গোলাপ আছে, তাহার ফুল থলো থলো ও ছোট আকারের হয় এবং তাহার গাছ লতানে হয় ও অতি সহজে তাহার বৃদ্ধি হয়। উক্ত গোলাপের ডাল কাটিয়া উপরি-উক্ত প্রকারে গাছ করিয়া সেই গাছ গাম্‌লায় বসাইয়া ভাল গোলাপ গাছের নিকট রাখিয়া জোড় কলম বাঁধিতে হয়। বর্ষাকালই জোড় কলম বাঁধিবার প্রশস্ত সময়। গাম্‌লার গাছের ডালের অল্প অংশ চাঁচিয়া, এবং গোলাপের যে ডালের কলম বাঁধা হইবে তাহার অল্প অংশ চাঁচিয়া, উভয় ডালের সেই চাঁচা অংশ একত্র করিয়া সূতা দিয়া বাঁধিতে হইবে। কিছু দিন পরে দুইটী ডাল সেই স্থানে জোড়া লাগিয়া

যাইবে। যখন দেখা যাইবে যে, ডাল দুইটী বেশ জোড়া লাগিয়াছে এবং জোড়ের স্থানটী গাঁটের ন্যায় হইয়াছে, সেই সময় মূল গাছের ডালের জোড়ের নিম্নের স্থানটী অল্প কাটিয়া দিতে হইবে। এক সপ্তাহ পরে পুনরায় একটু কাটিতে হইবে। তাহার পর আর এক সপ্তাহ পরে ডালটী একেবারে কাটিয়া দিতে হইবে। তখনও গাম্‌লাটীকে সে স্থান হইতে সরান উচিত নহে। কারণ এক স্থানে থাকিলে গাছে কোন ঝোঁক লাগে না। কিছু দিন পরে মূল গাছের ডাল জোড়ের উপর ৩ ইঞ্চ রাখিয়া কাটিয়া দিতে হইবে। এই সকল প্রক্রিয়ার পর যখন গাছ বেশ সতেজ দেখা যাইবে, তখন অন্যত্র লইয়া যথেচ্ছ স্থানে রোপণ করা যাইতে পারে।

জোড় কলম বাঁধিতে হইলে গাম্‌লায় মাটীর নিকট ঘেঁসিয়া জোড় বাঁধাই ভাল। তাহা হইলে মূল গাছের ডাল বাহির হইতে পারে না, কলমের ডালই শীঘ্র সতেজ হয়। জোড় কলম বাঁধিবার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন মূল গাছের ডাল বাহির হইতে না পায়, বাহির হইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। মূল গাছের ডাল পালা বাহির হইতে দিলে কলমের ডালটী মরিয়া যাইবে।

৩। গাছের ডাল নোয়াইয়া মাটী চাপা দিলে ২ মাস বা ২॥ মাস পরে সেই স্থানে শীকড় বাহির হয়। তখন অল্পে অল্পে উপরি-উক্ত প্রকারে গাছের দিকের ডালটি কাটিয়া দিতে হইবে। এই প্রকারে কলম করাকে ইংরাজিতে layering বলে। এই প্রকার কলম গাম্‌লাতেও করা যাইতে পারে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় করিতে হইলে, সর্ব্বদা জল দেওয়ার আবশ্যক হয়। জল দিবার জন্য একটী উপায় করা যাইতে পারে—যথা একটী গামলায় অর্দ্ধেক অংশ মাটী দিয়া ভরিয়া তাহা layering-এর উপর রাখিয়া দিতে হইবে এবং বাকী অংশ জল দিয়া ভরিয়া দিতে হইবে। এইরূপে জল দিলে সর্ব্বদাই কলমের স্থানটী ভিজিয়া থাকে এবং তাহাতে শীঘ্র শীকড় বাহির হয়। ডালের যে স্থানটী মাটী চাপা দিয়া কলম করা হইবে, সে স্থানটী কলম করিবার পূর্ব্বে ছুরি দিয়া একটু চাঁচিয়া দিলে, শীঘ্র সেই স্থানে শীকড় বাহির হয়।

৪। চোক কলম—(Budding)—একটী গোলাপ গাছের পুরাতন ও মোটা ডালের গোড়ার দিক হইতে ধারাল ছুরি দ্বারা একটী সতেজ চোক খানিকটা কাষ্ঠ-সহ কাটিয়া লইতে হইবে। তৎপরে সেই কাষ্ঠের অংশটুকু ছুরির ফলা দিয়া তুলিয়া ফেলিয়া অপর একটী গোলাপ গাছের ডালে সেই চোকের পরিমাণ ছাল উঠাইয়া লইয়া সেই স্থানে চোকটী বসাইয়া সূতা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। চোকটী বসাইবার পূর্ব্বে মুখের ভিতর রাখিয়া দিলে রৌদ্রে ও বাতাসে উহা নষ্ট হয় না। যে স্থানে চোকটী বসাইতে হইবে, সেখানেও অল্প থুতু মাখাইয়া দিতে হইবে। চোকটী বসান

হইলে ধারগুলি মোম দিয়া মুড়িয়া দিলে ভাল হয়, কিন্তু যেন চোকের অংশটী ঢাকা না পড়ে। চোক কলমে একটী গাছে অনেক প্রকারের গোলাপ ফুল ফুটাইতে পারা যায়। চোক কলম শীত এবং বর্ষা এই দুই সময়েই ভাল হয়। ইহার জন্য Gigantia গাছ সুবিধাজনক নহে। ভাল গোলাপের ডালেই চোক কলম বাঁধিতে হয়।

৫। নবেম্বর মাসে গোড়ার মাটী সরাইয়া দিবার সময় গোলাপ গাছের গোড়া হইতে শীকড় সহ ডাল বাহির করিয়া লইলেও তাহা হইতে গাছ করা যাইতে পারে।

৬। গুল কলম—আষাঢ় শ্রাবণ মাসে গোলাপ গাছের গুল কলম করাও অতি সহজ। এক বৎসরের অধিক পুরাতন একটী ডাল লইয়া তাহার একটী চোখের বা গাঁটের নিম্নে দুই ইঞ্চ পরিমাণ স্থানে ডালের ছাল ছুরি দিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। অনন্তর সারযুক্ত মাটীর দুইটী ডেলা পাকাইয়া তাহার দ্বারা সেই চোক বা গাঁট এবং ছাল তোলা অংশের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিতে হইবে। ছালেতে অংশের বাকী অর্দ্ধেকে যেন মাটি না লাগে। পরে নারিকেলের ছোব্‌ড়া দিয়া সেই মাটী ঢাকিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। বর্ষার জল লাগিয়া সেই স্থান হইতে শিকড় বাহির হয়। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে ঐ কলম কাটিয়া গাছ হইতে পৃথক্ করিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করিতে হইবে।

গোলাপ ফুল শুধু যে শোভা সম্পাদন করে, এমন নহে। দেশী গোলাপের পাপড়ীতে সরবত ও গুলকন্দ নামক Syrup প্রস্তুত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে মিছরির সহিত গোলাপের পাপ্‌ড়ী বাটিয়া সরবত করিয়া খাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। দেশী গোলাপের পাপড়ী চিনির সহিত পাক করিলেই গুলকন্দ নামক Syrup প্রস্তুত হয়। এই Syrup আবশ্যক মত জলের সহিত মিশাইয়া সরবত করিয়া খাইলে তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে ও শরীর স্নিগ্ধ করে। দেশী গোলাপের পাপড়ী শুকাইয়া রাখিলে উক্ত কার্য্যে লাগিতে পারে।

দেশী গোলাপকে মান্দ্রাজী গোলাপও বলে। ইহার ফুল প্রায় বার মাসই হয়। তবে বসন্তকালেই ইহার ফুল বেশী হয়।

বসরাই গোলাপে গোলাপজল, আতর প্রভৃতি হইয়া থাকে। গোলাপের পাপড়ী জলে দিয়া সেই জল বক-যন্ত্রে চোয়াইয়া লইলেই গোলাপজল হইল। সেই জলের উপর যে তৈলাক্ত পদার্থ ভাসিয়া থাকে তাহাই গোলাপী আতর। পালক দিয়া তাহা তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আশা করি, পাঠকপাঠিকাগণ গামলায় বা উদ্যানে গোলাপ গাছ পালন করিয়া গৃহে গৃহে এই উৎকৃষ্ট ফুল প্রচুর পরিমাণে পাইবেন এবং যিনি এই অতুলনীয় পুষ্প মানুষের জন্য সৃজন করিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, বি, এল।

প্রলোভন।

সর্ব্বজ্ঞানময় বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলময়ী ইচ্ছানুসারে আমরা জন্মাবধি প্রলোভন ও ও ক্লেশরাশি দ্বারা বেষ্টিত। তিনি আমাদিগকে এরূপ এক জগতে স্থাপন করিয়াছেন, যেখানে অন্যায় কর্ম্মই প্রায়শঃ সুফলপ্রদ, কর্ত্তব্যকর্ম্ম কঠিন ও ক্লেশকর, যে স্থানে বিবেকধ্বনি বহুজন দ্বারা প্রতিবাধিত, যে স্থানে শরীর আত্মার উপর অযথা ভারার্পণ করে, এবং যে লোকে বাহ্য বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়গণের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের ও আমাদিগের মধ্যে এক মহা আবরণ বিস্তার করে। আমরা এরূপ প্রভাব সকলের মধ্যে বাস করিতেছি যে, তাহা সর্ব্বদাই আমাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও দুর্ব্বল চিত্তকে ভীত করিতেছে। এই সমুদায় হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইতে হইলে, ইহাদিগকে জয় করা ভিন্ন অন্য গতি নাই।

১। যতদিন আমরা এই পার্থিব প্রবাসে অবস্থান করি, ততদিন আমরা প্রলোভন ও বিবিধ পরীক্ষার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই না। এই জন্যই কথিত হইয়াছে—মানবের পার্থিব জীবন প্রলোভনময়, "The life of men upon earth is tempetation."* অতএব যাহাতে এই দুরাচার পাপ রিপুর করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, তজ্জন্য প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্ব স্ব প্রলোভন সকলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পাপ কদাচ বিশ্রাম করে না, কিন্তু সর্ব্বদাই কাহাকে আক্রমণ করিবে এই অন্বেষণেই ব্যস্ত। মহাত্মা পিটার (Peter) বলিয়াছেন "Be sober, be vigilant; because your adversary, the devil as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour."* ইহলোকে যিনি যত বড় সাধুই হউন না কেন, এরূপ কেহ নাই যিনি কখনও না কখন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন নাই। ক্ষুদ্র আমরা তবে কিরূপে ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইব?

২। প্রলোভন ও পরীক্ষা সকল অতীব কষ্টদায়ক হইলেও ইহার দ্বারা মানুষের প্রকৃষ্ট উপকার সাধিত হয়। কারণ, প্রলোভনই মানবকে আত্মত্যাগ শিক্ষা দেয় ও নম্র করে, ইহা দ্বারাই মনুষ্য পরিশুদ্ধ হয় এবং ইহাই তাহাকে প্রকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করে।

জগতের সকল সাধু মহাত্মা পাপ প্রলোভন এবং ক্লেশ ও নির্যাতনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং এই সকল দ্বারাই তাঁহাদিগের চির-মঙ্গল লাভ হইয়াছে। যাহারা ইহাদিগকে প্রতিরোধ

* Bible. Book of Job.

1. Peter. 5, Verse 8.

করিতে পারে নাই, তাহারা দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া জগতে অখ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং চিরতরে বিনাশপাথারে নিমগ্ন হইয়াছে।

৩। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইহ জগতে এরূপ ধর্ম্ম নাই, এরূপ স্থান নাই, যথায় প্রলোভন প্রসারিত হয় নাই, বা যথায় ক্লেশের সঞ্চার নাই। অদ্যাবধি এরূপ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যিনি প্রলোভনে পতিত হয়েন নাই। প্রলোভনের বীজ আমাদিগের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, এবং তাহা হইতেই আমাদিগের ইচ্ছায় কুপ্রবৃত্তি জন্ম গ্রহণ করে। যখনই আমরা একটী প্রলোভন হইতে মুক্তিলাভ করি, অমনি অন্ত আর একটী আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এইরূপে, মনুষ্য-জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়াই আমা-দিগকে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

৪। অনেকে প্রলোভন হইতে দূরে অবস্থান করিতে প্রয়াস পাইয়া তদ্দ্বারা অধিকতর আকৃষ্ট হয়েন। পলায়ন দ্বারা প্রলোভন অতিক্রম করা দুরূহ, কিন্তু ধৈর্য্য, মানসিক শান্তি এবং আত্মবলিদান দ্বারাই কেবল আমরা প্রলোভনকে পরাভূত করিতে পারি।

অন্তরস্থিত প্রলোভনকে সমূলে উৎপাটন করিতে প্রয়াস না পাইয়া, যিনি বাহ্যিক ভাবে প্রলোভন হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে যত্ন করেন, তিনি ইহা দ্বারা কোনও উপকার প্রাপ্ত হয়েন না। কারণ প্রলোভন পর মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে আকর্ষণ করে, এবং তিনি তখন নিজেকে অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত মনে করেন।

অল্পে অল্পে, দীর্ঘ ক্লেশ সহ্য করিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবৎকৃপায়, সহজেই প্রলোভনকে অতিক্রম করা যায়, কিন্তু কেবল কঠোরতা বা আত্মচেষ্টা অবলম্বনে ইহা সুদূরপরাহত। প্রলোভনকালে সাধু-জনের উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রলুব্ধ ব্যক্তির প্রতি কদাচ কর্কশ ব্যবহার করা উচিত নহে। তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ ঐরূপ অবস্থায় আমরাও ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা করি।

মানসিক অস্থিরতা (চাঞ্চল্য) এবং ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস প্রলোভনের বীজ। ক্ষেপণীবিহীন তরী যদ্রূপ বীচিবিক্ষোভিত সাগরগর্ভে তরঙ্গাঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ অসাবধান, অস্থিরপ্রতিজ্ঞ নর প্রলোভনোর্ম্মিদ্বারা জীবনসমুদ্রে আলোড়িত হয়।

৫। অগ্নি যদ্রূপ লৌহকে পরীক্ষা করে, প্রলোভনও তদ্রূপ সাধুর সাধুত্ব পরীক্ষা করে। অনেক সময় আমরা আমাদিগের ক্ষমতা বুঝিতে পারি না, কিন্তু প্রলোভন আমাদিগকে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দেয়, দেখাইয়া দেয়।

তথাপি প্রলোভনের প্রতি আমাদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। বিশেষতঃ প্রলোভনের প্রথমাবস্থায় বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া উচিত। দুর্দ্দম রিপুকে যদি

হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়, এবং হৃদয়-দুয়ারে আঘাত করিবার পূর্ব্বেই বাধা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তখনই ইহা সুপরাজেয়। এই জন্যই একজন বলিয়াছিলেন—প্রারম্ভে বাধা দাও, বিলম্বে বৈদ্যের আবশ্যক "Beginnings check, too late is physic sought."* ।

কারণ আমরা দেখি যে, সর্ব্বাগ্রে একটী অশরীর, অস্পষ্ট, কুভাব আমাদিগের মনোমধ্যে উদিত হয়, তাহার পর তৎপ্রতি আমাদিগের গভীর চিন্তা জন্ম লাভ করে। সেই চিন্তাই মোহ উৎপাদন করিয়া তাহাতে (অপ্রকৃত) আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, এবং তাহাতেই কুকার্য্যে চেষ্টা হয় এবং অবশেষে আমরা তাহাতে সম্মতি প্রদান করি। যদ্রূপ অশ্ববল্গা শ্লথ করিয়া দিলে, অশিষ্ট অশ্ব তাহার আরোহীকে দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে কুপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ দুর্দ্দমনীয় রিপুকুল সংযমন না করিলে মানবাত্মাকে ইহা কুপথে পরিচালিত করে। মনুষ্য প্রলোভনকে বাধা দিতে যতই বিলম্ব করে, দিন দিন সে ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অবশেষে রিপুর দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

৬। পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই যে, কেহ কেহ ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই ভীষণ প্রলোভনে পতিত হয়, কেহ বা জীবনের অন্তিম কালে। কেহ বা সমগ্র জীবন হিংস্র রিপুর সহিত সংগ্রাম করেন, কেহ বা স্বীয় জ্ঞানানুসারে এবং ভগবন্নিয়োগের সাম্যানুসারে অল্পতেই প্রলুব্ধ হন। ভগবন্নিয়োগ মানবের অবস্থা, শক্তি ও গুণ বিবেচনা করিয়া জগতের কল্যাণের নিমিত্ত সমুদায় শাসন করে।

অতএব প্রলোভনে পতিত হইলেও আমাদিগের নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই, কিন্তু অধিকতর ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য—যাহাতে তিনি আমাদিগকে পরীক্ষা সকলের মধ্যে সাহায্য করেন। কারণ তিনি অবশ্যই আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। মহামতি St. Paul বলিয়া গিয়াছেন "He will give with temptation such issue, that we may be able to bear it." ভগবান্ প্রলোভনের সহিত এরূপ সামগ্রী প্রদান করিবেন, যদ্দ্বারা আমরা অনায়াসে তাহা সহ্য করিতে পারিব।

অতএব প্রত্যেক প্রলোভনে আমরা আমাদিগের আত্মা ভগবদ্হস্তে ন্যস্ত করি, কারণ তিনি বিনীত আত্মার উন্নতি সাধন করেন। পরীক্ষা ও প্রলোভন দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় এবং পুণ্যের পুরস্কার দর্শন করিয়া সেই মনুষ্যত্বের বিকাশ দৃঢ়ভাবে প্রতীত হয়। যে মানব দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না অথচ গভীর বিশ্বাসী, তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় নাই।

* Ovid.

কিন্তু অপ্রতিকূল অবস্থাতে যদি তিনি ধৈর্য্যগুণে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন, তবেই তাঁহার আত্মার উত্তরোত্তর উন্নতির সম্ভাবনা।

অনেকে এরূপ আছেন, যে তাঁহারা দুর্দ্দম প্রলোভন সকল অতিক্রম করেন, কিন্তু সামান্য প্রলোভনের নিকট পরাস্ত হন। অবশেষে, তাঁহারা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া গুরু কার্য্যের ভার আর গ্রহণ করিতে সক্ষম হন না।

যামিনীর আত্মকথা।

অনেক সময়ে দুঃখই মানুষের উন্নতির সোপান হয়। অভাব না হইলে ত চেষ্টা জাগে না। তাই আজ আমার পিতা অভিমানভরে, এই সামান্য অপমানের তাড়নায়, জ্যেষ্ঠের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য এত ব্যগ্র হইলেন।

হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে ভাল চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার মধ্যে এমন কোন গুণ ছিল যাহা দেখিয়া শিক্ষক মহাশয় ভবিষ্যতের আলো তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইতেন।

হেড মাষ্টার মহাশয়ের সহানুভূতিসূচক স্বরে পিতার অন্তঃকরণ আরও দ্রব হইয়া গেল, কথা কহিবার পূর্ব্বে তাঁহার নয়ন অশ্রুতে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু সহসা নিজেকে সংযত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "মহাশয় আমার আর পড়িবার ইচ্ছা নাই, আমার একটি চাকরীর বন্দোবস্ত করিয়া দিন"। পিতা অতি নম্রভাবে এই কথাগুলি কহিলেন। ছাত্রের এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া শিক্ষক মহাশয় অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "সে কি, তুমি কি এখনি চাকরীর উপযুক্ত হইয়াছ? তুমি ত বালক হে, লেখা পড়াও কিছু তেমন হয় নাই, তোমাকে কে চাকরী দিবে"? এইরূপ নৈরাশ্যজনক বাক্যের উত্তরে পিতা কহিলেন—

"আমার অদৃষ্ট"।

এই কথার পর যখন তিনি উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মাষ্টার মহাশয় তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন "আচ্ছা সন্ধ্যার সময় আমার বাঙ্গালাতে এস"।

বিমর্ষ মনে পিতা বাড়ী আসিয়া মাতার প্রদত্ত আহার যথারীতি খাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাবান্তর সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পিতামহী অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "কেন রে আজ তোর কি হয়েছে, মাষ্টার কি বকেছেন না মেরেছেন, অমন হয়ে আছিস্ যে? পিতা এই সম্ভাষণের উত্তরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস

ফেলিয়া স্পষ্ট করিয়া অতি দৃঢ় স্বরে কহিলেন "আমি আর পড়িব না, স্কুলে যাইব না।" পিতার এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-সূচক বাক্য শুনিয়া পিতামহী দারুণ ক্রোধে তৎক্ষণাৎ কহিলেন "পড়্‌বি না, তবে যা দূর হ, আমার বাড়ীতে তোর স্থান নাই, আমি আর তোকে খেতে দিব না"।

এই নিষ্ঠুর বাক্য পিতার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি উঠিয়া সোজা গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

দিবসের শেষে সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়ায় উপবেশন করিলেন। সন্ধ্যাদেবী জগতে উপনীত হইলেন। দিনমান অবসান হইল, মানুষের দিবসের কার্য্যও স্থগিদ হইল, বিশ্রামের সময় আসিল।

আকাশে চন্দ্র তারকা উদিত হইয়া অবনীমণ্ডলের উপরিস্থিত গিরি, নদ, নদী ও বন, উপবনে রজত কিরণমালা দোলাইয়া জ্যোৎস্নাচ্ছটা প্রকাশ করিল। ঘরে ঘরে দীপাবলি জ্বলিল ও ধূপধুনার গন্ধে গৃহ আমোদিত হইল। দেবমন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি ও আরত্রিক বাদ্য বাদিত হইল এবং কর্পূরাসব ঘৃত প্রদীপে দেবতার চরণে আলোক উপহার প্রদত্ত হইল।

ঘরে বাহিরে বাজারে দোকানে সর্ব্বত্রই অন্ধকার বিদূরীত করিবার নিমিত্ত ধনী দরিদ্র সকলে যথাসাধ্য আলোক সাজাইয়া দিল।

মাষ্টার, মহাশয়ের সুপ্রশস্ত বাঙ্গালা-খানি ল্যাম্পের আলোকে সজ্জিত হইল।

মাষ্টার মহাশয় পূর্ব্বের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার আফিসঘরে ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বারবান্ আসিয়া সম্বাদদিল "জনৈক ছাত্র আসিয়া আপনাকে সেলাম জানাইতেছে।"

দ্বারবান্ ছাত্রকে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইলে বাহিরে আসিয়া পিতাকে সঙ্গে লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় হইল।

তথায় অতি স্নেহ ও যত্নের সহিত পিতা আসন পাইলেন। এ স্কুল নহে, এখানে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ স্বতন্ত্র, এখানে শিষ্য শিক্ষার জন্য আইসে নাই। এখানে যেন পিতা পুত্রের মত আলাপ। হেডমাষ্টার মহাশয় অতিশয় মমতাসূচক নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়া পিতাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণে যে অদম্য বিরাগ জন্মিয়াছে, তাহা কিছুতেই নিবারিত হইল না। কেবল জ্যেষ্ঠের সেই কঠোর উক্তিটি যেন কাঁটার মত তাঁহার প্রাণে বিদ্ধ হইতেছিল। অবশেষে তিনি ক্ষোভে ও রোষে কাঁদিতে লাগিলেন।

ছাত্রের চক্ষুতে অশ্রুধারা দেখিয়া শিক্ষকের হৃদয়ে আরও দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি একজন আত্মীয় বন্ধুকে একখানি অনুরোধ-পত্র লিখিয়া পিতার হস্তে দিলেন।

সেই রাত্রিতে সুপারিশ-পত্র ইয়া পিতা বাড়ীতে ফিরিলেন। অপত্যবৎসলা জননী পুত্রকে তিরস্কার করিয়া, শেষে নিজেই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন ও যতক্ষণ ছেলে

বাড়ীতে ফিরিয়া আইসে নাই, কেবল ঘর বাহির করিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন ছেলে ঘরে ফিরিয়াছে, তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্রকে কোলের কাছে বসাইয়া অনেক কথা কহিলেন, কিন্তু কিছুতেই ছেলের মন ফিরিল না।

যাহা হউক, সে রাত্রিতে আর কোন ঘটনা ঘটিল না। পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পিতা আবার একবারে হেডমাষ্টার মহাশয়ের বাঙ্গালায় উপস্থিত। হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে কহিলেন "তুমি কি করিয়া যাইবে?" তখন এদেশের সর্ব্ব স্থানে রেলপথ হয় নাই।

পিতা উত্তর করিলেন 'পদব্রজে"।

সে উত্তর হেডমাষ্টারের মনোমত হইল না। তিনি দশটি টাকা পিতার হাতে দিয়া বলিলেন এই লইয়া যাও, গরুর গাড়ীতে যাইলে ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা কম পয়সা লাগিবে।

পিতা সেইখান হইতে জনক জননীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া একবস্ত্রে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভীষণ বন্যা—এ বৎসর বন্যায় প্রায় অর্দ্ধেক বঙ্গদেশ জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান ও তাহার চারিপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ এবং তারকেশ্বর, হরিপাল, কাঁথি, বাঁকীপুর প্রভৃতি স্থান বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। কত শত প্রাণ যে বিনষ্ট হইয়াছে, কত মানুষ যে গৃহহীন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শুনা যায় ১২৩০ সালে একবার দামোদর নদে এইরূপ ভীষণ বন্যা হইয়াছিল, তাহাতে মগরা পর্য্যন্ত জল আসিয়াছিল, কিন্তু এবার এসান্‌সোল্ পর্য্যন্ত জল গিয়াছে। প্রায় নব্বই বৎসরের মধ্যে এরূপ বন্যা দেখা যায় নাই। দামোদর নদের দুই পার্শ্বে গবর্মেণ্টের সুদৃঢ় বাঁধ আছে, প্রবল বন্যায় সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। বন্যা-প্রপীড়িত দেশের দুর্দ্দশা দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। পরদুঃখকাতর দয়াবান্ মহোদয়গণ অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের প্রভূত সাহায্য করিয়া তাহাদের অনেক উপকার সাধন করিতেছেন। ভগবান্ এই সহৃদয় মহাত্মাদিগের কল্যাণ বিধান করুন।

পারস্যে গোলযোগ—পারস্যে এখনও অশান্তির বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। সম্প্রতি, শুনা যাইতেছে, পারস্যের রাজ-

ধানী তিহারান নগরে বক্তিয়ারদিগের সহিত সামরিক পুলিসের দাঙ্গা হইয়া ৩০।৪০ জন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

দিল্লীতে আয়ুর্ব্বেদিক কলেজ—দিল্লীতে একটি আয়ুর্ব্বেদিক মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইবার কথা হইতেছে। সিন্ধিয়ার মহারাজা প্রস্তাবিত আয়ুর্ব্বেদিক কলেজের জন্য এককালীন ২০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। এরূপ দান অতীব প্রশংসার্হ ও অনুকরণীয়।

ঢাকায় যাদুঘর—বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ও লেডী কারমাইকেল ঢাকা যাদুঘরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। রাজা সীতানাথ রায় যাদুঘরের সংশ্রবে একটী পুস্তকাগার খুলিবার জন্য ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা—গত ১লা আগষ্ট মাষ্টবর ডিউক সাহেব বেনাভোলেণ্ট সোসাইটি সভাগৃহে পরলোকগত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের একখানি অতি সুন্দর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বেনাভোলেণ্ট সোসাইটি রাজা বাহাদুরের এই প্রতিকৃতি সংস্থাপন করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন।

রেঙ্গলার পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলা—কুমারী লোনা মেরী সোয়েন এ বৎসর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেঙ্গলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। মহিলাদিগের এরূপ উন্নতি বিশেষ আনন্দের বিষয়।

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

একেলাসেঁড়েতা শিশুদিগের আর একটী সাধারণ দোষ। শিশুদিগকে সর্ব্বদা অন্যান্য ছেলেদের সহিত খেলিতে দিলে ও মাতার অপরিসীম প্রেম দ্বারা তাহাকে ভাল বাসিতে শিখাইলে শিশু আপনা আপনি সঙ্গিপ্রিয় হইবে ও ছোট ভাই বোনদিগকে স্নেহ করিতে শিখিবে। অপরিচিত লোকদিগের সম্মুখে বা পাঁচ জনের কাছে শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে, তাহাদিগকে একটী স্বতন্ত্র ঘর বা বাড়ীর এক অংশ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। সেখানে তাহারা যেন অবাধে যত ইচ্ছা লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, খেলা ও আমোদ করিতে পায়। তাহা হইলে অন্য সময়ে ও মাতার কাছে আনিলে তাহারা সহজেই শান্ত ও স্থির থাকিবে। শিশুদিগকে দিন রাত মাতার চক্ষুর সম্মুখে রাখা উচিত নয়, তাহা হইলে তাহারা মা বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া সর্ব্বদা যদৃচ্ছাক্রমে লাফালাফি করিতে পারে না। আর

শিশু যদি দৈবক্রমে কোন জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি না দিয়া ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্ক হইতে শিখান কর্ত্তব্য। ইহাতে বাল্যকাল হইতেই শিশুদের সাবধান ও ধীর হইবার অভ্যাস হইবে। আর যে গৃহস্থ পরিবারে শিশুদিগকে খেলার জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর দিবার সুবিধা নাই, তাঁহারা তাহাদিগকে সকালে বিকালে উঠানে বা ঘেরা ছাদের উপর ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু বাড়ীর নিকট কোনও শিশুবিদ্যালয় থাকিলে তাহাদিগকে তথায় পাঠাইতে অগ্রাহ্য করিবেন না। কারণ শিশুবিদ্যালয়ে তাহারা অনেক বাল্যসঙ্গী ও খেলিবার স্থান পাইয়া দ্বিগুণ আনন্দিত হইবে। শিশুদিগের সকল দুষ্টামি থামাইবার প্রধান ঔষধ তাহাদিগকে অবাধে খেলিতে দেওয়া। উহার অভাব হইলেই তাহারা অতিরিক্ত দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে, জিনিষ ভাঙ্গে ও মারামারি করে। সেই নিমিত্ত শিশুর কার্য্যকরী শক্তিকে কোন না কোন কাজে বা ক্রীড়ায় সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখা উচিত। মাটীর ঘর প্রস্তুত করা, কাণামাছি বা লুকাচুরি খেলা, দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি প্রভৃতি যে কোন নিয়োগে তাহাদিগকে ব্যস্ত রাখিবেন। তাহা হইলে শিশু আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তাহাতে মনোনিবেশ করিবে। ক্রীড়া শিশুশক্তিবিকাশের স্বাভাবিক পথস্বরূপ। ঐ স্বভাবে যে কত সৃজননৈপুণ্য ও নির্ম্মাণচাতুর্য্য লুকান থাকে, তাহা বলা যায় না। সেইজন্য অবাধে ক্রীড়া হইতেই তাহাদের ঐ দুই বৃত্তি পুষ্টি ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা যদি মনোযোগ দিয়া দিন কতক শিশুদিগের ক্রীড়া আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে উহাতে তাহাদের বুদ্ধি ও চাতুর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। কোমল শিশুর ঐরূপ অযত্নের খেলাতে আমরা ভবিষ্যৎ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় পাই।

আনন্দভূমির মধ্যেই ক্রীড়ারত শিশু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু উহা কেবল আমোদের সঙ্গে মিশ্রিত হইবার আবশ্যক নাই। যে খেলায় যত শরীর সঞ্চালনের প্রয়োজন, তাহা শিশুদিগকে তত প্রফুল্ল রাখিবে। আমোদ অর্থে চোক, কাণ বা স্বাদের দ্বারা অনুভূত যত আনন্দ তাহা বুঝায়। ক্রীড়ার সামগ্রী দর্শনে শিশু প্রথম আমোদ পায়, উহার ব্যবহারের দ্বারা সে প্রফুল্ল হয়। কেবল আমোদ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় শিশুর পক্ষেও অত্যন্ত অপকারী। সর্ব্ব শরীরের চালনা হইলেই শিশু প্রফুল্ল ও সুখী হয়। শিশুদিগের সাধারণ ক্রীড়া, বড় লোকদের মত অন্য ভাবে কার্য্যশক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অচেতন দ্রব্য লইয়াই শিশুদিগের খেলা করা উচিত, ইহা যেন কোন মা ভুলিয়া না যান, কেননা তাহারা চেতন অচেতন পদার্থের বিভিন্নতা জানে না। খোকা যেমন তাহার মার কাছে একটী ক্ষুদ্র মানুষ, পুতুল সেইরূপ

শিশুর কাছে তাহার জীবন্ত সন্তানের মত। শিশুদের কাছে প্রত্যেক বিষয় সত্তাপূর্ণ। পশুরা কেবল শরীর নাড়িয়া খেলা করে, কিন্তু শিশুদের মন শরীরের সঙ্গে চলে। তাহারা চারি দিকে জীবন্ত লোক ও পশু পাখীই দেখে, সেই জন্য মৃত বা নির্জীব দ্রব্যের অর্থ বুঝিতে অপারক। তাহারা চারি দিকের সকল দ্রব্যকেই জীবন্ত ভাবিয়া উহার সঙ্গে সেই ভাবে খেলা করে। সেই নিমিত্ত অচেতন দ্রব্য দিয়া সর্ব্বদা তাহাদিগকে খেলায় নিযুক্ত রাখিবে।

(ক্রমশঃ)

জন্ম মৃত্যু তত্ত্ব

ভৌতিক জগৎ।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থ লইয়া এই অনন্ত ভৌতিক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই বিশাল ভৌতিক রাজ্য কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের কোটী কোটী স্থানে কোটী কোটী ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে, ধরণীর অধঃ ঊর্দ্ধ ও মধ্যে ইহার অন্ত নাই। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে এই জগতের পরিধি সীমাশূন্য, আমরা অবিরত যে যে বস্তু এই স্থূল চক্ষুতে অনুভব করি, সেই সকল দৃশ্যমান সৃষ্ট পদার্থ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল রূপে পরিণত হইতেছে ও কালের অনন্ত স্রোতের সহিত নিত্য নিয়মিত পরিবর্ত্তিত রূপান্তরে গৃহীত ও নানা ভাবে নীত হইতেছে। এই অনন্ত ভৌতিক জগতের দৃশ্য অনন্ত, গতি অনন্ত, রূপ ও ভাবান্তর অনন্ত, ক্রিয়া অনন্ত, সামান্য মানববুদ্ধি উহার নিকট পরাস্ত হয়। এই জন্যই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসশীল, পরিবর্ত্তনশীল ও প্রলয় প্রভাবে পরিব্যাপ্ত।

সনাতন ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি, সৃষ্ট বস্তু সকল মনের দ্বারা আয়ত্ত ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়, জ্ঞান উহার সংযোগে কার্য্য করিয়া সৃষ্টির অধীনে সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা সকল বিশ্বজ্ঞানের পরিচালক। কাল এই সৃষ্ট মার্গকে বিবিধভাবে ও বিবিধরূপে আপনার অধীন বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা যোগে বিভাগ করিতেছে, কিন্তু কুম্ভকারের চক্রের মধ্য দণ্ডের ন্যায় অনিবার নিজ শক্তিকে নিশ্চল রাখিয়াছে।

আমরা চন্দ্র সূর্য্যের গতি দ্বারা কালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ স্থির করিয়া আপনারা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ও পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইতেছি, মহান্ ঘূর্ণায়মান কালচক্র ভীষণ প্রভাবে এই অনন্ত ভৌতিক বিশ্ব লইয়া ঘূর্ণিত হইতেছে, ভূত সকল তদীয় বিশাল শক্তির সংঘর্ষণে নিত্য পেষিত, নিত্য নূতন সৃষ্টির অধীন হইতেছে।

এই ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর জঙ্গম জীবের

দেহ * মাত্রেই ভৌতিক পরমাণুর অধীন, বিশাল কালস্রোতে প্রবাহিত, পেষিত ও নিত্য রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। এই রূপান্তরের নামই মৃত্যু বা বিলয়। অনন্ত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি হইতে নিত্য নিত্য নব নব শক্তির উৎপত্তি ও পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণ হইতেছে। প্রবল প্রবলকে, দুর্ব্বল দুর্ব্বলকে, যে যেমন শক্তি ও গুণের অধীন তাহাকে সেই সেই প্রভাবে পরিচালিত ও আবদ্ধিত হইতে হইতেছে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে ও বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রে নাই ও নিত্য পরিচালিত হইতেছে। ভূত জগতে নিত্য ত্যাগ বিয়োগ বা প্রভেদ ও সংযোগ শক্তির অধীনে কার্য্য চলিতেছে। এই সকল শক্তিতে অনন্ত কর্ম্ম-শক্তি জীবশক্তি লইয়া উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু সকল জীবের প্রাধান্য অতি সামান্য। ঐ সকল জীব যোনি ও যন্ত্রণার অধীন, জরা মৃত্যুর অধীন, রোগ শোক দুঃখের অধীন। উহারা পরমশক্তিকে আশ্রয় করিতে অক্ষম বলিয়াই ঐ সকল দুঃখের অধীন, নতুবা জীবজগৎ ভৌতিক জগতকে নিজ সামর্থ্য দ্বারা পরিচালিত ও পরি-বর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয়। জীবের অসীম ক্ষমতা ভূতকে পরাস্ত করিতে পারে কিন্তু ভূতের অধীন জীবের তুচ্ছ প্রাণে তাহার সংঘর্ষণ হয় না বা তাহা আয়ত্ত করিতে জীবের অপর মহৎ কর্ম্মবল আবশ্যক। মনের বল হইতে কর্ম্ম হয় ও কর্ম্মের অধীন সৃষ্টি। কিন্তু সৃষ্ট বস্তু আবার সেই মনকে নষ্ট করিতে প্রয়াস পায়। এ কারণ জীবকে কোন প্রকার কর্ম্মাতীত শক্তি সঞ্চয়ের মার্গ অনুসরণ করিতে হয়। মনের ঊর্দ্ধ ও অধঃ দুইটী বিভাগ আছে, কিন্তু অধোবিভাগে স্থূলে আসিয়া কার্য্য ভৌতিক শক্তির অধীন হইলেন। আর ঊর্দ্ধে গিয়া সূক্ষ্মে অর্থাৎ ক্রমশঃ পরমাত্মায় যুক্ত হইলেই তিনি তদন্তর্গত অপরাসীম অচিন্তনীয় জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণাহীন শক্তির অধীন হইলেন। এই ঊর্দ্ধ-শক্তি-সমন্বিত মনের অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি ভৌতিক জগতের রাজা এবং প্রলয়কালে অজেয়, অমর বা অচল ভাবে থাকেন। চিরচাঞ্চল্যময় ভৌতিক জগতের সৃষ্টি বা সঞ্চয়ের বিরাম নাই। কোন ভূতের সংযোগে কি হইতেছে, কি যাইতেছে, উহাতে চিন্তার আবশ্যক নাই। উহা সাধারণ চক্ষুতে মানব-জ্ঞানে অনুভূতও হইবার যোগ্য নহে। ভূতের পরিবর্ত্তন ও আবাহন নিত্য বিকারযুক্ত, নিত্য পুরাতন ও নূতনের অধীন, কিন্তু রূপান্তর ব্যতীত উহার ধ্বংস হয় না, উহা নিজ নিজ জন্মস্থানকে আশ্রয় করে মাত্র, মুহুর্মুহু আশ্রিতভাবাপন্ন হইয়া আত্মাবস্থাকে চঞ্চল বিকারে যুক্ত করে। জীব সকল বিষয় সংশ্রবে বা ইন্দ্রিয় কর্ম্মাধীন হইয়া উহার স্থূল সূক্ষ্মের অধীন হয়।

বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি ও বীজ দ্বারা বীজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বীজ যে গুণাক্রান্ত হয়, রূপ ও প্রভাবকে তদধীন করিয়া লইয়া থাকে। সময় তাহাকে

অন্যান্য শক্তির সাহায্যে পোষণ করে, এবং বিকারে যুক্ত হইলে পুনর্ব্বার ধ্বংস করায়। জীব সকল স্ব স্ব গুণ বা কর্ম্ম প্রভাবে সূক্ষ্মাকাশ হইতে বীজাণু সকলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দৃশ্যমান বস্তু মাত্রেই জীবের আবাস ও কর্ম্মভূমি। জীব পঞ্চভূতেই পঞ্চ অবস্থা লইয়া বিচরণ করিতেছে, আবার তাহা হইতে পুনঃ দৃশ্যমান জড় দেহ লাভ করিতেছে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডলে জীব সকল নিত্য অবস্থিতি করিতেছে, আমরা তাহা নিঃশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতেছি, আমরা বায়ু ও জলস্থিত জীব সকল দ্বারা দেহস্থ জীবকে পোষণ করিতেছি, ও বীর্য্য অনুযোগে অন্য জীবের উৎপাদন করিতেছি। আমাদিগের সর্ব্ববিষয়াত্মক মন উহার পরিচালন করিয়া নিজ নিজ দৈবিক গুণ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া কর্ম্মানুযায়ী সৃষ্টির সাহায্য করিতেছে, ও ভৌতিক জগতকে পরিপুষ্ট করিতেছে। জীব যেমন জীবের উৎপাদন করে, সেইরূপ ভৌতিক দেহকে নষ্ট করিয়া থাকে। আমরা সময়ের অধীন জীবাণু সকলকে নিজ ইচ্ছামত পরিপাক করিতে পারি না। বাহ্যিক ও মানসিক জীব পরিপাকের ত্রুটি হইলেই আমরা বিকৃত ও বিনাশ প্রাপ্ত হই।

আমরা কুলপরম্পরাগত দেহ ও মনের মধ্যে জীবশক্তিকে পোষণ করিয়া থাকি। আমাদিগের বিশুদ্ধ জুগপ্রবাহ আভ্যন্তরিক জীবপ্রবাহকে সতেজ করে, একারণ সূক্ষ্ম পিতৃলোক আমাদিগেরই অধীন এবং আমরাই তাহাদিগের প্রীতি বা বর্দ্ধনের জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমরাই আমাদিগের শ্রাদ্ধ করি।

আমাদিগের আভ্যন্তরিক ভৌতিক প্রভাব অতি অসামান্য, উহা দ্বারা ক্রমশঃ আমরা পরমাত্মবল লাভে সমর্থ হই। উক্ত বল প্রাপ্ত হইলে ভৌতিক জগতে আমাদিগের একাধিপত্য হয়।

(ক্রমশঃ)

অবলা

ডলহৌসী পর্ব্বতের প্রান্তস্থিত কোন এক হোটেলের প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া মিস্ ঘোষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছিলেন। কয়েক দিন উপর্য্যুপরি বৃষ্টির পর আজ আকাশ কতকটা পরিষ্কার হইয়াছে। মেঘাবৃত আকাশের অভ্যন্তর হইতে অস্পষ্ট রবিকর ক্ষীণ রশ্মি বিতরণ করিতেছিল। অদূরে তুষার-শুভ্র পর্ব্বত-শিখরমালা রবিকিরণে রঞ্জিত হইয়া বিবিধ বর্ণ বিকীর্ণ করিতেছিল। নিম্নে, সানুদেশে সুদীর্ঘ সদ্যস্নাত বিটপিশ্রেণী সুবর্ণবর্ণের কিরণমালায় রঞ্জিত হইয়া

উল্লাসে গ্রীবা আন্দোলন করিতেছে। বালা মুগ্ধ হইয়া বলিল, কি সুন্দর! ভাষায় এ সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করা যায় না।"

তাঁহার পার্শ্বস্থিত পুরুষটী সম্মতি-সূচক গ্রীবা আন্দোলন করিলেন। পুরুষটী কিন্তু বাহিরের সৌন্দর্য্য বড় দেখিতেছিলেন না, অনিমেষ নয়নে যুবতীর সেই অর্দ্ধস্ফুট রূপ-রাশি অবলোকন করিতেছিলেন। রমণীর সুকোমল রঞ্জিত গণ্ডস্থল, সুনীল বিস্ফারিত আঁখিতারা রবিকরচুম্বনে তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পুরুষটী একান্ত চিত্তে সেই সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতেছিলেন।

"ঐ যে পাহাড়টী দেখা যা'চ্ছে—ঐ যে যাহার চূড়া পশ্চিমে হেলিয়া আছে—ও পাহাড়টার নাম কি?"

"পাহাড়টার নাম "ইলিসিয়াম্ হিল্"। আর ঐ চূড়াকে ডেন্‌জ্যারস্ (Dangerous) পয়েন্ট বলে।"

"বটে! আজ আমি ও লতিকা ঐ পাহাড়ের উপর উঠিব মনে করিতেছি। কি সুন্দর!"

পর্ব্বতের উপর উঠিবেন, না পর্ব্বতের চূড়ার উপর?" তাচ্ছিল্য-ভাবে রমণী বলিলেন, "পাহাড়টা ত এখান থেকে কাছেই—আমরা চূড়ার উপরই উঠিব।"

"মাপ করিবেন, আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে, আপনাকে এক দিন ঐ চূড়ার উপর লইয়া যাই। কিন্তু ডেন্‌জ্যারস্ পয়েন্টে উঠা বড়ই কষ্টকর। এ পর্য্যন্ত কোন রমণী সেখানে উঠেন নাই ও উঠিতে পারেন নাই।"

গর্ব্বে অবলা ফুলিয়া উঠিলেন। ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "আপনি আমাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন? আপনার দয়া বলিতে হইবে! কিন্তু আপনাকে ধন্যবাদ, আমাদের পা আছে। আমরা আপনারাই উঠিতে পারিব।"

মিস্ ঘোষের পিতামাতা কন্যার নাম "অবলা" রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, কালে বালিকা তাঁহাদের দত্ত নাম একেবারে ব্যর্থ করিবে। রমণীগণ যে অবলা দুর্ব্বলা নহেন, তাঁহাদেরও যে বল শক্তি আছে, তাঁহারা পুরুষের অপেক্ষা যে কোন অংশেই হীন নহেন—ইহাই সপ্রমাণ করিতে রমণী তাঁহার সমগ্র জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনে পাঠকপাঠিকাগণ ইহার কতকটা আভাস পাইয়া থাকিবেন।

রমণীর ব্যঙ্গ শুনিয়া পুরুষটী মৃদু হাস্য করিলেন। কহিলেন, "কিন্তু আমার ভয় হয়—"

বেচারা বাক্য সমাপ্ত করিতে পারিল না। উত্তেজিত হইয়া অবলা বলিলেন, "আপনি কি মনে করেন, আমরা উঠিতে পারিব না? যদি পুরুষেরা সেখানে উঠিতে পারে, তবে আমরাই বা পারিব না কেন? আপনি কি মেয়েদের এতই তুচ্ছ হেয় মনে করেন? আজ আপনাকে দেখাইব যে মেয়েরা পুরুষদের সমকক্ষ।"

পুরুষটী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, তা নয়। পাহাড়ে উঠা আপনাদের অভ্যাস না থাকিতে পারে। অভ্যাস না

থাকিলে বৃহৎ দুরারোহ পর্ব্বতে উঠা অসম্ভব।"

"দেখিবেন অসম্ভবকেও আমরা আজ সম্ভব করিব। আচ্ছা, পাহাড়ে উঠিতে আমাদের দড়ির আবশ্যক হইবে কি না আপনি বলিতে পারেন কি?"

মিষ্টার করের হাসি আসিল। হাসা সম্বরণ করিয়া তিনি অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "দড়ী না লইয়া চূড়ার উপর উঠা কোন মতেই সম্ভব নয়।"

"ধন্যবাদ, আমরা কুলীর নিকট মোটা দড়ী চাহিয়া লইব।" "আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি দড়ী আনিয়া দিই।" এই বলিয়া মিষ্টার কর তাঁহার কক্ষ হইতে এক গাছা মোটা শক্ত দড়ী আনিয়া দিলেন।

"আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ। বৈকালে বোধ হয় আমরা আরও এক জায়গায় বেড়াইতে যাইতে পারিব। আপনি এখানকার সুপরিচিত। আপনি আমাদের আর একটা সুদৃশ্য পর্ব্বত দেখাইয়া দিবেন।" তৎপরে ঈষৎ হাসিয়া রমণী কহিল, "নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার সাহায্য না লইয়াই আজ আমরা ডেনজ্যারস্ পয়েণ্টে উঠিব।"

(২)

ব্রেকফাষ্ট্ ভোজনের পর দুইজন রমণী পর্ব্বতারোহণার্থ চলিয়া গেলেন। মিষ্টার কর চুরুট খাইতে খাইতে সুখন সিংএর সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। সুখন সিং পাঞ্জাবী, হোটেলের ম্যানেজারের পুত্র। মিষ্টার কর এ হোটেলে অনেক দিন আছেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।

সুখন সিং হাসিয়া বলিলেন, "কি কর সাহেব। আপনি যে মেয়েদের সঙ্গে গেলেন না? ব্যাপার কি?" "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করা কি আমার অদৃষ্টে আছে?"

"তবে বসে কি করিবেন চলুন, বেড়াইয়া আসি। আজ এভ্যানডেলে উঠিবেন।"

কর সাহেব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। "চলুন তবে, ডেনজ্যারস্ পয়েণ্টের আর একটা পথ আজ আমরা আবিষ্কার করিয়া আসি।"

"সে পথ বন্ধ। ডেনজ্যারস্ পয়েণ্টে আজ আর এক পার্টি উঠ্‌ছেন।"

বিস্মিত হইয়া সুখন সিং বলিলেন, "বলেন কি? অসম্ভব। আপনি ছাড়া আর কোন বাঙ্গালী যে এ পাহাড়ে উঠিতে পারিবে তাহা আমার ধারণা ছিল না। চলুন তবে, আমরা তাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করি!"

"আমারও তাই ইচ্ছা। কিন্তু তাঁদের ওঠা দেখ্‌তে সাহস হয় না। তাঁরা পুরুষ নন, তাঁরা রমণী। আজ মিস্ অবলা ঘোষ, ও মিস্ লীলি রায় ডেনজ্যারস্ পয়েণ্টে উঠ্‌তেছেন।"

সুখন সিং স্তম্ভিত হইয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কি? আপনি সুদক্ষ পাহাড়ী, পর্ব্বতারোহণে অভ্যস্ত! আপনি

দুইটী নির্ব্বোধ অজ্ঞ রমণীকে ডেনজ্যারস্ পয়েন্টে উঠ্‌তে অনুমতি দিলেন ?"

"অনুমতি ? তাঁরা কি আমার অনুমতির অপেক্ষা করেন ? বরং আমি যদি তাঁদের বাধা দিতাম, তবে তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত উঠ্‌তেন। তুমি তাঁদের মতামত জান না। তাঁরা পুরুষের সমকক্ষ হ'তে চান। চল—আমরা লুকিয়ে তাঁদের গতিবিধি দেখি গে। তাঁদের যদি কোন বিপদ হয়, আমরা সাহায্য করতে পারব।"

"তাই চলুন। আমরা টাইগার ক্ল'র অন্তরাল হইতে তাঁদের লক্ষ্য করব।" দুর্ব্বিন লইয়া তাঁহারা উভয়ে চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে মিস্ রায় পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। মিস্ রায় মধ্যবয়সী ও বিশালাঙ্গী, সুতরাং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমাদের ভুল হইয়া থাকিবে, এ ধারে উঠিবার কোন পথ ত দেখিতেছি না। বিড়াল ছাড়া অন্য কোন প্রাণী এ ধার দিয়া পাহাড়ে উঠিতে পারে না।"

গ্রীবা আন্দোলন করিয়া মিস্ ঘোষ উত্তর করিলেন, "না,—দেখ্‌ছ না—ওধারটা কি রকম ঝুলে পড়েছে ? এ ধার দিয়েই উঠ্‌তে হবে।"

এই বলিয়া ক্ষুদ্র বৃক্ষাবলীর উপর ভর দিয়া মিস্ ঘোষ সেই বিশাল উচ্চ প্রস্তর অতিক্রম করিয়া গেলেন। মিস্ রায়কে অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশেষ বিরক্ত হইয়া অবলার পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইল। কিন্তু তাঁহার স্থূল বপুঃ অত্যধিক পরিশ্রমে দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা পুনরায় সেই সমুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধেক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময় পুনরায় লতা-গুল্মহীন মসৃণ প্রস্তর তাঁহাদের গতিরোধ করিল। মিস্ রায় শ্রান্ত হইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব—এটাকে অতিক্রম করা কোন মতেই সম্ভব নয়।" হতাশ হইয়া তিনি সেই প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িলেন। এবার মিনতি করিয়া তিনি বলিলেন, "অবলা, আর কাজ নাই, ফিরিয়া চল। দেখ, এরই মধ্যে ২টা বেজে গেছে। চূড়ায় উঠা অসম্ভব। ল'ঞ্চের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চল, ফিরে যাই।"

স্থিরপ্রতিজ্ঞ মিস্ ঘোষ বলিলেন, "সে কোন মতেই হ'তে পারে না। মিষ্টার কর যে আমাদের বিদ্রূপ করবেন, সে আমি প্রাণ থাকিতে সহ্য করতে পারব না। হতাশ হ'চ্ছ কেন ? পাথরের মাঝে মাঝে খাঁজ আছে, দেখ্‌ছ না ? খাঁজে পা দি'য়ে বেশ ওঠা যাবে। আমি উপরে উঠিয়া না হয় তোমার জন্য দড়ি ফেলে দিচ্ছি। তুমি দড়ি ধ'রে উঠে আস্‌তে পারবে।"

প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া অবলা অনায়াসেই সেই বৃহৎ শিলাখণ্ড লঙ্ঘন

করিয়া গেলেন। তিনি প্রস্তরের অপর প্রান্ত হইতে মিস্ রায়ের জন্য রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া দিয়া তাঁহাকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু এবার তাঁহার সব অনুরোধ বৃথা হইল। মিস্ রায় সেই বন্ধুর দুরারোহ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি কাতর ভাবে কহিলেন, "আর পারি না ভাই। আমার পক্ষে আর ওঠা অসম্ভব। তুমি নেমে এস। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে। ল'ঞ্চের সময় কখন হয়ে গে'ছে।"

মিস্ ঘোষ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "আত্ম-সম্মান অপেক্ষা যদি ল'ঞ্চ তোমার অধিক ভাল লাগে, তবে তুমি ল'ঞ্চ খাও গে। আমি যাইব না।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মিস্ ঘোষ পুনরায় পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। ভগিনী নিবেদিতার মেমোরিয়্যাল ফণ্ডে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

২। মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ্ণৌ নগরে মোসলেম্ ইউনিভার্সিটি ফাউণ্ডেশন কমিটির এক অধিবেশন হইবে।

৩। করাচীর একজন অধিবাসী তিনটী বালিকাকে ভাওয়ালপুর রাজ্যে বিক্রয় করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। বালিকা তিনটির বয়স এত অল্প যে, তাহারা সাক্ষ্য দিতে পারে নাই।

৪। দরিদ্র বালকগণ যাহাতে পুস্তক, শ্লেট, কালি, কলম প্রভৃতি কিনিতে পারে তজ্জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ৬০০০৲ ছয় সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

৪। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী পঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধরে "কন্যা মহাবিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পঞ্জাবের ছোট লাট বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইয়া বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আগামী ২১শে ভাদ্র মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ মনোরমা ক্যাণ্ডেল ফ্যাক্টরীতে মহিলা শিল্প প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ হইবে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন।

৭। আগামী কংগ্রেসে মান্দ্রাজের সৈয়দ মহম্মদ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৮। বিগত ১৫ই আগষ্ট হইতে পার্লেমেণ্টের অধিবেশন বন্ধ হইয়াছে।

সমালোচনা।

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য—শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত একখানি পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মের শিক্ষোপযোগী উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। এবার ইহার ষষ্ঠ সংস্করণ। ইহাতে গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দশটী সরল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বঙ্গীয় নারীগণ সুমাতা ও সুগৃহিণী হইয়া সংসারের কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইতে পারিবেন। গ্রন্থকার বিবিধ শাস্ত্র হইতে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া ও কয়েকটি দৃষ্টান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া রমণীগণের হৃদয়ে কর্ত্তব্যগুলি মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। প্রত্যেক বঙ্গীয় গৃহিণীকে আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আনন্দ বাবু এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গের গৃহিণীগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ?

আদর্শ-লিপিমালা—আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত, মূল্য ১৲। ইহাতে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির পত্র উদ্ধৃত করিয়া পত্র লিখিবার আদর্শ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পরে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যবসা ও বাণিজ্য—নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০। 'ব্যবসা বাণিজ্য' বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে একটী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মাসিক। দেশে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অতি মহৎ। 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' কেবল শুষ্ক ব্যবসা বাণিজ্যের কথাতেই নিজ অঙ্গ পূর্ণ করেন নাই, ইহাতে হাস্যরসেরও আস্বাদ আছে। আমরা ইহা পাঠে যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। ভগবান্ ইহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া পত্রখানি দীর্ঘজীবী করুন।

ছাত্র-সুহৃদ্—ঢাকার কালীগঞ্জস্থ রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ হাই স্কুলের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত একখানি মাসিক পত্র, বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা।

ছাত্রবর্গের এ উদ্যম মন্দ নয়। কালে ইহারা সুলেখক হইতে পারিবে আশা করা যায়।

প্রীতি—সচিত্র মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছাত্রগণের জন্য ১৷৷০ টাকা ও সাধারণের জন্য ২৲ টাকা।

প্রীতির এবার তৃতীয় বর্ষ। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর বিলাতী ও দেশী ছবি আছে। প্রবন্ধাদি মন্দ নয়।

সুধী—মাসিক পত্র, প্রথম বর্ষ, শ্রীকালবরণ ঘোষ সম্পাদিত, মূল্য ২৷৷০ টাকা। চিত্রগুলি অতি সুন্দর। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শিশু—ছেলেদের সচিত্র মাসিক পত্র, মূল্য ১৲ এক টাকা।

'শিশু' শিশুরাজ্যের অতুল সম্পদ। ছেলেদের পাঠের উপযুক্ত এরূপ সরল সুন্দর মাসিক পত্র বাঙ্গালায় অতি অল্প। শিশু পাঠে ছেলেরা আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। শিশু কেবল শিশুদিগের আদরের সামগ্রী নহে, বৃদ্ধেরাও ইহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন না। শিশু এইরূপ শিশুরাজ্যের মনোহারী হইয়া আপনার উদ্দেশ্য সাধন করুন, এই আমাদের ইচ্ছা।

বামারচনা।

নিবেদন।

কলুষিত চিত্ত মম মুছায়ে দাও
ওগো অগতির গতি,
তোমারি বিশাল বক্ষেতে আমারে
ঠাঁই দাও প্রাণপতি।

২

হেথায় থেকে থেকে জীবন আমার
হয়ে গেছে পাপময়,
কেমনে তরিব যে ভীষণ নরক
হয়েছে গো সেই ভয়।

উদ্ধার নাথ উদ্ধার আমায় তুমি
ভীষণ নরক হতে,
ভুলায়ে সংসারের হিংসা, দ্বেষ, লিপ্সা,
নিয়ে চল গো সুপথে।

৪

উদ্ধারিয়ে জগতে রেখ না আর,
রাখিও তোমারি পদে,
দাসী ভেবে সেবিতে রাখিও আর
চরণ রাখিও হৃদে।

'চলিতে দাও'।

ওগো দেবতা আমার!
তুমি—সফল করেছ
বিফল জীবন,
পবিত্র প্রেম পরশে তব,
তুচ্ছ এ জীবন,
উচ্চ করে দেছ,
দিয়ে সুখ অভিনব।

তুমি সফল করেছ
বিফল জীবন
পবিত্র প্রেম পরশে তব॥ ১
ওগো সুহৃৎ আমার,
নীরব এ বীণা
সরব করেছ
মধুর প্রেমের ঝঙ্কারে,

মরুভূ হৃদয়
সিক্ত করে দেছ
ঢালিয়া মধুর প্রেমধারে
সরব করেছ
নীরব এ বীণা
মধুর প্রেমের ঝঙ্কারে ॥ ২

...ক্তি আমার!
তুমি চিনায়েছ
অনন্তের পথ
ধ্যান-ধারণা সকলি তুমি
তোমারই প্রেমে
যে প্রেম শিখেছি
সে প্রেমে ডুবিতে চাহি গো আমি।
মোরে—তুমি চিনায়েছ
অনন্তের পথ
ধ্যান ধারণা সকলি তুমি ॥ ৩

ওগো প্রাণেশ আমার!
শিক্ষা-গুরু হয়ে
শিখাও আমারে
তুমি অনন্তের সাথেতে যোগ।
সংসারের চিন্তা
ভুলে যাই আমি
হৃদে ধরে সেই নবীন আলোক
শিক্ষা-গুরু হয়ে
শিখাও আমারে
তুমি অনন্তের সাথেতে যোগ ॥ ৪

ওগো দেবতা আমার!
পরাণের সাধ
যে টুকু মিটেছে
এর বেশী নহে মিটিবার,
তাই—সকল ভুলে
মহা প্রেমে ডুবে
রহিতে চাই গো অনিবার।
হৃদয়ের সাধ
যে টুকু মিটেছে
এর বেশী নহে মিটিবার ॥ ৫

ওগো শক্তি আমার!
বাধা দিয়ে তুমি
ফিরায়োনা মোরে,
অনন্তের পথে চলিতে দাও।
বাকী যাহা র'ল
হবে পর পারে
অভাগার কথা ভুলিয়া যাও!
তুমি—বাধা দিয়ে মোরে
ফিরায়ো না আর
অনন্তের পথে চলিতে দাও! ৬

ওগো সখা আমার!
সেথা মন দিলে
অনিত্যের তরে
হয় না করিতে হাহাকার।
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ
তুচ্ছ করিয়া
পাইতে চাই গো সারাৎসার।
সেথা মন দিলে
হয় না করিতে
অনিত্যের তরে হাহাকার। ৭

ওগো প্রভু আমার!
ভুলিয়া অনিত্য,
একমাত্র 'সত্য'
হৃদয়ের মাঝে ধরিতে চাই।

বিড়ম্বনাময়
জীবনেতে মোর
দেখি যদি কিছু শান্তি পাই।
বিশ্বেশ্বর প্রেম
ভুলিয়া অনিত্য
একমাত্র 'সত্য'
হৃদয়ের মাঝে ধরিতে চাই। ৮
আরাধ্য আমার!
আকাঙ্ক্ষিত যাহা,
ছিল মোর হেথা,
না পেনু তাহা মরু ধরায় আর
ও পায়ে পাবায়,
আশাতে গো তাই,
চাহি গো বসিতে সাই আম
আকাঙ্ক্ষিত যাহা
ছিল মোর হেথা
না পেনু তাহা মরু ধরায়।

নয়ন দেখেনি।

নয়ন দেখেনি তারে,
শুনেছে শুধুই গান।
মৃদু মৃদু ওই সুর,
সদাই ব্যথিছে প্রাণ॥
সেই সুর সেই তানে
হয়ে আছি আমি ভোর।
হৃদয় বীণায় আজি
বাজিছে রাগিণী তোর॥
আধ মুকুলিত ফুল
নিদাঘের খর বায়।
ঝরে গেছে ম্লান হয়ে
আছে শুধু বাস হায়॥
লুটায়ে পড়েছে ভূমে ধীরে
বিদলিত শাখা ওই।
আলো করে ছিল যেথা
তরুণ কুসুম সেই॥
শোভাহীন হয়ে আছে
ঝটিকা-তাড়িত হয়ে।
যেন কত অপরাধী
কত অনুতাপ লয়ে॥
কে আজি নিল রে তুলে
পারিজাত মরতের।
ফুলহীন ছিল বুঝি
সে কানন ত্রিদিবের॥
তাই বুঝি ছিঁড়ে নিল
না ফুটিতে ফুলকলি।
দেবতাচরণে কেহ
হয় ত দিয়েছে ডালি॥
নিশীথের তারা সম
কভু যদি পড়ে খসে
বুক পেতে লব তুলে
গভীর আনন্দে ভেসে॥

কুমারী সুনীতি,
কেশবধাম (বেনারস)।

১০।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 603. November, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত

৫১ বর্ষ। ৬০৩ সংখ্যা। } কার্ত্তিক, ১৩২০। নবেম্বর, ১৯১৩ { ১০ম কল্প। ২য় ভাগ

বিবাহে পণ-গ্রহণ।

প্রথম প্রস্তাব—কন্যাপণ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আর্য্যজাতি ভারতে আসিয়া আদিম নিবাসী অনার্য্যদিগকে বাহুবলে বিতাড়িত ও ভারতবর্ষে আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। আর্য্যগণ ধার্ম্মিক জ্ঞানী, সংযমী, তেজস্বী, মনস্বী এবং সর্ব্বতোভাবে সভ্য ছিলেন। ইঁহারা পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের অর্দ্ধাংশভাগিনী মহিলাদিগকে যথোচিত সুশিক্ষা দান করিয়া তাঁহাদিগকে অনেক বিষয়ে নিজেদের সহকারিণী করেন। আর্য্যগণ যখন উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন তখন পরবর্ত্তী বংশধরদিগের সমাজ সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বহুবিধ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। হিন্দুগণের দশবিধ সংস্কার * সেই নিয়মাবলীর অন্যতম।

হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ সর্ব্ব প্রধান। মানব যে ইতর প্রাণীদিগের তুলনায় শ্রেষ্ঠতম, মানব যে সামাজিক জীব, মানব যে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতিলাভ করিয়াছে, প্রধানতঃ বিবাহ প্রথা হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু যে সমাজ যত সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসভ্য, তাহার বিবাহ প্রথার মধ্যে সুব্যবস্থা ও পবিত্রতা ততই অধিক পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে।

আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় বহুবিধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে।

* দশবিধ সংস্কার—বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন।

এই শাস্ত্রে মানবের আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ।

ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রজাপত্য, এই চারি প্রকার বিবাহ প্রধানতঃ ধর্ম্মসঙ্গত বলা হইয়াছে।

মনু বলেন—

সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যা ও বরের আচ্ছাদন ও পূজন পুরঃসর বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন নিষ্কাম বরকে যে কন্যাদান, তাদৃশ দান সম্পাদ্য বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যায়।

অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞকালে সেই যজ্ঞের কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে যে সালঙ্কৃতা কন্যাদান, সেই দান সম্পাদ্য বিবাহকে দৈব বিবাহ বলা যায়।

এক গাভী ও এক বৃষকে গোমিথুন বলা যায়। ধর্ম্মার্থ (অর্থাৎ যাগাদি সিদ্ধির জন্য, কন্যা বিক্রয়ের মূল্যরূপে নহে) এক বা দুই গো মিথুন বরপক্ষ হইতে লইয়া ঐ বরকে যে কন্যাদান করা হয় উহাকে আর্ষ বিবাহ বলা যায়।

"তোমরা উভয়ে মিলিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-আচরণ কর" বর কন্যাকে এই কথা কহিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে কন্যাদান, উক্ত দান সম্পাদ্য বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলা যায়।

কন্যার অভিভাবকদিগকে এবং কন্যাকে শক্ত্যানুসারে শুল্ক দিয়া বরের স্বেচ্ছানুসারে যে কন্যা গ্রহণ, ঐ কন্যা গ্রহণ সম্পাদ্য বিবাহকে আসুর বিবাহ বলা যায়।

এইরূপ বর কন্যার পরস্পরের অনুরাগ সম্পন্ন বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ, কন্যাকে তাহার পিতৃকুল হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাকে রাক্ষস বিবাহ এবং নিদ্রিতা বা কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবনে মত্তা কন্যাকে অপহরণপূর্ব্বক যে বিবাহ তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলা যায়।

আর্য্যগণ পৈশাচ বিবাহকে "অধমাধম" বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আসুর বিবাহে, যখন বরপক্ষ কন্যাকে সুন্দরী বা অন্য কোন কারণে বিবাহযোগ্যা মনে করিয়া কন্যাকে বা কন্যার পিতা প্রভৃতি অভি-ভাবকদিগকে ধনদান পূর্ব্বক, কন্যাগ্রহণ করিতেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের ঐ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত "আসুর" আখ্যাত বিবাহকে অপ্রশস্ত কার্য্য রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যে স্থলে কন্যার পিত্রাদি ইচ্ছাপূর্ব্বক কন্যা বিক্রয় করিয়া ঐ শুল্ক নিজেরা গ্রহণ করে, সেরূপ বিবাহকে শাস্ত্রকারগণ যার পর নাই নিন্দিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মনু বলেন,—

ন কন্যা যাঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্লীয়াচ্ছুল্ক-
মণ্বপি।
গৃহ্লন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্য-
বিক্রয়ী॥

(মনু ৩।৫১)

বিক্রয় দোষজ্ঞ কন্যার পিতা কখনও কন্যা বিক্রয় করিয়া শুল্ক গ্রহণ করিলে

তিনি অপত্য বিক্রয়ের পাতকী হইবেন।

অন্যত্র আছে—

আদদীত ন শূদ্রোঽপি শুল্কং দুহিতরং
দানং।
শুল্কং হি গৃহ্নন্ কুরুতে চ্ছন্নং দুহিতৃ
বিক্রয়ম্॥
মনু।৯ ৯৮।

অতি নীচ শূদ্রজাতিও কন্যার শুল্ক গ্রহণ করিবে না, * যদি উহা গ্রহণ করে তবে কন্যা সম্প্রদাতাকে গোপনভাবে দুহিতৃ বিক্রয়ী বলা যায়।

মনুসংহিতা ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে ও কন্যাপণের যথেষ্ট নিন্দাবাদ আছে। যথা—

ক্রয়ক্রীতা যা কন্যা পত্নী সা ন
বিধীয়তে।
তস্যাং জাতা সুতাস্তেষাং পিতৃ পিণ্ডং
ন বিদ্যতে।
অত্রি সংহিতা।

অর্থাৎ ক্রয় ক্রীতা কন্যা বিবাহ করিলে সে কন্যা পত্নী নামে অভিহিতা হইতে পারে না। এমন কি তাহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে তাহারা পিতার পিণ্ডদানের অধিকারী নহে।

দত্তক মীমাংসায় উক্ত হইয়াছে—

ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভি-
ধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পৈত্রো দাসীং তাং
কবয়োবিদুঃ॥

* অর্থাৎ শাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণাদি উহা কোনমতেই লইবেন না।

ক্রয়ক্রীতা বিবাহিতা নারী পত্নী নামে অভিহিতা হয় না। সে দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে পতির সহধর্ম্মিণী হয় না। পণ্ডিতেরা তাহাকে দাসী বলিয়া অভিহিতা করেন।

উদ্বাহ তত্ত্বোক্ত কশ্যপ বচনে কন্যা বিক্রয়ীদিগের বিষয় আরও গুরুতর রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্ব সুতা লোভ
মোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপাঃ মহা কিল্বিষ
কারিণঃ॥
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চ সপ্তমং
কুলম্॥

যাহারা লোভমুগ্ধ হইয়া শুল্ক লইয়া কন্যাদান করে, সেই আত্মবিক্রয়ী পাপাত্মা মহাপাপকারীরা ঘোর নরকে পতিত হয় এবং উর্দ্ধতন সাতপুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, আর্য্যগণ আসুর বিবাহকে অতীব নিন্দনীয়, ঘৃণার্হ বলিয়াই জানিতেন। যদিও ব্যক্তিবিশেষ কুলপ্রথাক্রমে, কন্যার বিবাহকালে, বরপক্ষের স্বেচ্ছা প্রদত্ত কিঞ্চিৎ শুল্ক গ্রহণ করিত, তাহা বিবাহকালে সেই কন্যাকেই দান করিত। অধর্ম্ম এবং লোকাপবাদ ভয়ে তাহা নিজেরা গ্রহণ করিত না। ভদ্রসমাজে এইরূপ রীতি ছিল। কিন্তু (লোভবশতঃ) কন্যা বিক্রয়ীদিগের কার্য্যে শাস্ত্রকারগণ যে প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া-

ছেন, তাহাতে হিন্দুস্থানগণের পক্ষে কন্যাপণ গ্রহণ করা যে নিতান্ত অকর্ত্তব্য এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র!

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, যে কন্যা বিক্রয়রূপ সমাজের দারুণ অনিষ্টকারী প্রথা, সমাজ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য পারদর্শী আর্য্যঋষিগণ যারপরনাই যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, সেই দারুণ কুপ্রথা বর্ত্তমান কালে সমাজের বক্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লোকের শোণিত শোষণ করিতেছে। পূর্ব্বকালে ইহা যে কারণেই প্রবর্ত্তিত হউক, এদেশের সামাজিক ইতিবৃত্ত অনুশীলন করিলে অনুভূত হয় যে, বল্লাল সেন প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথাই এই কন্যাপণের মূলীভূত। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বংশজ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ পাঁচশত হইতে সহস্র মুদ্রা পণে বিবাহার্থ কন্যা ক্রয় করিয়াছেন, এবং কুলীন ও মৌলিক কায়স্থেরা তদধিক পণ দিয়া কুলীন কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে কত সময়ে যে কত অনর্থকরী ঘটনা হইয়াছে, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রাচীন ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন, কত সময়ে অর্থহীন বিবাহার্থী কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি ক্ষমতাপন্ন ধনীদিগের সহায়তায় কুলমর্য্যাদা সম্পন্না পাত্রীকে চুরি করিয়া আনিয়া উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। ইহাতে কন্যার পিতৃপক্ষ অর্থলাভে বঞ্চিত ও অপমানিত হইয়া বর পক্ষের সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিতেন। সময়ে সময়ে এইরূপ বিবাদ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইত—আসুর বিবাহ রাক্ষস বিবাহে পরিণত হইত। কন্যা পণের জন্য বর্ত্তমান কালেও যে কত স্থানে শঠতা ও প্রবঞ্চনা ঘটিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ কৈবর্ত্ত, গোপ, কুম্ভকার, নাপিত প্রভৃতি হইতে তৈলকার (কলু), ধীবর, তন্তুবায়, রজক, নমঃশূদ্র প্রভৃতি পর্য্যন্ত অদ্যাপি অনেক পণ দিয়া বিবাহের জন্য পাত্রী ক্রয় করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সমাজে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই দরিদ্র। ইহাদের মধ্যে কত জন অর্থাভাবে বিবাহই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে কত জন ঋণ করিয়া বিবাহ করে এবং সেই ঋণ পরিশোধ না হইতেই তাহাদের অনেকের উপরে স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের ভার পড়ে। তাহারা প্রভূত শারীরিক পরিশ্রমে সামান্য যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, উত্তমর্ণের কুসীদ দান করিতে করিতে তাহার অধিকাংশ ব্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং উপযুক্ত ভরণ পোষণের অভাব গ্রস্ত হইয়াই ইহাদিগকে কাল যাপন করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় যদি ইহাদিগের মধ্যে কাহারও স্ত্রী বিয়োগ হয়, তবে বিপত্নীক ব্যক্তি অতি তরুণ বয়স্ক হইলেও তাহার পুনরায় বিবাহ করা অসম্ভব হইয়া থাকে। আবার কন্যাপণ ফলে অতি অল্প বয়স্কা পাত্রীগণ বিবাহিতা হইয়া থাকে। অধিক কি ইহাদের

সমাজে দেখা যায় যে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সহিত চারি পাঁচ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। এই অবস্থায় পুরুষেরা যদি বিবাহের ছয় বৎসর পরে লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহাদের সন্তানাদি রাখিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ স্থলে সেই বিধবার পরিণাম যে কতদূর শোচনীয় হয়, তাহা সকলে মনে মনে অনুভব করুন। এতদ্ভিন্ন উপরোক্ত কারণে এই সকল শ্রেণীর যেরূপে বংশ লোপ হইয়া যাইতেছে যদি সামাজিক নিয়মে তাহার কোনরূপ প্রতীকার না হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই যে ইহাদের বংশ লোপ হইয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা পল্লিগ্রামবাসী, অথবা যাঁহারা পল্লিগ্রামের অবস্থা বিশেষ রূপে অবগত আছেন, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের বংশ যে কিরূপ দ্রুত গতিতে ক্ষয় হইতেছে সে কথা তাঁহারা অবশ্যই জানিতেছেন। ম্যালেরিয়া, অর্দ্ধাশন, নিয়মাতিরিক্ত শ্রম এবং এই কন্যাপণ যে এইরূপ বংশলোপের কারণ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অন্যান্য কারণ নিরাকরণ করার দায়িত্ব স্বয়ং রাজার উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে, কিন্তু এই কন্যাপণ নিরাকরণ করিবার জন্য সমাজ নিজেই দায়ী। সকলেই বুঝিতে পারেন এই কন্যাপণ হইতে এ দরিদ্র দেশে অধিকতর দরিদ্রতা, নৈতিক হীনতা এবং লোকক্ষয় সজ্ঘটিত হইয়া প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিতেছে।

কন্যাপণ প্রথা নিবারণ কল্পে, ভারতের কত সুসন্তান বহুল চেষ্টা করিতেছেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা প্যারিচরণ সরকার, পণ্ডিতবর দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিগণ কন্যাপণগ্রহণের বিরুদ্ধে বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এডুকেশন গেজেট এবং সোমপ্রকাশে ইহার শাস্ত্রনিষিদ্ধতা এবং সামাজিক অনিষ্ট কারিতা সম্বন্ধে সুযুক্তি পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এইরূপ যত্ন ও চেষ্টার ফলে কন্যাপণ যে সাধুজন বিগর্হিত নীচ প্রথা, তাহা অনেকেরই বোধগম্য হইল ও কালে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্র বংশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কন্যাপণ গ্রহণ প্রথা অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইল।

বর্ত্তমান কালে কলিকাতা হইতে কন্যাপণ প্রায়ই বিতাড়িত হইয়াছে। পল্লিগ্রাম হইতে ইহা একেবারে দূরীভূত না হইলেও ইহার প্রভাব অনেকটা নিস্তেজ হইয়াছে। তবে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে এই কুপ্রথা যে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, সে কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

লোলার্ক মেলা

প্রতি ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠীতিথিতে বারাণসীতে এই মেলা হইয়া থাকে। অসিঘাটের নিকটে একটী বৃহৎ কূপ আছে এই কূপকে লোলার্ক কুণ্ড কহে। কাশীখণ্ডে কথিত আছে যে যৎকালে রুদ্রদেব কোপান্বিত হইয়া সূর্য্যকে বধ করেন, সেই সময়ে তাঁহারই দেহের একখণ্ড আসিয়া এই স্থানে পতিত হয় ও সেই সময় হইতেই এই লোলার্ক কুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা উত্তর পশ্চিম বাসিগণের একটি প্রধান পর্ব্বাহ। তবে কাশীবাসী বাঙ্গালীরাও সেই কুণ্ডে স্নান ও পূজা করেন। এই উপলক্ষে একটি মেলা বসে। সেই মেলা উপভোগ করাই লোক দিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। লোকে এই মেলা দেখিবার জন্য বহুদূর দূরান্তর হইতে আসিয়া থাকে। এই উপলক্ষে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইয়া থাকে। বালক, বালিকা, যুবা, প্রৌঢ় সকলেই সমভাবে ইহাতে যোগদান করে। ম্যাজিক, বায়স্কোপ, সুলভ ও অল্প মূল্যে অথচ কৌতুকজনক নাগরদোলা, "মেরিগোরাউণ্ড" ইত্যাদি কৌতুকজনক খেলায় তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে। তখন রাজপথের দুই পার্শ্বে অগণ্য দোকান লোকে পরিপূর্ণ থাকে। এই মেলায় সকল জিনিষ অপেক্ষা একটি জিনিষের বেশী বিক্রী দেখিলাম। সেটি "পেঁয়াজের ফুলুরী" গরম গরম ফুলুরী ভাজিয়া বিস্তর স্ত্রী পুরুষে বিক্রয় করিতেছে।

ময়রাগণ নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া লোকদিগের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত দোকানগুলি উত্তমরূপে সাজাইয়া আগ্রহের সহিত খরিদদারের অপেক্ষা করিতেছে। এই মেলার সময় পথে অত্যন্ত অধিক জনতা হয়। গাড়ী ঘোড়া যাইবার স্থান থাকে না। অনেক সময়ে শুনা গিয়াছে যে এই জনতায় বহু অলঙ্কার যুক্তা স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার অপহরণ করিবার জন্য দুষ্ট লোকরা সেই স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা বা নাক কান কাটিয়া তাহাদের অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রী সমভাবে পথে যাতায়াত করিতে থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অভিভাবকের সহিত গমন করেন কেহ কেহ বা একলাই যান। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের জনতা অধিক থাকে, পরে বৈকালে পুরুষদের জনতা। সকালে কেবল মহিলারা সেই কূপে স্নান পূজার্থ গমনাগমন ও কেনা বেচা ইত্যাদি করেন। কিন্তু পুরুষদের জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়া নানাবিধ গীত বাদ্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

সন্ধ্যার পর মেলার ঘটা আরও বাড়িয়া উঠে। চারি দিকে অস্তগামী সূর্য্যের নিস্তেজ

কিরণমালা বিস্তারিত হইয়া পড়ে, পরে ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসে। তখন জনতাও কিছু কম হয়। এবং ফুলের সুন্দর গন্ধে অন্তর প্রফুল্লিত হয়। মালাকারগণ মালা গাঁথিয়া চতুর্দ্দিক সৌরভপূর্ণ করিয়া বিক্রয়ার্থ ইতস্তত গমন করে। অন্ধকার হইলে দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হয়। তখনকার সে দৃশ্য অতি সুশোভন ও মনোহর।

এই প্রকারে রাত্রি অধিক হইলে মেলা ভঙ্গ হইতে থাকে। সকলে সারা দিন নানারূপ আমোদ প্রমোদ করিয়া ক্লান্ত শরীরে আগামী বর্ষের মেলার প্রতীক্ষা করিয়া সেখানে হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

এই লোলার্ক কুণ্ডের পথে "কেনারাম বাবার" আস্তানা নামক একটি অনতিবৃহৎ মঠের ন্যায় মন্দির আছে। সেখানকার বাৎসরিক উৎসব এই দিনেই হইয়া থাকে। সন্ধ্যার পর হইতেই দলে দলে লোকে সেখানে গিয়া সাধু কেনারামের সমাধি দর্শন ও পূজা করে। পূজোপকরণের মধ্যে সেখানে গাঁজাও দিতে হয়। উক্ত সাধু সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী আছে যে এই কাশীতেই তিনি একটি মৃত বালককে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ইনি সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে গণ্য। বারাণসীর নর্ত্তকীরা ইহাঁর বড় ভক্ত। সকলেই আসিয়া এই উৎসবে প্রণামী দিয়া সমস্ত রাত্রি স্বতঃই নৃত্যগীতে সেই সমাধি প্রাঙ্গন মুখরিত করিয়া থাকে।

লোকে বলে কাশীর "বুড়োমঙ্গল" আর লোলার্ক মেলা এই দুটি প্রধান মেলা।

কুমারী সুনীতি
কেশবধাম বেনারস।

হারকিউলিস্

মহাবীর হারকিউলিস (Hercules) এর মহিষী (Deianira) ডিয়ানিরা পরিপার্শ্বস্থা পরিচারিণীগণের নিকটে আপনার দুঃখ কাহিনী বিবৃত করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন. তিনি ইটোলিয়া (Ætolia)র রাজ কুমারী ছিলেন। যৌবনে জলদেবতা একিলস (Achelous) তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার পরে বিশ্ববিজয়ী হারকিউলিস্ যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন।

বীরপত্নী ডিয়ানিরা পতিগৃহে আসিলেন এবং ক্রমে বহু সন্তানের জননী হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। দেবরোষে তাঁহার স্বামী দেশান্তরিত হইয়াছিলেন। হিরা (Hera) দেবীর অভিশাপে বীরবরের জীবনের অর্দ্ধেক কাল প্রবাসে কঠোর শ্রম ও ক্লেশকর পর্য্যটনে কাটিতেছিল। গৃহের শীতল শান্তি সম্ভোগ করা দুদিনের জন্যও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না। স্বামী সঙ্গ বঞ্চিতা সাধ্বী রাণীর অশ্রু জলের তাই বিরাম ছিল না।

সম্প্রতি (Zeus) জিয়স দেব আবার তাঁহার প্রতি কোপ-কটাক্ষপাত করিলেন। তাঁহার আদেশ, Herculesকে দ্বাদশ মাস লিডিয়া (Lydia) রাজ্ঞীর অধীনে দাসত্ব করিতে হইবে। বীরের এরূপ অপমান! কিন্তু উপায় নাই। দেবাদেশ অগ্রাহ্য করিবার নয়। একেলিয়া (Achalia)র রাজপুত্র। ফিটস (Phitus) এর তিনি প্রাণবধ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধের শাস্তি এই।

পত্নী ও পুত্রগণের ভার আত্মীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি যাত্রা করিলেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন তাহা তাঁহারা জানিলেন না হারকিউলিস (Hercules) মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন, যাহার জন্য তাঁহার এই লাঞ্ছনা ভোগ, নিয়তির কাল পূর্ণ হইলে তিনি তাহাকে ইহার প্রতিফল দান করিতে ভুলিবেন না।

তাহার পর ১৫ মাস কাটিয়া গিয়াছে হারকিউলিস (Hercules) আজও ফিরেন নাই, সতী সাধ্বীর চক্ষের জলও এক দিনের জন্য শুষ্ক হয় নাই। স্বামীর সংবাদটি পর্যাস্ত তিনি জানেন না। আপন দেশ, আপন রাজ্য ছাড়িয়া বিদেশে অপরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের ন্যায় মহারাজ কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! তাঁহার চির পুরাতন এই দুঃখ কাহিনীই রাণী-পরিচারিকাদের নিকটে বলিতেছিলেন।

বৃদ্ধা এক ধাত্রী বলিল—"বৃথা বিলাপে আপনার জীবন আর ক্ষয় করিয়া কি ফল, বৎসে? উঠ, অশ্রুজল মুছিয়া ফেল। বীরপুত্রগণের জননী তুমি তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে পিতার উদ্দেশে প্রেরণ কর। সে তাঁহার সন্ধান লইয়া ফিরিবে। ঐ দেখ তোমার হিলস্ (Hyllus) এইখানেই আসিতেছে।"

দীর্ঘাকৃতি প্রিয়দর্শন এক যুবক গৃহে প্রবেশ করিল। স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার সর্বাঙ্গ স্নেহসিক্ত করিয়া জননী জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে বলিলেন—"তোমারই কথা হইতেছিল। তোমাদের পিতা—"বাধা দিয়া Hyllus বলিলেন—"সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি, মা। জনরবের কথা যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে আমাদের পিতা———

—"কোথায় কোথায়? কেমন আছেন তিনি? কোথায় আছেন?"

Hyllus বলিলেন—"ইউবিয়াতে তাঁহার পুরাতন শত্রু ইউরিটাসের (Eurittus) বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগে এখন তিনি ব্যাপৃত।" উত্তেজিত ও বিস্মিত হইয়া দেয়নিরা বলিয়া উঠিলেন—"ইউবিয়া!—তাহার সকল পরীক্ষা ও সংগ্রামের অবসান এই স্থানে হইবে বলিয়া তো দৈববাণী হইয়াছে! এই সংগ্রামে যদি তিনি জয়ী হন তাহা হইলে অবশিষ্ট সমস্ত জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারিবেন। আর যদি তাহা না হয় —কিন্তু যাও, বৎস, শীঘ্র তোমার পিতার সাহায্যে যাও। এই সঙ্কটসময়ে তাঁহার তোমার সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন।"

"যাই মা" বলিয়া পুত্র বিদায় লইলেন। চঞ্চলচিত্তের ব্যাকুল উত্তেজনাকে শান্ত

করিবার আশায় রাণী একটি বালিকাকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন—"কাজ এখন থাক্, বৎসে,—সেই গানটী আমাকে শোনাও—সেই (*Harcules*) হার্কিউলিসের বীরত্বকাহিনীর গৌরবগাথা।"

বালিকা বীণার সঙ্গে গান ধরিল। কোমল কণ্ঠের মধুর ধ্বনি সকলকে মোহিত করিয়া ধীরে ধীরে আকাশে মিলাইয়া গেল। বিগলিত-চিত্ত রমণী-মাতা স্নেহের দৃষ্টিতে বালিকার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"মা! আমার সকল ভাবনা, সকলপ্রকার চিন্তা তোমার ঐ গান শুনিলেই ভুলিয়া যাই। তুমি, মা! ভাবনাচিন্তার কথা কি বুঝিবে? ভয়-ভাবনাবিহীন তোমার ঐ শুভ্র কুমারী জীবন পুষ্পের মত চারিদিকে মাধুর্য্য ও সৌরভ ছড়াইতেছে, রৌদ্রতাপ ও ঝঞ্ঝাবাত হইতে ও সুকুমার জীবনখানি এখন সম্পূর্ণ আবৃত। কিন্তু হায়! মা! চিরদিন এমন থাকিবে না। বাল্যের মোহন স্বপ্ন একদিন ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন জাগিয়া উঠিয়া দেখিতে পাইবে কি দুঃখকষ্টের বিষম বোঝা বহিবার জন্য এ সংসারে নারীজন্ম লাভ হয়!"

আত্মবিস্মৃতা রাণীর সকল কথা বুঝিবার মত ক্ষমতা বালিকার ছিল না, সে ছল ছল নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাণী তখন সকলকে লক্ষ্য করিয়া উদ্বেলিত নেত্রে বলিতে লাগিলেন—"আশা ও আশঙ্কার মধ্যে আমার হৃদয় কাঁদিয়া মরিতেছে! যাত্রাকালে হার্কিউলিস্ বলিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনব্যাপী সংগ্রামের এই শেষ। যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার সম্পত্তি পুত্রগণ ও আমার মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—'হইতে পারে আমার জীবনের এই শেষ, প্রাণ লইয়া আর না ফিরিতেও পারি। এক বৎসর তিনমাস গত হইলে তবে আমার ভাগ্যলিপি পরিবর্ত্তন হইবে। সেই সময় আজ আসিয়াছে—আমার ভাগ্যে কি আছে কে জানে!' "

এই সময়ে বিজয়চিহ্নধারী অনুচর আসিয়া মহারাজের মঙ্গলসংবাদ দান করিল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাহার নিকটে এই সংবাদ পাইলে?" সে বলিল,—"Hercules-এর দূত চির-বিশ্বাসী লাইকাসের (Lichas) নিজের মুখ হইতে। জয়-লব্ধধনরাশী বহন করিয়া অচিরে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন। নগরবাসী-গণ সহস্র প্রশ্নে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সেই সুযোগে, সর্ব্বাগ্রে শুভসংবাদ দানের পুরস্কার লাভ করিবার আশায় জনতা ঠেলিয়া আমি মহারাণীর চরণে উপস্থিত হইয়াছি।"

"সাজাও—সাজাও—ওগো, আর কোনও সংশয় নাই! লাইকাস-এর (Lichas) নামোল্লেখমাত্র মন হইতে সকল সন্দেহ নির্ব্বাসিত হইয়াছে। মহোৎসবের আনন্দউৎস বহিয়া যাক্। আজ আলোকমালায় সমস্ত রাজভবন হাসিয়া উঠুক।"

অনতিবিলম্বে লাইকাস্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে বিজিত

রাজ্যের বন্দিনী কুমারীদল। দূতকে সম্মানসূচক অভ্যর্থনা করিয়া রাণী স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। লাইকাস বলিলেন—"আমি তাঁহাকে ফিরিবার সময় পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল দেহ দেখিয়া আসিয়াছি। এখন তিনি দেবতা জিয়স (Zeus) এর মন্দির নির্ম্মাণে ব্যাপৃত। যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে জয়লাভ হইলে দেবতার অধিষ্ঠানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।"

তখন একটি একটি করিয়া রাণী দীর্ঘ-বিচ্ছেদকালের ঘটনাগুলি শুনিতে লাগিলেন। নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে রাজা কোথায় ছিলেন, নির্ব্বাসনের কারণ কি দূত সকল কথা বলিতে লাগিল।—নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে হার্কিউলেস ইউবিয়ারাজ ইউরিটাসের গৃহে অতিথি ছিলেন। সেই সময় ইউরিটাস্ একদিন তাঁহাকে অত্যন্ত অপমান করেন। অপমানের আক্রোশে উন্মত্ত হইয়া হার্কিউলিস গৃহস্বামীর পুত্র ইফাইটাস (Iphitus) এর প্রাণবধ করিয়াছিলেন। লিডিয়ামহিষীর গৃহে বৎসরব্যাপী দাসত্ব করিয়া তাঁহাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া তিনি ইউবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাহার পরিণাম ইউরিটাসের সম্পূর্ণ পরাজয়।

এই সকল কথা শুনিয়া রাণী মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া কি চিন্তা করিলেন। কোন অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়কে অত্যন্ত আকুল করিয়া তুলিল। রাণীর মুখে চিন্তা ও বিষাদের ছায়া দেখিয়া পরিচারিকা কহিল—"কোন্ অজ্ঞাত বিষাদের কৃষ্ণ ছায়া এই আনন্দের শুভ সময়ে রাণীর হৃদয়কে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল?"

রাণী কহিলেন—"না-না-না—আমার আনন্দ হইতেছে—বিষাদ নয় অশুভ আশঙ্কা নয়—আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে! তথাপি আনন্দের আতিশয্য ভাল নয়, কারণ অসংযত আনন্দের অবসান অশ্রুজল। আর এই বন্দিনী বালিকাদিগকে দেখিয়া আমার অন্তরে করুণভাবের সঞ্চার হইতেছে। কোন্ উদ্যানে এই ফুলগুলি ফুটিয়াছিল এগুলি কোন্ সুখী পরিবারের নয়নানন্দ, স্নেহপুত্তলী ছিল? কিন্তু হায়! হিংসার কি শোচনীয় পরিণাম—পিতৃহারা, গৃহহারা হইয়া এই কুমারীগণ আজ বিদেশে শত্রুর দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ।"

যে বন্দিনীর মুখখানি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, চোখদুটি অধিক বিষণ্ণ, তাহার দিকে ফিরিয়া রাণী দিয়ানিরা বলিলেন—"তোমার নাম কি বৎস? তোমার পিতা মাতা কে? অভাগিনি, তুমি বিবাহিতা না কুমারী? সম্ভবতঃ তুমি কুমারী এবং তোমার জন্ম যে মহৎকুলে তাহার সন্দেহ নাই। বন্দিনী অবনতনয়নে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া রাণী লাইকাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বালিকাটি কে? মহাকুলে ইহার জন্ম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর সকলের দিকে দেখ, আর

উহার মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখ, আর কাহারও বোধ হয় আপন অবস্থার প্রতি এতদূর দৃষ্টি পড়ে নাই।"

লাইকাস বালিকাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া রাজ্ঞীর প্রশ্ন অতিক্রম করিয়া গেলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন—"গৃহত্যাগ অবধি বালিকা একটি বাক্যও উচ্চারণ করে নাই, সমস্ত পথ অবিরল অশ্রুপাত করিয়াছে।" বন্দিনীদিগকে লইয়া লাইকাস ত্বরিতপদে প্রাসাদের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে হার্কিউলিসের আগমন সংবাদ রাণীর নিকট আনিয়াছিল সে তখন আসিয়া বলিল—"মহারাণি, সমস্ত কথা আপনি শুনেন নাই, লাইকাস আপনাকে প্রতারণা করিয়া গেল। নগরে সে একরূপ কথা প্রচার করিয়াছে, আপনার নিকট অন্যরূপ বলিল। ইউরিটাসের সহিত হার্কিউলিসের যুদ্ধের কারণ ইফাইটাসের মৃত্যু বা অপর কিছু নহে, যুদ্ধের কারণ ঐ বালিকা। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আপনি যে বালিকা সম্বন্ধে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, আপনার স্বামী হার্কিউলিস তাহারই প্রণয়ে মুগ্ধ। আমার বাক্য যে সত্য সে সম্বন্ধে আমি সহস্র প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারি।"

বজ্রাহতা দিয়ানিরা ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন —"তুমি উহার নাম জান?" দুর্ম্মুখ বলিল —"নিঃসন্দেহ!—সে নাম যে সে নাম নহে!! এই বালিকাই আইওল্ (Iole), ইউবিয়ার রাজকুমারী ইউরিটাসের দুহিতা।"

রাণীর আহ্বানে লাইকাস পুনরায় আসিলেন। আসিয়াই তিনি বলিলেন—"আমি এখনই প্রভুর নিকটে ফিরিয়া যাইতেছি। মহারাণীর নিকট হইতে কোনও বার্ত্তা তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতে হইবে কি?

রাণী বলিলেন—"এত ত্বরা কিসের জন্য? তোমার আরও অনেক কথা বলা অবশিষ্ট রহিয়াছে। দূত বলিল—"যাহা জানিতে চাহেন আজ্ঞা করিলেই শুনিতে পাইবেন।"

তখন তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাণী বলিলেন—"তবে সত্য বল, যাহাকে তুমি লইয়া আসিয়াছ সে রমণী কে?

"সে ইউবিয়ার একজন অধিবাসিনী, তাহার সম্বন্ধে এইমত বলিতে পারি।

পূর্ব্বোক্ত হতভাগ্য তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া কহিল—"তোমার প্রভুপত্নীকে এইরূপে প্রতারণা করিতে তুমি সাহস করিতেছ?

লাইকাস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"কি? তুই আমার সহিত এইরূপে কথা কহিতে সাহস করিতেছিস?

নির্ব্বোধের মত রসনাকে রোধ করিবার চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া সে বলিল—"কেন এই কিছুক্ষন পূর্ব্বে তুমি না বলিলে যে এই রমণী Iole, ইউরিটাসের কন্যা, এবং হার্কিউলিস্ বহুদিন হইতেই ইহার পাণিপ্রার্থনীয়।

লাইকাস তাহার কথায় উত্তর দিতে অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়া রাণীকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন — "এই বাতুল কে? ইহাকে বিদায় করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। এই অলসের অর্থহীন প্রলাপ শুনিয়া কালহরণ করিবার অবসর আমার নাই।"

কিন্তু রাণীর হৃদয়ে পত্নীর সমস্ত শঙ্কা-জনক সংশয় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। লাইকাসের কথা তাঁহার চিত্তে শান্তি আনিতে পারিল না। তিনি বলিলেন—"লাইকাস! পৃথিবীমধ্যে পবিত্রতম বস্তু যাহা কিছু আছে সে সকলের নামে তোমায় অনুরোধ করিতেছি, তুমি সত্য কথা বল। কিসের ভয় করিতেছ? আমি কি হার্কিউলিসের ধর্ম্মপত্নী নহি? তুমি কি মনে কর তাঁহার বীরহৃদয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর আসন হইবে আমি সে আশঙ্কা করি? আমি এত দুর্ব্বল নহি। গোপন করিবার প্রয়োজন কি? বল, তিনি কি তোমাকে সত্য গোপন করিবার আদেশ দিয়াছেন, না তুমি আপনা হইতে এইরূপ আচরণ করিতেছ? সত্য একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে। এই কাপুরুষোচিত প্রতারণা ত্যাগ করিয়া সরল ভাবে ও নির্ভয়ে যাহা সত্য তাহাই বল।

লাইকাস তখন লজ্জিত হইয়া কহিলেন —"যাহা শুনিয়াছেন সকলই সত্য। কিন্তু মনে করিবেন না যে আমার প্রভুর আদেশে আমি এই প্রতারণা করিয়াছি। এই দোষ—যদি ইহা দোষ হয়—সমস্তই আমার। জননী মহারাণীর হৃদয়ে আঘাত দিতে আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই প্রতারণা করিয়া ক্ষণকালের জন্য আপনাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

চিন্তামগ্ন দিয়ানিয়া তখন বলিলেন—"ভালই, কোনও ক্ষতি নাই! ফিরিবার সময় আমার নিকট হইতে তোমার প্রভুর জন্য উপহার লইয়া যাই ও দিয়ানিয়ার নিকট হইতে দূত রিক্তহস্তে তাঁহার কাছে ফিরিবে ইহা সঙ্গত নহে।

আপন সহকারিণীগণের মধ্যে আসিয়া দিয়ানিয়া আর আত্মগোপন করিলেন না। প্রবল আত্মগরিমা লাইকাসের সমক্ষে তাঁহাকে উচ্চশির করিয়া রাখিয়াছিল, এখন বিশ্বস্তহৃদয়া সমব্যথিত সহচারীর মধ্যে আসিয়া সংযমের রশ্মি ছিন্ন হইয়া গেল। হৃদয়দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"হায়, ইউবিয়ার এই তরুণ সুন্দরী স্বামীর হৃদয়ে আমার স্থান অধিকার করিয়াছে।—কিন্তু একটি মন্ত্র আমার কাছে রহিয়াছে তাহাদ্বারা আমার আসন অটল রাখিতে আমি সমর্থ হইব। বিবাহের পরে পিত্রালয় ছাড়িয়া স্বামীর সহিত আসিবার সময় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল পথে নদী পার হইবার জন্য যাত্রীকে নিশাসের সহায্য লইতে হইত। এই নিশাস্ অর্দ্ধ মনুষ্য অর্দ্ধ অশ্বাকৃতি। সেই পৃষ্ঠে করিয়া সকলকে নদী পার করিয়া দিত। সে আমাকে পার করিয়া দিবার জন্য পৃষ্ঠে উত্তোলন করিল, কিন্তু পার না করিয়া দুরাত্মা আমাকে লইয়া পর্ব্বতের

দিকে ছুটিল। আমি চীৎকার করিয়া হার্কিউলিস্‌কে ডাকিলাম এবং অবিলম্বে তাঁহার অব্যর্থ শরে পাপিষ্ঠ ভূতলশায়ী হইল। মৃত্যুকালে ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল 'ইনিউসদুহিতা, এই পৃথিবীতে তোমাকেই আমি সর্ব্বশেষে আমার পৃষ্ঠে বহন করিলাম, যাইবার সময় আমার স্মৃতিচিহ্নরূপে তোমাকে কিছু দান করিতে চাহি। আমার দেহনিঃসৃত এই শোণিত তুমি সযত্নে রক্ষা করিও। যে শর আমার কালস্বরূপ হইল তাহা মহানাগ শতশীর্ষ হাইড্রার বিষে লিপ্ত। আমার প্রাণের পক্ষে এই বিষ শোচনীয় হইলেও ইহার আশ্চর্য্য গুণ আছে। আমার শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা এক অপূর্ব্ব শক্তি ধারণ করিয়াছে। হার্কিউলিস্‌কে যদি চিরদিন তোমার প্রেমে বাঁধিয়া রাখিতে চাও তাহা হইলে আমার এই শোণিত সংগ্রহ করিয়া লও। তাঁহার মন চঞ্চল দেখিলে এই শোণিতে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া তাঁহাকে পরিধান করিতে দিও তাহা হইলে কখনও বিফল হইবে না। এই কথা বলিয়াই Nessus এর মৃত্যু হইল। আমি এতদিন পর্যন্ত ইহা যত্নে রক্ষা করিয়াছি এখন ব্যবহার করিবার সময় আসিয়াছে। তোমরা কি বল ?

ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া সঙ্গিনীগণ ইহাতে তাহাদের সম্মতি জানাইল।

ক্রমশঃ

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

যমালয় হইতে প্রত্যাগত

একে একে পাঁচটী পুত্র কন্যা অকালে কালকবলে নিপতিত হওয়ায় হারাণ চন্দ্র বড় অবসন্ন হইয়া পড়িল। হারাণ চন্দ্র দাস, জাতিতে কৈবর্ত্ত। সে কৃষিকার্য্য দ্বারা কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তাহার কিছু সঞ্চয় না থাকিলেও পরিশ্রম লব্ধ সামান্য অর্থে দিন একরূপ চলিয়া যাইত, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। কিন্তু ভগবান্ যাহার প্রতি বিমুখ, তাহার সুখ শান্তির আশা কোথায় ? অথবা ভগবানের দোষ দেওয়া অন্যায়; মানুষ নিজের কর্ম্মফলে নিজে ক্লেশ পায়, অজ্ঞানতা বশতঃ না বুঝিতে পারিয়া ভগবানের দোষ দেয়। হারাণ ও তাহাই মনে করিত। "ভগবান আমার এমন সর্ব্বনাশ কেন করিলেন' এই কথা সে সর্ব্বদা ভাবিত। হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন, প্রিয়তম পুত্র কন্যা গুলিকে হারাইয়া হারাণচন্দ্র শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পরে যখন তাহার একমাত্র অবশিষ্ট পুত্র দুলালচাঁদের মৃত্যু হইল, তখন তাহার হৃদয়ের বন্ধন একেবারে ছিড়িয়া গেল।

হারাণ চন্দ্রের ক্লিষ্ট চিত্ত, শীর্ণ দেহ, সে আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। সে একেবারে শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল।

২

অন্ত্যজ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও হারাণের গৃহিনী যেরূপ সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য-শীলতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয় এবং একান্ত অন্তরে তাহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। সে যে নীচ কৃষক রমণী! উচ্চ শিক্ষা দূরে থাক, কোনরূপ সামান্য শিক্ষার বাতাসও তাহার গায়ে কখনও লাগে নাই! সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে, তাহাও সে জানিত না। কিন্তু সেই নিরক্ষর অসভ্য কৈবর্ত্ত রমণীর যেরূপ সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্যশীলতা, এবং কর্ত্তব্য বুদ্ধি ছিল, আহা আমাদের মধ্যে কয়জনের আছে? আমরা আবার উচ্চশিক্ষার অভিমান করি? আমরা আবার আভিজাত্যের গৌরব করি!!

এই সময়ে হারাণের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সেই অবস্থায়, অসহ্য পুত্র-শোক-শেল বক্ষে ধরিয়াও, আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে বুঝিতে পারিল, এ সময়ে সে অধীরা হইলে তাহার স্বামীর জীবন রক্ষা হওয়া দুরূহ। সে নিজের বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া, শোকার্ত্ত, দুর্ব্বল, স্বামীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। পতিব্রতা, স্নেহময়ী ভার্য্যার ঐকান্তিক যত্ন ও শুশ্রূষার গুণে, হারাণচন্দ্র ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যলাভ করিতে লাগিল।

যথা সময়ে হারাণের পত্নী একটী পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিল। ভাগ্যহীন দম্পতির শোক ক্লিষ্ট, নিরাশ হৃদয়ে আবার আশার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল।

৩

উপর্য্যুপরি শোকের আঘাত পাইয়া হারাণের পত্নীর হৃদয় কিছু কঠোর ভাব ধারণ করিয়াছিল। সে নবজাত পুত্রকে ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল। স্বামীকে বুঝাইয়া বলিল, "আমরা উহাকে বড় অধিক ভালবাসিব না। যদি আমাদের হ'য়ে এসে থাকে, আর ভগবান পায়ে রাখেন, তবে অবশ্যই থাকিবে, আর তাহা যদি না হয়, যাঁর বস্তু, তিনিই গ্রহণ করিবেন, আমরা কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিব না, তবে কেন মিথ্যা মায়া বাড়াইব?" হারাণ, পত্নীর বাক্য সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিল; কিন্তু যখনই সেই ক্ষুদ্র শিশুর সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিত, তখনই তাহার স্নেহের উৎস উচ্ছলিত হইয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে নয়ন পল্লব ভিজিয়া যাইত। হারাণ সর্ব্বদা একমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিত, "দয়াময় প্রভু! যাহা হারাইয়াছি তাহা আর পাইব না, এখন শেষ জীবনে যাহা দিয়াছ, তাহা আর ফিরিয়া নিও না।"

হারাণের স্ত্রী কিছুই ভাবিত না। তাহার একই কথা, "যাঁহার ধন, তিনি রাখিলে কেহই মারিতে পারিবে না, আর তিনি যদি নেন, তাহা হইলে ধরিয়া

রাখিতে কাহারও সাধ্য নাই।” যাহার ভগবানের প্রতি এমন মনের বিশ্বাস এমন নির্ভরতা থাকে, ভগবান তাহাকে কখনও ত্যাগ করেন না।

৪

শিশুর নাম হইল কুড়ানচন্দ্র। পথে কুড়াইয়া পাওয়ার মত অধিক বয়সের সন্তান বলিয়াই হউক, অথবা পাঁচ ছয়টী সন্তান অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ায় অবহেলা করিয়াই হউক, মাতা শিশুর কুড়ানচন্দ্র নাম রাখিল।

কুড়ানচন্দ্র ক্রমে বড় হইতে লাগিল। এদিকে কালের চিকিৎসায় তাহার জনক জননীর ক্ষত হৃদয় ক্রমে অল্পে অল্পে শুষ্ক হইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষত শুকাইলেও তাহার দাগ যায় না। সব যায়, স্মৃতি যাইবার নয়। হারাণচন্দ্র অনেক সময় অতীতের কথা চিন্তা করিত। আজ তাহার ঘরে ছেলে পুলে ধরিত না। বড় ছেলে থাকিলে এতদিনে কার্য্যক্ষম হইত। তাহাকে কত সহায়তা করিত, হয়তঃ এতদিন বধূ ঘরে আসিত। এই সব ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। অমনি কোথা হইতে কুড়ানচন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আধ আধ কোমল-স্বরে বলিত, “বাবা! কাঁদিস্ কেন?”

হারাণের আর রোদন করা হইত না। চোখের জল চোখে চাপিয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিত। একদিন মাতার চোখে জল দেখিয়া কুড়ান বড়ই কাঁদিয়াছিল। সেই অবধি বুদ্ধিমতী জননী আর কোন দিন পুত্রের সম্মুখে চোখের জল ফেলে নাই। এক দুই করিয়া কুড়ানচন্দ্রের পঞ্চম বৎসর উত্তীর্ণ হইল।

৫

হারাণচন্দ্র শৈশবে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় কিছু দিন পড়িয়াছিল, সেই জন্য বিদ্যার আস্বাদ তাহার একটু জন্মিয়াছিল। তাহার চিরদিনেরই ইচ্ছা, একটী ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হয়, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার সন্তান গুলি অকালেই তাহাকে ছাড়িয়া গেল। শেষে কুড়ানচন্দ্রের জন্মের পর হইতে বহুদিনের লুপ্ত আশা, আবার তাহার হৃদয়ে নবীন ভাবে জাগিয়া উঠিল। হারাণ চন্দ্র নব উৎসাহে পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইতে মনস্থ করিল, নিজেই ঘরে বসিয়া একটু একটু পড়াইতে লাগিল। কুড়ানচন্দ্র সেরূপ মেধাবী ছিল না। তবু পিতার একান্ত যত্নে অক্ষর পরিচয় শেষ করিয়া “ফলা বানান” শিখিতে লাগিল। হারাণের আনন্দের সীমা নাই, বিদ্যা শিক্ষায় পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া তাহার মনে আশা হইল যে কালে এই বালক আদালতের পেয়াদা হইয়া দশটাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে অথবা হয়তঃ সে থানার জমাদার হইতে পারিবে। অশিক্ষিত হারাণচন্দ্রের সরল হৃদয়ে ইহা অপেক্ষা উচ্চ আশা কোন দিন স্থান পায় নাই।

আরও, তখনকার দিনে সাধারণ লোকে এই দুইটী পদ প্রার্থনীয় মনে

করিত, উহাতে উপার্জ্জনও যথেষ্ট ছিল। এখন দারগাকে লোকে যতটা সম্মান করে, তখন জমাদারকে তাহার অপেক্ষা অধিক সম্মান ও ভয় করিত, বিশেষতঃ পল্লী গ্রামে জমাদারের প্রতিপত্তি ও আধিপত্য অসীম ছিল, তাহাদের দেখিলে একটী ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের অধিপতি বলিয়া মনে হইত।

৬

কুড়ান চন্দ্র দুই বৎসরের মধ্যে নামতা পর্যান্ত শিখিয়া ফেলিল। পাড়ার জমীর শেখ গুরুর একটী ছোট খাট পাঠশালা ছিল। দশ পনের জন বালককে জমীর গুরু শিক্ষা দান করিত। হারাণচন্দ্র সেখজীকে ধরিয়া পড়িল। তাহার অনুরোধে জমীর তাহার পুত্রটীকে আপন পাঠশালায় লইতে সম্মত হইল। হারাণ কুড়ানচন্দ্রকে জমীর গুরুর হাতে সমর্পণ করিয়া তাহার শিক্ষা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইল।

কুড়ান প্রত্যহ প্রাতে পাঠশালায় যায়। সেখান হইতে বাটী আসিয়া স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া বৈকালে আবার যায় এবং অল্প বেলা থাকিতে বাটীতে আসে। গুরুজী তাহাকে বড় ভাল বাসেন। ছেলেটী বড় শান্ত ও গুরুর নিতান্ত অনুগত। গুরু যখন যাহা আদেশ করেন, বালক তদ্দণ্ডেই তাহা সম্পন্ন করে।

একদিন সকালে কুড়ান পাঠশালায় গিয়াছে। অনেক বেলা হইল, তবু তাহার দেখা নাই। জননী রন্ধনাদি করিয়া বসিয়া আছে। হারাণ ভাত খাইতে আসিয়া দেখিল, পুত্র তখনও পাঠশালা হইতে প্রত্যাগমন করে নাই। সে আহার না করিয়া তাড়াতাড়ি জমীর গুরুর পাঠশালায় গেল। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিল, একখানি মাদুরের উপরে শুইয়া কুড়ানচন্দ্র ছট্ ফট্ করিতেছে। বিষণ্ণ ভাবে গুরু তাহার মাথার কাছে বসিয়া আছে। আরও চারি পাঁচটী বালক তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। হারাণ শুনিল, একটু আগে কুড়ানের দুইবার ভেদ ও একবার বমি হইয়াছে। গুরুজী তাহাকে কর্পূরের আরক খাওয়াইয়া দিয়াছেন। হারাণ কাছে যাইয়া ডাকিল, "কুড়ান! বাবা আমার!" কুড়ান পিতার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার রক্তবর্ণ নিস্তেজ চক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি দেখিয়া হারাণের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। জমীর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "হারাণ! তুমি ভাবিও না, যে আরক খাওয়াইয়াছি, খোদার ইচ্ছায় কুড়ান উহাতেই ভাল হইয়া যাইবে। আমি এখনই তোমার কাছে লোক পাঠাইতেছিলাম, তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, এখন ইহাকে বাড়ী নিয়া যাও আমিও সেখানে যাইতেছি।'

হারাণ, পুত্রকে বুকে করিয়া গৃহে লইয়া গেল।

প্রস্তুত অন্ন পড়িয়া রহিল, কাহারও তাহা মনে রহিল না। স্বামী স্ত্রী অনাহারে পীড়িত পুত্রের মাথার কাছে বসিয়া অনিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। হারাণের স্ত্রী মনের এইরূপ অস্থিরতার মধ্যেও স্বামীকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল। স্বামী যে মুখের ভাত ফেলিয়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই, কিন্তু হারাণ কোন মতে আহার করিতে সম্মত হইল না।

ক্ষুদ্র পল্লী, কেবল ইতর লোকেরই বাস। হিন্দুর মধ্যে দুই চারি ঘর কৈবর্ত্ত ও নাপিত আছে। চিকিৎসক গ্রামে আদৌ ছিল না। জমীর সেখ হাকিমি মতে চিকিৎসা করিত। কুইনাইন, ক্যাম্ফর প্রভৃতি দুই একটী ইংরেজী ঔষধ তাহার কাছে থাকিত। এক কথায় জমির সেখ সেই ক্ষুদ্র পল্লীর 'নেটিব ডাক্তার'। কাহারও সামান্য একটু অসুখ হইলেই জমীরের কাছে আসিত, জমীরও বিনা বাক্যব্যয়ে ঔষধ দিত। তাহাতে কাহারও উপকার হইত, কাহারও হইত না। কিন্তু সকলেই বৃদ্ধ সেখজীকে সম্মান করিত।

জমীর সমস্ত দিন হারাণের বাড়ীতে বসিয়া আছে। ঔষধও চলিতেছে কিন্তু উপকার কিছুই হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে জলের মত ভেদ হইতেছে। বমিও দুই একবার হইয়াছে। বালক ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কথা কহিবার আর শক্তি রহিল না। পিপাসায় কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, গাত্রদাহ এবং পিপাসার যন্ত্রণায় বালক ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। এই ভাবে রাত্রি কাটিল। যখন প্রভাত-অরুণ পূর্ব্বদিক লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়া উদয় হইতেছিল, সেই মুহূর্ত্তে হতভাগা হারাণ ও তাহার চির-দুঃখিনী পত্নীর মস্তকে বজ্রাঘাত পতিত হইল, তাহাদের অন্ধের নড়ি, জীবনের বন্ধন, কুড়ানচন্দ্র তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি হারাণের স্ত্রী আর সহ্য করিতে পারিল না। অনাহার-ক্লিষ্টা, শীর্ণ-শরীরা অভাগিনী উচ্চ আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

সকাল হইতে মেঘ করিয়া ছিল, বেশ এক পসলা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। হারাণের অভাগিনী পত্নী এখনও সেই ভাবে পড়িয়া আছে। তাহার মূর্চ্ছাপনোদনের জন্য সকলে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু জ্ঞান সঞ্চারের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। দুই তিন জন লোক হারাণকে ধরিয়া বসিয়া আছে।

৮

জমীর সেখ এবং হারাণের আত্মীয়-বর্গের ইচ্ছা ছিল, বালকের দেহ অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা হয়। সকলেরই সেই মত ছিল, কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি আসায় তাহাদের সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। সকলেই উৎসুক ভাবে

বৃষ্টি থামিবার প্রতীক্ষা করিতেছে, অকস্মাৎ প্রাঙ্গণে পতিত বস্ত্রাচ্ছাদিত বালকের দেহ যেন একটু নড়িয়া উঠিল। সকলের সোৎসুক দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল। হঠাৎ পরিষ্কার স্বরে বস্ত্রের মধ্য হইতে 'মা' 'মা' শব্দ হইল। সকলে চমকিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে হারাণের স্ত্রী ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিতেছিল। তাহার কর্ণে সেই শব্দ প্রবেশ করিল। সে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া ছুটিয়া বালকের নিকটে গেল। ইত্যবসরে বালক যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। জননী বুকের ধন বুকে তুলিয়া আনিল। কুড়ানচন্দ্র মাতার স্নেহময় বক্ষে মস্তক রাখিয়া কিছুক্ষণ স্থির ভাবে রহিল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া আসিল। এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা মুখে মুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। অনেক দূর হইতে কুড়ানচন্দ্রকে দেখিতে লোক আসিতে লাগিল।

৯

একটু স্থির হইয়া কুড়ান বলিতে লাগিল—

"মা! আমার কি হইয়াছিল, কিছুই মনে নাই। আমার মনে হয়, আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুমের ঘোরে একটি বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন আমি শুইয়া আছি, এমন সময়ে দুটো ষণ্ডা গুণ্ডার মত লোক আসিয়া হঠাৎ আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। আমি কত কাঁদিলাম কিছুতেই তাহারা ছাড়িয়া দিল না। দুইজনে আমাকে ধরিয়া নিয়া চলিয়া গেল। অনেক দূর গিয়া বড় একটা বাড়ী দেখিলাম। তেমন বাড়ী মা! আমি কখনও দেখি নাই। সেই বাড়ীর মধ্যে আমাকে টানিয়া নিয়া গেল। সেই বাড়ীর মধ্যে বেশ একটা বড় ঘরে এক খানা উঁচু চৌকীর উপরে মুখে দাড়ী মোটা একজন বাবু বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া লোক দুটাকে বকিতে লাগিলেন। সব কথা আমার মনে নাই। সেই বাবু নিজের হাতে আমার বাঁধন খুলিয়া দিলেন, আর আমার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কুড়ান! তুমি বাড়ী যাও।"

আমি বলিলাম, "বাবু! আমি যে পথ চিনি না, আপনার লোক আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে," বলিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তখন বাবু আমার হাতে একটা পাকা কলা দিয়া বলিলেন, "এইটী খেতে খেতে যাও, তা হ'লেই তুমি বাড়ী ফিরে যেতে পারবে।"

আমি সেই কলা খাইতে খাইতে আসিলাম। কলাটী যেই শেষ হইল, অমনি আমার ঘুম ভাঙ্গিল।"

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, কুড়ানের পদাঙ্গুলি হইতে সর্ব্ব শরীরে কাল কাল ডোরা ডোরা দাগ পড়িয়া গিয়াছে। এই দাগ তাহার শরীরে অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল।

১০

এই ঘটনার পরে অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। হারানচন্দ্রের মনের বাসনা সফল হইয়াছে। কুড়ানচন্দ্র পুলিশে ভর্ত্তি হইয়া কার্য্যদক্ষতাগুণে জমাদারের পদে উন্নীত হইয়াছে। হারাণ চন্দ্র ও তাহার পত্নীর সুখের দিন আসিয়াছে। কুড়ানচন্দ্র জমাদার হইয়া সম্মান ও অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। হারাণ কুড়ানের বিবাহ দিয়া সুন্দরী বধূ ঘরে আনিয়াছে।

কুড়ানচন্দ্রের স্বভাবের গুণে সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সকলেই তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিত "যমালয়ের ফেরত।"

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।
বারুইপাড়া, খুলনা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লেডী হার্ডিঞ্জ প্রদত্ত বৃত্তি—লেডী হার্ডিঞ্জ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণা যে সকল ছাত্রী দিল্লীতে স্ত্রীলোকগণের মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে সম্মত হইবেন, বর্ত্তমান সময় হইতেই এইরূপ আঠার জন স্ত্রীলোককে মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

লেডী হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ--

আগামী শীত ঋতুতে স্ত্রীলোকগণের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য দিল্লীতে মেডিকেল কলেজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হইবে এরূপ শুনা যাইতেছে।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীগণের বিশেষ বৃত্তি—

বর্ত্তমান বৎসরে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে :—

২৫৲ টাকা বৃত্তি--মলিকোহেন, লরেটো হাউস।
২০৲ " কিটী গুহ ডায়োসেসন কলেজ।
২৫৲ ,, চারুশীলা রায় বেথুন কলেজ।

ব্রজমোহন দত্ত রচনা পুরস্কার—

"পারিবারিক জীবনে নারীজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ" বিষয়ে রচনা লিখিয়া আমাদের সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবী প্রথম স্থান অধিকার করায় ৪৫৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

কলিকাতার পরিসর বৃদ্ধি—

সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল ও ভবানীপুর রোড কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এইরূপ শুনা যাইতেছে

পুরাতন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল এখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বলিয়া অভিহিত হইবে।

রাজপরিবারে বিবাহ—

বিলাতের সেণ্ট জেম্‌স চেপল ভজনালয়ে প্রিন্স আর্থার অব কনটের সহিত ডাচেস অব কাইরোর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভলটার্ণো জাহাজ দগ্ধ—

গত ২রা অক্টোবর ভলটার্ণো নামক একখানি সাত শতাধিক আরোহীপূর্ণ জাহাজ উত্তর আমেরিকার হাউলকাক্স সহরে যাত্রা করিতেছিলে। অকস্মাৎ জাহাজের নিম্ন দেশে অগ্নি লাগিয়া জাহাজখানি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এই সঙ্গে যে কত লোকের বিনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

পণ

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি ডাক্তার্ সেনের পসার জমিয়া গিয়াছিল। লোকটার গুণও অনেক ছিল। তিনি একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন। তাঁহার সহৃদয়তাও যেমন, সৌজন্যও সেইরূপ। কত দরিদ্রকে যে তিনি বিনা ফিতে দেখিতেন ও বিনা ব্যয়ে ঔষধ দিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিলাত ফেরত সমাজেও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। কোন ডিনার বা টি পার্টিতে তিনি বাদ পড়িতেন না। রমণী ও পুরুষ সকলেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ।

কিন্তু পসার সত্ত্বেও মাসিক আয়ে তাঁহার খরচ কুলাইত না। তিনি দস্তুর মত সাহেব। তাঁহার সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম, ডাইনিংরুম, সিটিংরুম, কনসল্টিংরুম প্রভৃতি ত ছিলই, আবার তদনুযায়ী খানসামা, বেহারা, বার্ব্বুর্চীও তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। বাজে খরচও তাঁহার বিস্তর ছিল। বাজী রেখে ব্রীজ খেলা, ঘোড়দৌড়ে টাকা দেওয়া প্রভৃতি ছোট বড় রকমের জুয়া খেলায় তাঁহার অনেক টাকা খরচ হইত। ইহার উপর ডিনারের খরচ, মদের খরচ ত আছেই। সুতরাং আয় অপেক্ষা তাঁহার ব্যয় অধিক হইত। কর্জ্জের হিসাব তাঁহার ক্রমাগতই বাড়িতেছিল।

যাহা হউক, এ সব কিছু তিনি বড় গ্রাহ্য করিতেন না। দিনের বেলায় নিজের কাজে এবং সন্ধ্যাকালে বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ ও স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার সময় নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যাইত। অর্থের দুশ্চিন্তা তাঁহাকে কখনও ব্যাকুল করে নাই।

কিন্তু ইদানীন্তন তিনি বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। একদিন ডিনারের পর সুস্নিগ্ধ বাসন্তী পূর্ণিমার উচ্ছসিত জ্যোৎস্নালোকে তিনি মিস্ করের সহিত নির্জ্জন

উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে সহসা সেই কুসুম সুবাসিত মৃদু বাহিত বসন্ত বায়ু ও দীপ্ত স্বর্ণময় জ্যোৎস্না-কিরণ তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিল। অবশ্য মিস্ করের সগর্ব্ব সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট মুখশ্রীও অনেক দিন ধরিয়াই ইহার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। কিন্তু সেই উজ্জ্বল দিন, চন্দ্রালোক, স্নিগ্ধ সান্ধ্য-সমীরণ ও তরুণীর উদ্বেলিত রূপের তরঙ্গ একত্রে মিলিত হইয়া ডাক্তার সেনকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল। ইউরোপে যুনানী রূপসী-গণের তীব্রতর কটাক্ষ তিনি হেলায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে জগজ্জয়ীরূপ কত বার তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু কোনদিন তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে পারে নাই। সে দিন অকস্মাৎ তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আর পরিণাম চিন্তার অবসর রহিল না।

এইরূপ করিয়াই কিছুদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু ক্ষত হৃদয়ের তীব্র বেদনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। এ দিকে মিষ্টার করের দৃঢ় পণ যে অর্থহীনের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন না। তাঁহার বিশ্বাস যোগ্য ব্যাঙ্কে যাহার টাকা গচ্ছিত নাই সে তাঁহার সর্ব্বগুণ-সম্পন্না কন্যার যোগ্য পাত্র হইতে পারে না।

কিন্তু ডাক্তার সেনের তহবীল যে একেবারে শূন্য। সঞ্চিত অর্থের ত কথাই নাই, অপিচ তিনি ঋণে আবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে মিষ্টার করের নিকট তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব কর ধৃষ্টতা মাত্র।

অতি নিরাপদে, নির্ব্বিঘ্নে ও মনের সুখে তিনি জীবন যাপন করিতেছিলেন, কোথা হইতে আপদ জুটিয়া তাঁহার মনের শান্তি হরণ করিল। মিস্ করের স্নিগ্ধরূপও ভুলিতে পারেন না, তাহার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করাও সুকঠিন। তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

দৈবের কৃপায় সিঙ্গাপুরে তাঁহার একটা বড় রকমের কাজ যুটিয়া গেল। তথায় তাঁহাকে তিন বৎসর কাল অবস্থান করিতে হইবে। অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিবার ইহা একটি অব্যর্থ সুযোগ বুঝিয়া ডাক্তার সেন কর্ম্মটী গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, তহবিল পূর্ণ করিয়া তিন বৎসর পরে তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন মিস্ করের করগ্রহণ সম্বন্ধে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিবে না। এই আশাতেই তিনি আজ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশ যাত্রার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

বিদায়ের দিনে প্রণয়ী যুগলের মধ্যে তেমন উচ্ছাসের আড়ম্বর দেখা গেল না। উভয়েরই হৃদয় বোধ হয় পূর্ণ ছিল। ডাক্তার সেন কহিলেন, "আমি আজ চলিলাম। আবার তিন বৎসর পরে দেখা হবে।"

মিস্ কর। যাবার আগে তুমি আমার নিকট একটি প্রতিজ্ঞা কর।

ডাক্তার সেন। কি প্রতিজ্ঞা?

মিস্ কর। শপথ কর যে সেখানে তুমি কখনও জুয়া খেল্‌বে না, আর বেশী মদ খাবে না।

ডাক্তার সেন। আচ্ছা! তোমার কাছে আজ আমি শপথ কচ্ছি, যে আমি আর কখনও জুয়া খেল্‌ব না বা মদ খেয়ে মাত্‌লামী কর্‌ব না।

মিস্ কর। আজ ১০ই ফাল্গুন, তুমি আবার কবে আস্‌বে?

ডাক্তার সেন। ৩ বৎসর পরে ১০ই ফাল্গুন আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। যদি তা না হয়, তবে জেন আমি মরে গেছি।

মিস্ কর। আমি তোমার জন্যে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব।

ডাক্তার সেন। এত দিন অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বে?

মিস্ কর। নিশ্চয়ই! তিন বৎসর দেখিতে দেখিতে কেটে যাবে।

ডাক্তার সেন। তুমি আমাকে চি লিখ্‌বে না?

মিস্ কর। চিঠিপত্র না লেখাই ভাল। কি বল?

ডাক্তার সেন। বেশ তোমার একটা কিছু স্মরণ চিহ্ন আমাকে দাও।

তাহার চম্পকাঙ্গুলী হইতে হীরক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া মিস্ কর কহিল, "এই নাও—এই আমার স্মরণ চিহ্ন।

ডাক্তার সেন। এটা তোমাকেই আবার ৩ বৎসর পরে আমি ফিরাইয়া দিব। তুমি আমার স্মৃতি কিছু রাখবে না?

মিস্ কর। তোমার ফটো ও কতক গুলি চিঠি আমার কাছে আছে। তোমাকে আমি কখনও ভুলিব না।

মিস্ করের কণ্ঠস্বর যেন বাষ্পরুদ্ধ হইল।

মিস্ করের কথা মিথ্যা হয় নাই। দেখিতে দেখিতে ৩ বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ডাক্তার সেনের জাহাজ খিদিরপুর ডকে আসিয়া নোঙ্গর করিল।

ডাক্তার সেনের নিকট-আত্মীয় বড় কেহ ছিল না। তিনি একেবারে বেঙ্গল ক্লাবে গিয়া উঠিলেন। বহুদিন পরে পুনর্ব্বার সেই ক্লাব-গৃহে প্রবেশ করিবার সময় উল্লাসে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। স্বদেশ যে কত আদরের সামগ্রী প্রবাসীরাই তাহা বুঝিতে পারে।

ক্লাবে সকলেই তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। পুরাতন বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, অপরিচিত, সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল—শত সহস্র প্রশ্নে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ডাক্তার সেনও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বন্ধুবর্গের স্নেহ ও পরিচিত জনের প্রীতি যে কত মধুর আজ তিনি আবার নূতন করিয়া অনুভব করিলেন। তাঁহার মনটা বসন্তের দক্ষিণ বায়ুর মতই উল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু তখনও তাঁহার সুখ পূর্ণ হয় নাই। তখনও তাঁহার হৃদয় মিস্ করের সংবাদ শ্রবণে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বিদায় কালীন বালিকার

সেই সজল নয়ন যুগল এখনও তাঁহার অন্তরে জ্বলিতেছিল। তাহার প্রতিজ্ঞা-বাণী "আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।" এখনও তাঁহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে ছিল। মিলনের আর দুই দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু আর অপেক্ষা করা যায় না।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিলে দলে দলে মেম্বরগণ আসিতে লাগিল। ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক-লাইট স্ফুরিত হইল, কক্ষে কক্ষে তাস খেলা চলিতে লাগিল। হুইস্কী ও সোডা লইয়া খানসামা দল ঘুরিতে লাগিল।

ডাক্তার সেন স্তম্ভিত হইলেন। সেই সব—সবই পরিচিত। আজও সেই বৃদ্ধ যোগেশ বাবু কম্পিত হস্তে তাস খেলিতেছে. আজও সেই যতীন ফাঁকি দিয়া তাস বদলাইবার অবসর খুঁজিতেছে। তিন বৎসরের পরেও আজ তিনি কাহারও কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

কেহ কেহ তাঁহাকে তাস খেলিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু তাসের নেসা তিনি অনেকদিনই কাটাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞা কেহ টলাইতে পারিল না। তিনি দর্শক শ্রেণীভুক্ত হইয়া কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল। ডাক্তার সেন সম্মুখে ফিরিতেই আগন্তুক কহিলেন, "ডাক্তার সেন, অনেকদিন পরে আপনাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। আপনি বোধ হয় আমাকে চিন্‌তে পা র্‌চেন না?"

ডাক্তার সেন অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "ধন্যবাদ! কিন্তু"—অপরিচিতকে তাঁহার চেনা চেনা মনে হইল, কিন্তু তাঁহার নাম মনে আসিল না।

আগন্তুক। আপনি এখনও আমাকে চিনিতে পারিলেন না? আমার নাম—

ডাক্তার সেন বলিয়া উঠিলেন, "মনে পড়েচে আপনার নাম মিষ্টার চক্রবর্ত্তী।" আগন্তুক কে তাহা এতক্ষণ পরে ডাক্তার সেনের মনে পড়িল।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তীকে তিনি মিষ্টার করের বাড়ী দুইবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন ইনি জনৈক ব্রীফ্‌হীন ব্যারিষ্টার। ইহাঁর সহিত ডাক্তার সেনের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল না।

ডাক্তার সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা! আপনাকে কি আজ আমি খিদিরপুর ড'কে দেখেছিলাম? চলুন আমরা ও ঘরে বসিগে।" তাঁহারা উভয়ে পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চেয়ারে উপবেশন করিয়া মিষ্টার চক্রবর্ত্তী কহিলেন "আপনি ভুল ক'রেচেন। আমি আজ বাড়ী হইতেই বাহির হই নাই।"

ডাক্তার সেন বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বেশ মনে আছে তিনি ভদ্রলোকটীকে আজ ড'কে দেখিয়াছিলেন।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। যা'হক আপনি কিন্তু চোরের মত খুব চুপি চুপি পলাইয়াছিলেন? এত লুকোচুরী কেন করলেন?

ডাক্তার সেন বিরক্ত হইলেন। অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে এ সব প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাই উচিত। তিনি নীরবে রহিলেন।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী পুনরায় কহিলেন, "কই আপনি আজ তাস খেলছেন না? তাস খেলা ছেড়ে দিয়েছেন না কি?" তাঁহার প্রশ্নে বিদ্রূপের স্পষ্ট আভাস লক্ষিত হইল।

ডাক্তার সেন অধিকতর বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন লোকটা কি অসভ্য! অল্প গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "না আজ রাত্রে আর তাস খেল্‌ব না।"

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। হাঁ। এ জুয়া খেলা না খেলাই ভাল। বড় বিশ্রী নেশা! আমি বে' করে তাস খেলা ছেড়েছি। আমার স্ত্রীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি যে আর কখনও তাস স্পর্শ কর্‌ব না।"

ডাক্তার সেন নীরবে রহিলেন। আগন্তুকের সহিত আলাপ শেষ হইলেই তিনি রক্ষা পান। কিন্তু চক্রবর্ত্তী সাহেব ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ডাক্তার সেন। আপনাকে আর কি বলিব! আমার স্ত্রী একটী রত্ন! আপনি বোধ হয় তাঁহাকে জানেন?"

ডাক্তার সেন ভাবিলেন, লোকটা বোধ হয় উন্মাদ। অপরিচিতের নিকট অম্লান বদনে সে তাহার পত্নীর গুণব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছে।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানেন। তাঁহার নাম মিস্ কর, মিস্ করকে আপনার মনে নাই?

ডাক্তার সেনের হস্তস্থিত চুরুট কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সহজ ভাবে কহিলেন, "বিপিন বাবুর বাড়ীর কেহ না কি?"

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। হাঁ বিপিন বাবুর একমাত্র কন্যা ললিতা।

অকস্মাৎ ডাক্তার সেনের হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি শুনিলেন মিষ্টার চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনি কি ললিতা করকে ভুলে গেছেন? কখনই নয়। কেমন বলুন, আমি কি সৌভাগ্যবান নই?"

অন্তরের দ্বন্দ্ব সবলে দমন করিয়া জড়িত কণ্ঠে ডাক্তার সেন কহিলেন, "নিশ্চয়ই। হাঁ হাঁ, আমার মনে আছে। আপনি কতদিন বিবাহ করিয়াছেন?"

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী ডাক্তার সেনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু তাহার কোন বাহ্যিক লক্ষণ না দেখাইয়া কহিলেন, "প্রায় এক বৎসর হইল। প্রথমে ললিতা কোন মতেই বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই। তবে সে সময় আমি আমার মামার একটা বিষয় পাই। তখন বিপিন বাবু ও ললিতার আর অমত রহিল না।"

চক্রবর্ত্তী সাহেবের সব কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। ডাক্তার সেন ভাবিতে লাগিলেন "এ কি সম্ভব? ললিতা বিবাহিতা—এ ও কি কখন হ'তে পারে? স্ত্রীলোকেরা এতই মিথ্যাবাদী, এত দূর অবিশ্বাসী হ'তে পারে? সে বলিয়াছিল

যে 'আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। কিন্তু এ তিন বৎসর মাত্রও সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। অর্থের মায়া কি এতই প্রবল? কথার কি কিছুই মূল্য নাই? প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী!"

রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার শিরায় শিরায় যেন আগুণ ধরিয়া গেল। তাঁহার হস্ত ষ্টিবদ্ধ হইল, চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী বলিতেছিলেন,"আমরা বিবাহের পরই ডেরাডুনে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কি সুন্দর সে স্থান! ডাক্তার সেন, আপনি যদি কখনও"—

"লোকটা কি প্যাচ প্যাচ করে বক্‌চে?" এই ভাবিয়া বিরক্ত হইয়া ডাক্তার সেন বলিয়া উঠিলেন, "আজ ওঠা যাক্, দেরি হ'য়ে গেছে!"

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। এখনও বেশী রাত হয় নাই, এখন ১১টা মাত্র। আপনি ত অবিবাহিত! আপনার এত তাড়াতাড়ি কেন? আমারও বড় তাড়াতাড়ি নাই। বিপিন বাবু ললিতাকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে গেছেন। চলুন না, ডাক্তার সেন, খানিক ক্ষণ ব্রীজ খেলা যাক্? এক দিন খেল্‌লে দোষ কি?"

এই কথায় ডাক্তার সেন হাসিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন পাছে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই আশঙ্কায় ললিতা পুরীতে পলায়ন করিয়াছে। মিথ্যা! মিথ্যা! সব মিথ্যা! এ 'জগৎ মিথ্যা! এ ভালবাসা মিথ্যা! আমি নির্ব্বোধ! এরূপ স্ত্রীলোককে কেন আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম?

চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "চলুন, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী! আমার আর কোন আপত্তি নাই।"

যাইতে যাইতে ডাক্তার সেনের আবার হাসি আসিল। এ কি উপহাসের কথা ললিতার নিকট তাঁহারা উভয়েই এই সপথ করিয়াছিলেন যে আমরা আর তাস কখনও স্পর্শ করিব না। আজ উভয়েই সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া তাস খেলিতে চলিয়াছেন, অদৃষ্টের এ কি নিদারুণ পরিহাস!

রাত দুটার পর তাস খেলা ভাঙ্গিল। অনেক দিন পরে মদ্যপানে ডাক্তার সেনের নেশা চড়িয়া গিয়াছিল। টেবিলে মাথা রাখিয়া তিনি সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িলেন, চাকরেরা তাঁহাকে জাগাইতে সাহস করিল না।

অতি প্রত্যূষেই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন কতকগুলা টাকা ও নোট টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। এ কি! কাল রাত্রিতে আমি তাস খেলাতে এ গুলি জিতিয়াছি না কি?

তাঁহার তখন স্মরণ হইল তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া জুয়া খেলিয়াছেন ও মদ্য পান করিয়াছেন।

কিন্তু যাহার নিকট তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন সে যখন অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী হইল, তখন তাঁহার প্রতিজ্ঞায় তিনি আবদ্ধ থাকিবেন কেন? ললিতা যদি এক জনের হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়া বিবাহ করিতে পারে, তবে কি তিনি জুয়া খেলিতে পারেন না?

তিনি উপরে শুইবার ঘরে চলিয়া গেলেন। ট্রাঙ্ক খুলিয়া ললিতার কতক-গুলি চিঠি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কেবল ললিতা প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি বিসর্জ্জন করিতে তাঁহার মন সরিল না। উৎকট মন-বেদনায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

তিনি আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। শয্যায় শুইয়া পড়িয়া তিনি পুনরায় নিদ্রিত হইলেন। ডাক্তার সেনের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যাহার জন্য তিনি বন্ধুবান্ধব ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন, যাহার মূর্ত্তি এই বিদেশে তিন বৎসর কাল তিনি সযত্নে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, যাহার সহিত মিলিত হইবার আশায় কত আগ্রহে, কত আনন্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই রমনী কি না আজ অবিশ্বাসিনী, মিথ্যাবাদিনী! সে কি না আজ আপনাকে ভুলিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া অর্থলোভে অপরকে পতিত্বে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

জগতের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল, মানবের প্রতি তাঁহার ঘৃণা হইল। অন্তরের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য তিনি ব্যসনে ও উৎসবে গা ঢালিয়া দিলেন। মদ্য পানে তিনি কয়েক দিবস বিভোর হইয়া রহিলেন।

কিন্তু এ সব আমোদে তাঁহার আর আসক্তি ছিল না। কিছু দিন পরে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আমোদ প্রমোদ একেবারেই ত্যাগ করিলেন।

ক্রমে কলিকাতা সহর তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। হৃদয়ের জ্বালা কোন মতে হ্রাস হইল না। তিনি পুনরায় বিদেশ গমনে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন।

অচিরেই আর একটা চাকুরী মিলিয়া গেল। তিনি যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যাত্রা করিবার দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার বাল্য বন্ধু মিষ্টার ঘোষ তাঁহাকে ইভনিং পার্টিতে (Evening Party) নিমন্ত্রণ করিলেন। বন্ধুর সে নিমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

যথা সময়ে বন্ধু-গৃহে পৌঁছিয়া তিনি বহু লোকের সমাবেশ দেখিলেন। কলি-কাতায় যত বিলাত ফেরত আছে সেদিন প্রায় সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পুরুষ ও রমণীতে মিষ্টার ঘোষের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ও বৃহৎ উদ্যান পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কথাবার্ত্তা, গল্প গুজব, হাস্যপরিহাস চলিতেছিল। ডাক্তার সেন কোন মতে সে আমোদে যোগ দিলেন। তাঁহার সুমধুর সম্ভাষণে সকলকে অপ্যায়িত

করিলেন। কিন্তু বাহ্যিক আনন্দ তাঁহার বড় ভাল লাগিতেছিল না।

মানুষের সঙ্গ তাঁহার আর ভাল লাগে না। তিনি নির্জ্জন স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, উদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটা ঝোপের সম্মুখে একখানি বেঞ্চ রহিয়াছে। সেই স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। তিনি তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।

গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সে দিন ভোজনাগারে প্রভাতকালিন আহারের সময় গিলিয়ান তাহার বন্ধু মেরিয়নের একখানি পত্র পাঠ করিতেছিল। পত্রে মেরিয়ন লিখিয়াছিল "তোমরা যে প্রহসন অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে তাহাতে সে অতিমাত্র শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর এ প্রহসন অভিনয়ে আবশ্যক নাই। এক্ষণে গিলিয়ান গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুক।" দুই মাস গত হইল গিলিয়ান নর্টন হলের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে। এই দুই মাস কাল প্রত্যেক দিন সে কি উদ্দেশে নর্টন হলে আগমন করিয়াছে তাহা এলান লরসবাইকে বলিবার সঙ্কল্প করিত। কিন্তু প্রত্যেক দিনই সে সঙ্কল্প সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া পড়িত। এইরূপে দুই মাস চলিয়া গিয়াছে আজও সে এলান লরসবাইকে কিছুই বলিতে সক্ষম হয় নাই। এখানে কিন্তু ইতিমধ্যে এলান লরসবাই ও গিলিয়ানের মধ্যে বেশ একটি প্রীতিময় বন্ধুত্বের ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। অদ্য মেরিয়নের পত্র পাঠ করিয়া সে বুঝিতে পারিল যে আজ তাহাদের প্রহসন অভিনয়ের শেষ যবনিকা পাতের সময় আসিয়াছে। আজ সে নিশ্চয়ই এলান লরসবাইকে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য ও সে কে এই সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবে, এবং তাঁহার ন্যায্য উত্তরাধিকারিত্বের অধিকার গ্রহণ করিতে তাঁহাকে সম্মত করাইবে। তাহা হইলে এলান লরসবাই তাঁহার নর্টন হলের জমীদারি একটা জেলার মধ্যে পরিগণিত করিতে সক্ষম হইবেন এবং তাঁহার দীর্ঘকালের সংগ্রাম ও নিরাশা সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে।

যখন গিলিয়ান তাহার বন্ধু মেরিয়ানের পত্র পাঠে ও এলান লরসবাইকে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবার সঙ্কল্প গঠনে প্রবৃত্ত ছিল, সেই সময় এলান লরসবাই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা বলিলেন—

"কেন তোমার এ দীর্ঘ নিশ্বাস ?" গিলি-

য়ান তাহার উত্তরে বলিল আমি আপনার কথাই ভাবিতেছি। আমি আপনাকে কোন কথা বলিতে চাহি । গিলিয়ানের এই কথায় এলান লরসবাইয়ের মুখ একটি কোমল মৃদু হাস্যে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আমার মালি জেমসকে! বাগানের মাটি তৈয়ার করিবার আজ্ঞা দিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি। তাহার পর আপনার সমস্ত কথা শ্রবণ করিব।

এই বলিয়া তিনি জানালা খুলিয়া তাঁহার বাগানের দিকে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

জন্ম ও মৃত্যু তত্ব।

ভৌতিক জগৎ।

ভৌতিক জগতে এক জাতীয় জীব হইতে অপর জাতীয় জীবেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে, কারণ সমগুণ কর্ম্ম প্রভাব সমান শক্তিকে আশ্রয় করে। মনুষ্য দেহে বহুরূপধারী নানা জীবের আবাস ভূমি। কোনটী উদ্ভিজ্জ, কোনটী পাশব, কোনটী কীট, পতঙ্গ বা পক্ষী সম্বন্ধীয়, আমরা জীবিতাবস্থায় ভাব ও প্রকৃতি দ্বারা সেই সকল উপলব্ধি করিতে পারি। মনুষ্য দেহের অবসানে যে জীবের যে লোকে যেমন ভাবে দেহ লাভ হউক না কেন দেহটীর ভৌতিক পরমাণু হইতেও অন্যান্য জীব সমষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা কোন কোন সদ্য শ্মশান ভূমিতে নীল বুহ্নার নামক বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাই। উক্ত নীল বুহ্নার শ্মশান ভিন্ন জন্মে না। মনুষ্যের শুক্র মাংস বা কোনরূপ ধাতুর বীজাণু হইতে উহার উৎপত্তি হয়। ঐ বৃক্ষের পুষ্প নীল, পত্রও নীল। তন্ত্র শাস্ত্রের মতে উহার গুণও আবার মনুষ্যের সন্তান উৎপাদক। যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না, অথবা যে সকল পুরুষের বীর্য্যে কীটাণু সকল নষ্ট হইয়া উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়াছে, বন্ধ্যা স্ত্রী ঐ বৃক্ষের পুষ্প-রস ঋতুকালে স্তন্য দুগ্ধ সহ সেবন করিলে বীর সন্তানের উৎপাদন হইয়া থাকে। কোন কোন কীট মরিয়া বৃক্ষ হয়, সে বৃক্ষের অপর কোন বীজ বা পুষ্প হয় না। ঐ সকল কীটপুষ্পের পক্ষে যেমন অপকারক, উহার বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপাদন হয় উহার গুণও আবার দেহের পক্ষে তেমন পরিপাক জনক।

এই প্রকারে উদ্ভিজ্জ হইতে কীটের ও কীট হইতে উদ্ভিজ্জ দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই প্রকার নানা ভাবময় ভৌতিক জগতে এক স্থানেই বিষ ও অমৃত দেবতা ও রাক্ষস, স্বর্ণ ও লৌহ, হিরক ও কয়লা, মানব ও পশুপক্ষ্যাদির উৎপাদন হইয়া থাকে। যে গব্য দুগ্ধ দ্বারা তুমি

পুষ্ট হও ও যাহা তোমার পক্ষে পরম রসায়ণ ও সার বলিয়া তোমার বিশ্বাস সেই গব্য দুগ্ধ কোন তুচ্ছ শুষ্ক তৃণের সংযোগে কোথায় গিয়া কি ভাবে তোমার নিকট উপস্থিত হয় তাহা কে জানে। সুতরাং জাগতিক রাসায়নিক ক্রিয়া বা সৃষ্টিকার্য্যই নিরন্তর অসীম ক্ষমতা বা কৌশলের অধীন। তোমার মনুষ্য জ্ঞানে তাহার ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা অতি সামান্য মাত্র। আমাদিগের হিন্দু কেমিষ্ট্রী বা রসায়নিক শাস্ত্রে বৃক্ষের রসে সুবর্ণ প্রস্তুত হয়। পাথুরিয়া কয়লা হইতে হিরক প্রস্তুত হয়। একই মৃত্তিকার একই স্থানে একরূপ রসের অধীন তিক্ত, কটু, মধুর নানা গুণাশ্রিত নানা রসের উৎপত্তি হইতেছে। এক মানবী যোনিতে এক প্রকার শুক্র শোণিতের অধীন ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, চোর, দস্যু, দরিদ্র ও রাজা বা রাজ চক্রবর্ত্তীর জন্ম হইতেছে। দেহস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ এক দেহে একই স্থানে থাকিয়া কাহারও প্রকৃতি বিশেষে সুস্থ জীবনের কারণ, কাহারও বা রোগ, শোক, বিকার বা বিধ্বংশের হেতু হইয়া আছে। সুতরাং অজ্ঞেয় প্রকৃতি ঋতু, পক্ষ্যাদিযুক্ত কালের অধীন এইরূপ ভাব গুণ সংযুক্ত জীবান্তরের সৃষ্টি করিতেছে। মনুষ্য সেই অজ্ঞেয় প্রকৃতির মূল স্বরূপ কালকে আয়ত্ব করিতে না পারিলে কদাচ ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না। এই সর্ব্বময় প্রত্যক্ষ ভৌতিক জগৎ একমাত্র বিশাল কার্য্য কারণের অধীন। সেই কার্য্য কারণ একটি অতি মহান্ ও অদৃশ্য সূক্ষ্ম শক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিত্য নিয়মিত সৃষ্টি, সংহার ও পরিবর্ত্তনের পথে ধাবিত হইতেছে।

সর্ব্ব শক্তিমান সকলের আধার পরমাত্মা উহার মূল বিষয়। আমরা সেই সর্ব্বগত অদৃশ্য মঙ্গলময় পরম সহায়কে জ্ঞান দ্বারা অনুভব ব্যতিত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। আমাদিগের এই ভূতাশ্রিত বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। অন্তর্জ্জগতের অন্তর্শক্তি ব্যতীত বাহ্য জগতের প্রবল শক্তির পরিচালন হইতে পারে না। পেষন যন্ত্র কার্য্য পরিচালনের জন্য যেমন জল ও অগ্নির সহযোগে অন্তর্বাষ্পের আবশ্যক, করে, সেই রূপ বাহ্য জগৎ পরিচালানার্থ আভ্যন্তরিক অনন্ত ঐশি শক্তির আবশ্যক। বাহ্য অপেক্ষা অন্তর্জ্জগৎ আরও বিস্তৃত। বাহ্যভূতের মধ্যে পৃথ্বিভূতই সর্ব্ব নিম্ন ও সর্ব্বব্যাপক। পৃথ্বিভূতাপেক্ষা ক্রমশঃ জলাদিভূত এক এক গুণাশ্রয়হীন এবং ব্যাপকতায় তিন তিন গুণ করিয়া অধিক। মন সর্ব্ব উপরি এবং সকল ভূতকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই মনই দার্শনিকদিগের মতে বাহ্য জগত সৃষ্টির কারণ বলিয়া কথিত হয়। এই মনের নেতা জীবাত্মা। জীব কর্ম্ম বশে মনে লিপ্ত হইয়া ভূতপক্ষে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু নির্লিপ্ত পরমাত্মা বিনা জীবাত্মার কোন শক্তিই কার্য্যকারী হয় না। জীব ব্যবচ্ছেদীয় মনের সহকারে ইন্দ্রিয় বিকারে

লিপ্ত হইয়া শব্দাদি বিষয় সৃষ্টি ও উপভোগ করে, পরমাত্মা অবস্থাদির শক্তি লইয়া নিশ্চল ও নির্লিপ্ত ভাবে তাহাতে অবস্থিতি করেন।

নূতন সংবাদ।

১। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে এবার কংগ্রেসের সময় পার্লেমেণ্টের সদস্য মিঃ ফিলিপ মরেল ও মিঃ জোসেফ কারাচিতে উপস্থিত থাকিয়া কংগ্রেসে যোগ দিবেন।

২। আগামী ২৬,২৭ ও ২৮শে এই তিন দিন করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়কে ডাক্তার অব লিটারেচার ও ফিলজফী উপাধি প্রদত্ত হইবে। রবি বাবু পাইবেন ডাক্তার অব লিটারেচার, রাসবিহারী বাবু পাইবেন ডাক্তার অব ফিলজফী।

৪। সম্প্রতি ফরাসী দেশে ম্যাডাম ডুগানিয়া নাম্নী এক ফরাসী মহিলার উদ্যোগে এক দল মহিলা পল্টন প্রস্তুত করিবার আয়োজন হইতেছে।

৫। বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদিগের পরামর্শদাতা মিঃ আর্ণল্ডের সহকারীর কার্য্যে ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র নির্ম্মল চন্দ্র সেন নিযুক্ত হইয়াছেন।

৬। আমেরিকার সিকাগো নগরে অনেক স্ত্রীলোক পোষাক পরিচ্ছদের নিমিত্ত বৎসরে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। একশত ধনী মহিলা পরিচ্ছদের জন্য বৎসরে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় করেন। দশ হাজারের ও অধিক স্ত্রীলোকের প্রত্যেকের বার্ষিক পরিচ্ছদের ব্যয় ১৫ হাজার টাকা। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে আমেরিকার স্ত্রীলোকগণ পোষাকের জন্য কি অপরিমিত অর্থ অপব্যয় করেন।

৭। সম্প্রতি আমেরিকায় একটা ষাঁড় বিক্রীত হইয়াছে উহার মূল্য ২ লক্ষ ৪০৲ হাজার টাকা এই ষাঁড়টা নাকি জগতের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহার নাম পেলারমো।

৮। অনেক বিখ্যাত ডাক্তারের মত এই যে দন্তের পীড়া হইতে নাকি ক্রমশঃ চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৯। সম্প্রতি ফরাসী রাজ্যে এক নূতন আইন প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। এই আইন প্রচলিত হইলে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীর কোন ডাক্তার দরিদ্র শ্রমজীবীদিগের নিকট হইতে একদিনের জন্য ১৷০ এক টাকা চারি আনার অধিক দর্শনী লইতে পারিবেন না। বিশেষ বিশেষ শ্রমজীবী সভার সদস্যগণ পীড়িত হইলেও ডাক্তার-

দিগকে এই দর্শনীতেই রোগ পরীক্ষা ও চিকিৎসা করিতে হইবে।

১০। দিল্লীতে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্য মিউনিসিপ্যালিটী সুবৃহৎ জলাধার নির্ম্মাণ করিয়া বালুকা ও বাষ্পীয় যন্ত্রাদির সাহায্যে বিশুদ্ধ জল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বামারচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

সাজায়ে আজিকে শিশির চন্দনে
আনিনু "দ্বিতীয়া" ডালি।
সারা বরষের মঙ্গল বাসনা
হরষে দিব যে ঢালি।
সুখের হিল্লোল হৃদয় মাঝারে
তুমি গো বহায়ে দিলে।
নব আশা কত উদিছে আজিকে
সব দুঃখ ব্যথা ভুলে॥
তোমার আশায় রহি অপেখিয়া
সুদীর্ঘ বরষ ধরি।
পূজিবে আজিকে কতই আগ্রহে
ভগিনী পরাণ ভরি॥
তাই—আদরে তোমারে বরিতে এসেছি
নিরমল প্রীতি সাথে।
পুণ্য "দ্বিতীয়া" তুমি হে ধন্য
দাও শুভাশীষ মাথে॥

সুনীতি ভাদুড়ী—
কেশবধাম
বেনারস সিটি।

তন্ময়।

(১)

বিভো! নাহি বা রহিল আপন ধরায়
তুষিতে যতনে প্রাণ,
নাহি বা লভিনু স্নেহাদর দয়া
বিভব সুযশঃ মান।
নাহি বা হইল হাস্য কলরোলে
মুখরিত এ দীন গেহ,
তা বলিয়া নাথ! তব করুণায়
রহে কি বঞ্চিত কেহ?

(২)

বিশ্ব মহা যোগে প্রদানি আহুতি
সার ধন আপনার,
আজি হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে
রাজ তুমি প্রেমাধার
একা অসহায় অনাথ ভাবিয়ে
কাঁদি না'ক আর ভয়ে,
তোমাতে বিশ্বাস নির্ভর যাহার
সে যে গো! অশনি সহে।

(৩)

গোধুলি উষায় খুলিয়া হৃদয়
বিহগ কাকলী সনে,
তব নাম গান করি নীতি দেব
পুলকে আপন মনে।
প্রীতি ফুল্ল মুখে সাধি নিজ কাজ
বিকচ কুসুম সম,
দিবা শেষে নীতি তব পদে ঢলি
পড়ে গো হৃদয় মম

(৪)

মোহ ছলে কভু হারাইয়ে তোমা
গভীর আবেগ প্রাণে,
বিরহ কাতর তরঙ্গিনী প্রায়
ছুটে চলি তব পানে।
তব দয়া প্রেম মমতা আদর
করেছে পাগল মোরে,
যদিও বেঁধেছে কঠিন নিগড়ে
বাঁধ প্রভো! চিরতরে।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।
চট্টগ্রাম।

কি চাই ?

(১)

আমি চাই শুধু, একখানি প্রাণ,
করুণা পুরিত তায়
সংসারের শত, প্রলোভন মাঝে,
সে চিত কভু না ধায়॥

(২)

সম্পদে বিপদে, না হয় অধীর,
সমান উভয় জ্ঞান।
পরের বেদনা, নিরখি যেন গো,
সতত কাঁদে সে প্রাণ

(৩)

বিপন্ন যে জন, উদ্ধারিতে তারে,
সঁপিতে পারি গো প্রাণ
এই মম আশ, পূর্ণ কর প্রভু,
নাহিক বাসনা আন।

(৪)

হিংসা দ্বেষ ভুলি, পর উপকারে,
সতত মানস রয়।
হোক মহা শত্রু, পড়িলে বিপদে,
বিভেদ জ্ঞান না হয়॥

(৫)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ফল আদি,
কিছুই চাহি না আর।
যেন পর হিতে, পারি গো সঁপিতে,
এ ক্ষুদ্র জীবন ভার॥

(৬)

আর যেন প্রভু, দিনান্তে তোমায়,
বারেক ডাকিতে পাই।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ, ধরম করম,
কিছুই প্রার্থনা নাই॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ
বারুইপুর খুলনা

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 604. December, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৪ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩২০। ডিসেম্বর, ১৯১৩ } ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

পণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঝোপের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঝোপের অপর পার্শ্ব হইতে কণ্ঠধ্বনি শুনিলেন, "কিছু খান না, এই গরমে আপনার তৃষ্ণা পায় নাই? কিছু মনে করবেন না, আমি বড় তৃষিত, সরবৎ পান করিয়া এখনি আসিতেছি।"

কি সর্ব্বনাশ এ যে মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠস্বর! তিনি এখানে কেন?

পরক্ষণেই উত্তর হইল, "আপনি যান, আমি এখানে অপেক্ষা করিব।"

সহসা ডাক্তার সেনের রক্তস্রোত বন্ধ হইল, নিশ্বাস প্রশ্বাস থামিয়া গেল। এ স্বর ত ভুলিবার নয়—এ কণ্ঠ, এ বাণী এখনও তাঁহার অন্তরে প্রতি নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। এ যে অবিশ্বাসিনী ললিতার কণ্ঠস্বর।

তিনি বুঝিলেন মিষ্টার চক্রবর্ত্তী তাঁহার পত্নীর সহিত নির্জ্জনে গল্প করিতে-ছিলেন। ললিতার প্রতি তাঁহার আর মমতা রহিল না। তাহার প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্য, তাহার বীণা-নিন্দিত কণ্ঠস্বর মিথ্যা চাতুরীতে পূর্ণ। সে এখন পরস্ত্রী, ডাক্তার সেনের মন-ভাব কঠিন হইল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

অল্পক্ষণ পরেই চক্রবর্ত্তী সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। আপনি সরবৎ খান নাই বেশ করে'ছেন। বড় মিষ্ট। আপনার ভাল লাগিত না। আচ্ছা! প্রবোধের কাছে ঐ যে মেয়েটী দাঁড়িয়ে আছে? ওকে অপরিচিত বলে মনে হ'চ্ছে।

ললিতা। হাঁ। উনি মিষ্টার বসুর কন্যা। ওঁরা দার্জ্জিলিংএ থাকেন। সম্প্রতি এখানে এসেছেন।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। বটে! সে দিন ক্লাবে আপনার একজন পুরাতন বন্ধুর

সহিত দেখা হ'ল। তিনি সম্প্রতি সিংঙ্গাপুর থেকে ফিরেছেন।

ললিতা। আমার বন্ধু।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। হাঁ, মনে নাই কি? ডাক্তার সেন, আপনাদের এখানেত প্রায়ই আসতেন। বেচারার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে? আমি ত তাঁ'কে প্রথমে চিনতেই পারি নাই। মদ খেয়ে খেয়ে তাঁর শরীর জীর্ণ হয়েছে। শুনিলাম তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করেছিলেন কিন্তু জুয়া খেলে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। এখানে যখন ছিলেন, তখন তিনি এতদূর অধঃপাতে যান নাই।

রমনী কোন উত্তর করিল না। অল্পক্ষণ থামিয়া মিষ্টার চক্রবর্ত্তী ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "আপনাকে এত বিবর্ণ দেখাচ্চে কেন? ডাক্তার সেনের কাহিনী শুনে আপনার কষ্ট হল না কি? এমন জান্‌লে আমি বল্‌তাম না। কিন্তু তিনি আপনার সহানুভূতির যোগ্য নন। তাঁর মতন লম্পট মাতাল বড় দেখা যায় না। তাঁ'কে ভুলে যান।"

তৎপরে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে অনুচ্চ স্বরে মিষ্টার চক্রবর্ত্তী ধীরে ধীরে কহিলেন, "কিন্তু আমি কি আপনার স্নেহের যোগ্য নই? আপনি কি এতই নির্দ্দয়? আপনার স্নেহকনা কি আমি পাব না, মিস্ রায়? এই এক বৎসর ধরে আপনার আশাতেই আমি বেঁচে আছি।"

এ কি! ডাক্তার সেন স্তম্ভিত হইলেন। মিস্ রায়! এ কি সম্বোধন? কেনই বা মিষ্টার চক্রবর্ত্তী ললিতার সহিত "আপনি" "আপনি" বলিয়া কথা কহিতেছেন? তাঁহার অন্তরে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। আবেগে তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল। তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময় ললিতা স্থির অবিকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "মিষ্টার চক্রবর্ত্তী! কেন আবার আপনি এ সব কথার উত্থাপন করিতেছেন? আপনাকে ত আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে আমি আপনাকে কখনও বিবাহ করিতে পারিব না।"

হস্ত প্রসারিত করিয়া মনের উদ্বেগে মিষ্টার চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিলেন, "কখনও না"—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না। আপনি কি জানেন না আমি আপনাকে কত ভাল বাসি!

দিন দিন আপনার প্রতি আমার প্রেম গভীরতর হইতেছে। এ জগতে বোধ হয় আমার মত কেহ—"

কথা আর সমাপ্ত করা হইল না। ডাক্তার সেন এত অধীর হইলেন যে তিনি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর সম্মুখীন হইলেন।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী অবাক্ হইয়া ভাবে কহিলেন, "ডাক্তার সেন যে!"

ডাক্তার সেন বজ্রগম্ভীর অথচ অনুচ্চ স্বরে কহিলেন, "হাঁ—ডাক্তার সেন! তোমার বর্ণিত লম্পট, মাতাল, নেশাখোর, পশু ডাক্তার সেন নহে—চেয়ে দেখ, এ জীবন্ত সচেতন পুরুষ। আমার এত শক্তি আছে যে তোমাকে পিসিয়া ফেলিতে পারি

প্রবঞ্চক! মিথ্যাবাদী! তোমাকে আমি আজ উপযুক্ত শিক্ষা দিব।”

ভীতা কম্পিতা ললিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার সেনের সম্মুখীন হইয়া কহিল, “না, না” আপনারা মারামারি করিবেন না।”

পশ্চাৎ সরিয়া গিয়া ডাক্তার সেন বলিলেন, “মাপ করিবেন, মিস্ রায়! কিন্তু দেখুন এই প্রবঞ্চকের ব্যবহার দেখুন। আমি যে দিন কলিকাতায় ফিরিয়া আসি সে দিন এই লোকটা ক্লাবে গিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে আমার কাছে বলিয়াছিল যে আপনি তাঁহার বিবাহিত পত্নী। এমন কি, বিবাহের পর আপনারা ডেরাদুনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, এই মিথ্যাবাদী এত দূর মিথ্যা কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। আজ আবার আপনার নিকট আমার অযথা নিন্দা করিতেছে। এ শঠের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত।”

ললিতা স্থির দৃষ্টিতে একবার মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর প্রতি অবলোকন করিল। দেখিল, তিনি ভীত হইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে অবনত মস্তকে বসিয়া আছেন। রমণী তৎপরে ডাক্তার সেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “যাক! যাহা হইবার হইয়াছে, আপনি ওঁকে আর কিছু বলিবেন না।”

ডাক্তার সেন। আপনার অনুরোধে এ মিথ্যাবাদিকে আজ অব্যাহতি দিলাম।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী এবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কপট হাসি হাসিয়া কহিলেন, “আমার সকল আশা শেষ হইল। শুনুন, ডাক্তার সেন! আমি মিথ্যাবাদী সন্দেহ নাই। কিন্তু মিস্ রায়কে লাভ করিবার আশাতেই আমি মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিলাম আপনি যদি মিস্ রায়ের আশা ত্যাগ করেন এই ভরসাতেই আমি ক্লাবে গিয়া আপনার নিকট মিস্ রায়ের বিবাহের কথা বলিয়াছিলাম। আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে আমি খিদিরপুর ডকেও গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সব চেষ্টা আজ বিফল হ'ল। বিদায়।”

এই বলিয়া মিষ্টার চক্রবর্ত্তী সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে পর ডাক্তার সেন কহিলেন, “ললিতা! তুমি যদি বারণ না করিতে তবে এ নীচ মিথ্যাবাদিকে আজ আমি হত্যা করিতাম।”

ললিতা! তবু তুমি ভেবেছিলে যে এরই জন্য আমি তোমাকে ভুলে গেছি, ও তোমার কাছে অবিশ্বাসিনী হইয়াছি।

ডাক্তার সেন। এ লোকটা এমন নিঃসঙ্কোচে মিথ্যা বলিয়াছিল যে আমি প্রতারিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সে দিন তোমার কাছে না আসাতে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অবিশ্বাসী ভেবেছিলে। কেমন?

ললিতা গ্রীবা আন্দোলন করিয়া কহিল, “না! আমি ভেবেছিলাম যে তোমার কোন বিপদ হ'য়েছে। সেই জন্য তুমি আসিতে পার নাই। তাঁহার চিন্তাতেই যে ললিতার দেহ শুখাইয়া গিয়াছে এ

কথা বুঝিতে ডাক্তার সেনের বিলম্ব হইল না। তিনি পুনরায় কহিলেন, "কিন্তু চক্রবর্ত্তী যখন আমার নিন্দা করিতেছিল, তুমি নিশ্চয়ই তা'কে বিশ্বাস করেছিলে ?"

ললিতা। হাঁ! অতীতের কথা মনে ক'রে আমি কতকটা বিশ্বাস করেছিলাম।

ডাক্তার সেন। আমার নিন্দা শুনে আমার প্রতি তোমার ঘৃণা হয়েছিল ?"

ললিতা। না

ডাক্তার সেন। না ?

বিস্মিত হইয়া ডাক্তার সেন তাঁহার চিরবিশ্বস্থ প্রণয় প্রতিমাকে প্রেম পূর্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন।

ললিতা অনুচ্চস্বরে কহিল, বিদায়ের দিনের আমার শেষ কথা তোমার মনে আছে ?"

ডাক্তার সেন। বল কি ললিতা? সে কথা এখনও আমার কানে ধ্বনিত হচ্চে।

ললিতা। কি ? বল দেখি।

ডাক্তার সেন। 'আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।'

ললিতা। হাঁ। তিন বৎসর নয়, পাঁচ বৎসর নয়, আমি চিরকাল তোমার জন্য অপেক্ষা করিতাম। চক্রবর্ত্তীর কথা শুনে আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ভুলে গেছ। কিন্তু তবু তোমার প্রতি আমার ভালবাসা অক্ষুন্ন ছিল। রমনীর প্রেম যে কত গভীর তাহা পুরুষে বুঝিতে পারে না।

ডাক্তার সেন। ললিতা! প্রিয়তমে! পুরুষেরাও ভালবাসতে জানে? দেখ, চক্রবর্ত্তী যখন তোমার বিবাহের কথা বলিল, তখন আমি পাগলের মত হ'য়ে পড়েছিলাম। তোমার চিঠিগুলি ছিঁড়ে ফেল্লুম তোমার ফটো খানা পুড়াইলাম। কিন্তু তবু তোমাকে ভুলিতে পারিলাম না। আমি পুনরায় বিদেশ গমনে কৃত সংকল্প হয়েছি। কিন্তু তবু তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। তোমার প্রদত্ত আংটিটা ফেলে দিতে পারি নাই। কেমন বল পুরুষেরা ভালবাসতে জানে কি না ?"

ললিতা সে কথার আর উত্তর করিল না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।
ছাপরা।

ভাগ্যবতী রমণী কে ?

এই সংসারে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহে, কেহই দুরবস্থায় থাকিতে চাহে না। কিন্তু সকলেই সর্ব্ব প্রকার সৌভাগ্যের অধিকারী হয় না। এক এক জন এক এক প্রকার সৌভাগ্য করে, আবার হয়ত অপরবিধ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। অশিক্ষিত ও নীচমনা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে

প্রায়ই দেখা যায়, যে তাহারা কোন এক প্রকার সৌভাগ্যের অধিকারিনী হইয়া অন্যকে তদভাবে ঘৃণা করে। এই কারণেই সুরূপা কুরূপাকে, অলঙ্কারযুক্তা অনলঙ্কৃতাকে, ধনীর স্ত্রী দরিদ্রের স্ত্রীকে এবং বিদুষী মূর্খাকে ঘৃণার সহিত দেখে। মনের প্রকৃতিই অহঙ্কার, এই জন্য ঈশ্বর কাহাকেও সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।

কোন কোন নারী সৌভাগ্যবতী বলিয়া অহঙ্কৃতা নহেন, কিন্তু তাঁহারা অপর স্ত্রীলোকদিগকে ভাগ্যশীলা ভাবিয়া, নিজের দুরাবস্থার সহিত তাহাদের ভাল অবস্থার তুলনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠার ন্যায় অন্যের সম্পদে শুকাইয়া যাওয়াও ভাল নয়। কোন এক পণ্ডিত বলিয়াছেন "যদি নিজকে বড় বলিয়া মনে কর, তবে আরও বড়র দিকে দৃষ্টিপাত করিও, আর যদি নিজকে ছোট বলিয়া মনে কর তবে আরও ছোটর দিকে দৃষ্টিপাত করিও।" আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে ভাবিলে যদি দেখা যায় যে আম অপেক্ষা আরও ভাগ্যবতী আছে, তবে আর নিজকে বড় বলিয়া অহঙ্কার আসিতে পারে না। পক্ষান্তরে নিজকে দুরবস্থাপন্না বলিয়া বোধ করিলে যদি দেখা যায় যে আমা অপেক্ষা অধিকতর হীনাবস্থায় কেহ আছে, তাহা হইলে নিজকে ছোট ভাবিয়া মনে যে কষ্ট হয়, তাহা আর আসিতে পারে না

সুখী কে? এই বিষয়ের উত্তরস্থলে নানাস্থানে নানাভাবে সুখের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে লিখিত আছে "ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের মূল আরোগ্য।" অতএব আরোগ্য বা ব্যাধিহীনতাই সুখ। কোন মহিলা যদি নিজকে এবং পতি পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় সকলকে সুস্থদেহ দেখেন তাহা হইলে তিনি সুখে আছেন, ইহা ভাবুন বা না ভাবুন, বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে তিনি তখন সুখের অধিকারিণী। শারীরিক সুস্থতা যে সর্ব্ব সৌভাগ্যের নিদান ইহা কি আর বলিতে হয়? কোন আত্মীয় বা পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনি ভাল আছেন ত?" ইহার অর্থ এইরূপ "যে শারীরিক সুস্থতা সর্ব্ব সৌভাগ্যের মূল, আপনি সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত নহেন ত?"

কিন্তু একটী কথা আছে "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং" শরীর থাকিলেই ব্যাধি আছে। অজ্ঞানতা, অনভ্যাস বা অমনোযোগ বশতঃ অনেকগুলি স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা রোগগ্রস্ত হই। জল বায়ুর দোষে এবং সংক্রামক রূপেও আমরা অনেক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হই। সুতরাং পীড়া মনুষ্যের অনিবার্য্য। সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া গতায়ু হইয়াছেন, এরূপ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত খুব কম শুনিতে পাওয়া যায়।

আমাদের শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে আছে, যাঁহার প্রবাস দুঃখ নাই তিনিই সুখী। এরূপ সুখী গৃহস্থ বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে অতি বিরল। অনেক বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থই স্ত্রীলোকের সুখকরী অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধনার্জ্জনের জন্য প্রবাসে থাকেন। যে রমণী পতি পুত্র সহ একস্থানে থাকেন, সুতরাং স্থানান্তরে বাসজনিত অদর্শনের কষ্টে ব্যথিতা না হন তিনিই ভাগ্যবতী। বিদেশে বাস না করিয়া আত্মীয়গণ সহ একত্রাবস্থান করা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

যিনি ধনবান্ গৃহস্থের পত্নী বা নিজে ধনবতী এবং যখন যাহা অভিলাষ করেন, তখনই তাহা লাভ করিয়া মনের সাধ মিটাইতে পারেন, তিনিই ভাগ্যবতী। সকল গৃহস্থের ধনবান্ হওয়া অসম্ভব। যে গৃহস্থ ঋণ শূন্য তিনিও সুখী। অল্প অল্প সঞ্চয়ও সময়ে অনেক উপকারে আইসে। ঋণ দায় অপেক্ষা কষ্টের বিষয় এবং সঞ্চয়শীলতা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর নাই। গৃহিণী যদি মিতব্যয়শীলা হন তবে অনেক স্থলে দেখা যায় যে স্বামীর ঋণদায় ঘটে না এবং অবস্থানুসারে অল্পাধিক সঞ্চয়ও হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রে অমিতব্যয়শীলা গৃহিণী নিন্দনীয়া বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকে। অর্থের উপার্জ্জন অপেক্ষা রক্ষণ, ব্যয় ও সঞ্চয়েই অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন। যে পরিবারে গৃহস্থ অর্থোপার্জ্জন করিয়া গৃহিনীর হস্তে দেন এবং গৃহিণী ধর্ম্মোদ্দেশে, বিলাসিতায় এবং বিবিধ সাংসারিক ব্যয়ে অবস্থানুসারে মিতব্যয় করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন, তিনি বুদ্ধিমতী সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান দুরবস্থার দিনে সকল গৃহস্থের অবস্থানুসারে সঞ্চয় অসম্ভব হইলেও অন্ততঃ উপার্জ্জিত অর্থে বুঝিয়া চলিলে এবং ঋণ করিতে না হইলেই সে গৃহস্থকে সুখী বলা যাইতে পারে। কারণ ঋণদায় সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাগ্যের এবং সঞ্চয়শীলতা সকল সৌভাগ্যের নিদান।

যে রমনীর পুত্র পণ্ডিত, তিনি সৌভাগ্যবতী, এ বিষয়ে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বপণ্ডিতের একই অভিমত। আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলেন"বহুপুত্র ইচ্ছা করিবে। শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে বা এরূপও আছে যে "গুণবান্ এক পুত্রও ভাল।" শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে বা এরূপও আছে যে পুত্র না হওয়াও ভাল, কিন্তু মূর্খ পুত্র মাতা পিতার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর। শাস্ত্রের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উক্তিতে বোধ হয় যে পুত্রলাভ সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু পুত্রগণ যাহাতে শিক্ষিত হন, মাতা পিতা তদনুরূপ চেষ্টা করিবেন। পুত্র জন্মের পর অনেক প্রসূতি রোগাক্রান্ত হন, পুত্রের অকাল মৃত্যুতে মাতা পিতা অপরিসীম শোকাভিভূত হন, বহু পুত্র থাকিলে পুত্রদের মধ্যে কাহারও না কাহার পীড়া লাগিয়াই থাকে, অনেক পুত্রের মধ্যে সকলকেই সাধু ও বিদ্বান্ হইতে দেখা যায় না। এই সকল মনে

করিয়া বন্ধ্যানারীগণ পুত্র না হওয়ার কষ্ট দূর করিবেন। যে সকল স্ত্রীলোকের পুত্র বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, অরুগ্ন, পিতৃভক্ত সেই সকল পুত্রবতী নারী সৌভাগ্যবতী তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃত বিদুষী রমণী সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যের ভাজন তাহাতেও সন্দেহ নাই। নিজে বিদ্যাবতী হইলে তিনি পুত্র কন্যাদিগের সুশিক্ষা বিধানে বিশেষ মনোযোগী হইয়া থাকেন। বিদুষী রমনীগণ যাহাতে পিতৃ কুলের ও শ্বশুর কুলের গৌরব রক্ষা হয়, এবং কোন প্রকারে লোক সমাজে নিন্দনীয়া না হন, এইরূপ অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন, কাজেই দুরাশার অসীম যন্ত্রণা ভোগ করেন না। তাঁহারা হর্ষে ও শোকে একেবারে মোহিতা হইয়া পড়েন না, সকল অবস্থাতেই তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতা একই প্রকার থাকে। বাক্য, মন ও কার্য্যে তাঁহাদের অকপট ও সরল ব্যবহার দেখিয়া সকলেই তাঁহাদের বাধ্য হয়। ধর্ম্ম চিন্তা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সৎগ্রন্থপাঠ সাধু চরিত্রাদিগের সহিত সদ্ভাব প্রভৃতিতে তাঁহাদের মন দেবীর ন্যায় সদ্ভাবাপন্ন হয়। তাঁহারা অনর্থক কোন কার্য্যারম্ভ করেন না, অনর্থক কোন বাক্যব্যয় ও ধনব্যয় করেন না এবং অনর্থক সময়ক্ষেপ করেন না। তাঁহাদের মুখ প্রসন্ন, দৃষ্টি কুটীলতা বর্জ্জিতা, আলাপ মধুর, ব্যবহার অহঙ্কার শূন্য। তাঁহারা দিবা রাত্রির মধ্যে সময় বিভাগ করিয়া যখনকার যে কাজ তাহা তখন সম্পন্ন না করিয়া নিশ্চিন্ত হন না। তাঁহারা প্রতিদিন আত্ম পরীক্ষা করিয়া চরিত্রকে ক্রমশঃ দেবভাবাপন্ন করেন। এইরূপ বিদ্যাবতী ও চরিত্রবতী নারী প্রকৃত ভাগ্যশীলা সন্দেহ নাই।

বাসস্থানের দোষগুণ অনুসারে অনেক স্থলে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লাভ করিতে হয়। যদি এরূপ স্থানে বাস করা যায় যে তথায় উত্তম চিকিৎসক নাই, স্রোতস্বতী বা উত্তম জলাশয় নাই, তথায় উৎকট পীড়া হইলে নিরুপায় হইতে হয়, এবং দূষিত জলে স্নানও তাহা পানাদিতে অনেক পীড়ার সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন গ্রাম ব্যাঘ্র শূকরাদি হিংস্রজন্তু সমাকুল অরণ্যপূর্ণ বলিয়া যেমন ভয়ানক, কুটীল ও অসৎস্বভাব মনুষ্য-সমাকুল লোকালয় বলিয়া আবার তদপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ গ্রামে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নাই, সদুপদেশদানে সমর্থ সাধু চরিত্র ধার্ম্মিক নাই, অথবা বিদুষী ও ধার্ম্মিকা রমনী নাই, সুখ দুঃখের সময় আলাপ করিয়া শান্তি পাওয়া যাইতে পারে এরূপ সখী বা সখা নাই, এরূপ স্থান ভদ্র পুরুষ ও রমনীগণের পক্ষে সুখ জনক নহে। যেখানে প্রতিবাসিগণের মধ্যে ঈর্ষা, ঘৃণা ও শত্রুতা আছে, পরিবারস্থ সকলের মধ্যে অহর্নিশি কলহ লাগিয়া রহিয়াছে তথায় বাস করিলে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? উল্লিখিত দোষ সকল বর্জ্জিত স্থানে বাস করিলে অনেক দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা

পাইবার সুবিধা এবং সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে।

বিরক্তিকর ও অনাবশ্যক কার্য্য সকল ত্যাগ করিয়া কোন অভিমত সাধু বিষয়ে মনোনিবেশ করা অনেক স্থলে সৌভাগ্যের কারণ হয়। বিদ্যানুশীলন, ধর্ম্মচিন্তা, অন্যান্য শিল্পবিদ্যানুশীলন ইত্যাদি সদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে তৎকালে সুখের কারণও পরিণামে সৌভাগ্যের কারণ হয়। কিন্তু যদি অনিয়মিত বিলাসিতায়, সাধু নিন্দিত কুপুস্তক পাঠে ও শরীরক্ষয়কারী দুশ্চিন্তায় অধিক মনোনিবেশ করা হয়,তবে তাহাতে ভাগ্যলক্ষ্মীর আরাধনা করা হয় না, বরং করগত সৌভাগ্যকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়। কারণ ঐরূপ মনোনিবেশকে অলসতা রোগের এক প্রকার নিদান বলা যায়। আলস্য পরায়ণা নারী কখনও ভাগ্যবতী হইতে পারে না। আলস্য ত্যাগ করিয়া যে রমনী স্বকীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে অভিনিবেশশীলা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্যলক্ষ্মীও সখীর ন্যায় আসিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করে। সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম আবার গৃহস্থ বিশেষে নানা প্রকার। সেই সকলের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

অকপটাচার বা সরল ব্যবহার সৌভাগ্যদেবীর আরাধনার প্রধান উপকরণ। কি পিতৃকুলে, কি শ্বশুর কুলে, কি স্বামীর সহিত ব্যবহারে, কি সমবয়স্কা ও পরিচিতাদিগের সহিত আলাপে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার কপটতা শূন্য ব্যবহার অভ্যাস করিলে, নারীগণ স্বর্গবাসিনী দেবীর ন্যায় হৃদয়বতী হন। সৌভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্ব দিক হইতে তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করেন।

কি প্রকারে ভাগ্যবতী হইতে চেষ্টা করা যাইতে পারে, এবং তাহা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত কিনা সংক্ষেপে এই কথার উত্তর করিতে গেলে বলা যাইতে পারে "যে রমনীর সাধু ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট তিনিই ভাগ্যবতী।" সাধু ব্যবহারে পরিবারস্থ সকলের সন্তোষ জন্মাইতে হইলে প্রথমতঃ অলসতা ত্যাগ করিতে হয়। কিরূপ ব্যবহার কাহার প্রীতির কারণ হয় তাহা জানিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবার বুদ্ধি ও চেষ্টা দৃঢ়তর করিতে হয়, নিজের অভ্যাসগত কোন ব্যবহার গুরুজনদিগের বিরক্তির কারণ হইতেছে তাহা জানিয়া আপনার দোষ সংশোধন করিতে হয়। কাহারও কর্কশোক্তিতে বিরক্ত না হইয়া বাক্যসংযম, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে হয়। সকল অবস্থাতেই বিষণ্ণ ভাব, বিষণ্ণ ব্যবহার ও বিষণ্ণ মুখ ত্যাগ করিতে হয়।

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট তথায় সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য বিরাজ করে"। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে আছে যে গৃহস্থের ভার্য্যা প্রিয়া অর্থাৎ অনুকূলাচরণশীলা এবং মধুরভাষিনী সেই গৃহস্থই সুখী। পতি ও পত্নী

উভয়ের মধ্যে একের আচরণে অপর তুষ্ট হইলে এবং কর্কশ ব্যবহার ও কর্কশ বাক্য দ্বারা একে অন্যের মনঃকষ্ট না দিয়া সদয় ব্যবহার ও মধুর বাক্যে পরস্পরের প্রীতি জন্মাইতে পারিলে সেই পরিবারের সৌভাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বুদ্ধিমতী মহিলার পক্ষে স্বামীর অভিমতানুবর্ত্তন দুঃসাধ্য নহে। স্বামী কিরূপ আলাপে পরিতুষ্ট হন, কিরূপ আহারে তাঁহার রুচি, কিরূপ ব্যয়ে মুক্তহস্ত ও কিরূপ ব্যয়ে মিতাচারী, কোন সময়ে প্রয়োজনানুসারে কোন কোন দ্রব্য দ্বারা কিরূপ ভাবে তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, কিরূপ বেশভুষায় সজ্জিতা দেখিলে তাঁহার আনন্দ লাভ হয়, কোন সময়ে কোন কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিলে তাঁহার অভিমতানুসারে চলা হয়, গৃহ ও গৃহোপকরণাদি কিরূপে পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খলা যুক্ত দেখিতে তিনি ভাল বাসেন, স্থানান্তর হইতে ভবনে প্রত্যাগত হইলে কিরূপ শুশ্রূষায় তাঁহার তৃপ্তি বোধ হয়, এইগুলি বুঝিয়া লইয়া তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়। পতির নিষেধ বাক্য লঙ্ঘন না করিয়া উপদিষ্ট বিষয়ের আচরণই পতিকে বশীভূত করিবার মূল মন্ত্র। যেমন করিয়া বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করিলে সমস্ত বৃক্ষেই জল দেওয়া হয়, তেমনি সমস্ত সৌভাগ্যের মূল পতির প্রসন্নতা লাভের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সমস্ত সৌভাগ্যেরই কারণ হইয়া থাকে।

কোন নবপরিণীতা দুহিতাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময় যদি মাতা তাঁহাকে একটি মাত্র এইরূপ উপদেশ দেন যে সর্ব্বপ্রকারে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ও স্বামীর মতের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিবে তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় তাঁহাকে সকল উপদেশেরই সার কথা বলিয়া দেওয়া হয়। যিনি অকপট, সরল ও অনুকূল ব্যবহার দ্বারা সকলের প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা করেন সেই রমনীই ভাগ্যবতী হইতে পারেন।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম।
কাব্যতীর্থ ও পুরাণতীর্থ

বর-পণ।

বোধ হয় সকলেই জানেন যে যাহারা কন্যা বেচিয়া খায় তাহারা ভিন্ন সর্ব্বত্র কন্যার বিবাহ কালে কন্যাপক্ষ হইতে বরকন্যাকে যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করা হয়। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ বিবাহ মধ্যে মনুর মতে ব্রাহ্ম বিবাহই প্রশস্ত বলা হইয়াছে। সেই বিবাহ সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা

কন্যাবরের আচ্ছাদন ও পূজন পুরঃসর বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন অপ্রার্থী বরকে কন্যাদান" কার্য্য নিষ্পন্ন করাই শাস্ত্রের আদেশ। মহাভারতের যুগে রাজকুলের কন্যার বিবাহে বহুতর যৌতুক প্রদান করা হইত, এইরূপ উল্লেখ আছে। আদিপর্ব্বে দ্রৌপদীর বিবাহ কালে কথিত আছে "পরিণয় সম্পন্ন হইলে, দ্রুপদ রাজ পাণ্ডবদিগকে বহুবিধ ধন, পর্ব্বতের ন্যায় মহোন্নত একশত হস্তী, মহার্হ বেশভূষা বিভূষিত একশত দাসী এবং সুবর্ণালঙ্কৃত ও সুবর্ণ গ্রহোপেত অশ্ব চতুষ্টয় যোজিত একশত রথ প্রদান করিলেন। সুভদ্রা হরণ অধ্যায়ে উক্ত আছে, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া খাণ্ডব প্রস্থে গমন করিলে, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রার জন্য "কন্যা-ধন স্বরূপ" বহুতর যৌতুক লইয়া সেখানে গিয়াছিলেন। বিরাট পর্ব্বে উত্তরার বিবাহ স্থলে বর্ণিত হইয়াছে "মৎস্যরাজ বিরাট জামাতাকে প্রীতি পূর্ব্বক সপ্ত সহস্র অশ্ব, দ্বিশত হস্তী, ভূরিধন, রাজ্য, বল কোষ প্রদান করিলেন।"*

সেই পুরাতন যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে বর্ত্তমান যুগে বহুদিন হইতে এ দেশে বিবাহ কালে কন্যাকে যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কার এবং জামাতাকে বরাভরণ ও বরসজ্জা দিবার রীতি আছে। কন্যাসন্তান পিতৃ বংশে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলেও মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়-দিগের একান্ত স্নেহের পাত্রী, অতএব কন্যা ও জামাতাকে এইরূপ দান করা কেবল কর্ত্তব্য সম্পন্ন নহে, ইহাতে লোকের প্রাণের আবেগ হওয়াও স্বতঃসিদ্ধ।

মানব যখন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করে, যখন প্রাণের উচ্ছ্বাসে কোনও মঙ্গলজনক কর্ম্ম করে, তখন সে কাজ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ পূর্ব্বক নিজকে সৌভাগ্য-শালী বিবেচনা করে। তাহাতে তাহার মনের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু মানব যদি দায়ে পড়িয়া বা বাধ্য হইয়া কোনও কার্য্য সম্পন্ন করে, তবে তাহাতে তাহার আত্মপ্রসাদ অথবা চিত্তের শান্তি লাভ দূরে থাকুক, সে নিজকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য জীব মনে করে এবং তাহার মানসিক অবনতি হইতে থাকে।

অধুনা বঙ্গদেশ হইতে কন্যাপক্ষের স্বেচ্ছা প্রদত্ত কেবল কন্যা ও জামাতার বস্ত্রালঙ্কার, বরসজ্জা প্রভৃতি দ্বারা কন্যার বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয় না। বরপণ স্বরূপ নগদ টাকা বর অথবা বরপক্ষকে প্রদান করিতে হয়। এই জন্য কোথাও দুই তিন শত, কোথাও বহু সহস্র দেওয়া হইয়া থাকে। কন্যাপক্ষ বর মনোনীত করিলে, সেই বর বা বরপক্ষ যেরূপ অর্থ দাবী করেন, কন্যাপক্ষ যদি তাহা দিতে পারেন, তাহা হইলে বিবাহ ক্রিয়া সমাধা

* মহাভারত—মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ।

হয়। এইরূপ দায়ে পড়িয়া, বা বাধ্য হইয়া বরপণ প্রদান করিতে, এ দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের আত্মপ্রসাদ ও চিত্তের শান্তি বিনষ্ট হইতেছে। অধিকন্তু অনেককে পৈতৃক সম্পত্তি, বাসভবন, এমন কি গ্রাসাচ্ছদনের সংস্থান পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইতে হইতেছে। এই কার্য্যের পরিণাম আরও যে কি বিষময় হইবে, তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে!

ভারতীয় হিন্দু সমাজে কন্যার বিবাহ দেওয়া লোকের অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে চলিয়া আসিতেছে। বিবাহ যোগ্যা কন্যার বিবাহ না হইলে, ধনী ব্যক্তিদিগকে সমাজ কিছুদিন ক্ষমা করিতে পারেন কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে অনেক সামাজিক নির্য্যাতন সহিতে হয়। অর্থাভাব অথবা অন্যান্য কারণে পুরুষ যদি বিবাহ না করেন, তাহাতে তাঁহাকে লাঞ্ছিত বা সমাজচ্যুত হইতে হয় না, কিন্তু সামাজিক নিয়মানুসারে কন্যার বিবাহ অপরিহার্য্য হইয়াছে। এই কারণে একদা রাজপুতনা, মালব প্রভৃতি স্থানে রাজপুত জাতির মধ্যে এক ভয়ানক নৃশংস নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকাল হইতে রাজপুতদিগের কন্যার বিবাহ এত ব্যয় সঙ্কুল ছিল যে অর্থাভাবে অনেকে তুল্য মর্য্যাদাপন্ন পাত্রে কন্যাদান করিতে পারিত না, অথচ নিম্ন শ্রেণীস্থ পাত্রে কন্যার বিবাহ দিলে সমাজে বিশেষ রূপে অপমানিত হইতে হইত। সুতরাং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র রাজপুতগণের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইত। এই নিদারুণ বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাহারা যে রাক্ষসোচিত নৃশংস উপায় অবলম্বন করিত তাহা শুনিলে ভীত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহারা নবজাতা কন্যা সন্তানকে অনাহারে রাখিয়া অথবা লবণ বা অহিফেনাদি সেবন করাইয়া তাহাকে হত্যা করিত। হায়! এই নির্ম্মম নিয়ম বহুকাল পর্য্যন্ত রাজপুত জাতি মধ্যে প্রচলিত ছিল। মাতা পিতা যে কত স্নেহের ধন সোণার পুত্তলিদিগকে স্বহস্তে বধ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সামাজিক অভিমান এবং লোক লজ্জা মানবকে এমনই হৃদয়হীন ও পিশাচবৎ করিতে পারে! যাহা হউক পরিশেষে ভগবদ্ অনুগ্রহে যিনি ভারতের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী গণের প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধিরূপে ভারত মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই মহাত্মা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের এবং আরও কতিপয় মহাপ্রাণ দেশীয় ও ইংরেজের একান্ত যত্ন ও চেষ্টার ফলে এই নিদারুণ নিয়ম রহিত হইয়াছে।

হায় মাতৃ বঙ্গভূমি! তোমার অদৃষ্টে না জানি কত আছে? ভগবান তোমার অভাগিনী কুমারীগণকে রক্ষা করুন।

কৌলীন্য প্রথা হইতে এ দেশে প্রথম বরপণ প্রচলিত হয়। কিন্তু তাহা কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং এখনকার সহিত তুলনায় তাহার পরিমাণ ও সামান্য ছিল।

কৌলীন্য প্রথানুসারে কুলীন ব্রাহ্মণগণ কুল মর্য্যাদা সম্পন্ন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতেন। সুযোগ্য পাত্রে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, বরকে এক মোহর অথবা ষোড়শ মুদ্রা প্রদানের রীতি ছিল। বিবাহের পরে কুলীন ব্রাহ্মণ বধূকে পিত্রালয়ে রাখিয়া দিতেন। কুলীন কন্যাগণের ভাগ্যে প্রায়ই পতিগৃহে বাস হইত না। কুলীনেরা যখন শ্বশুরালয়ে যাইতেন তখন পত্নী অথবা শ্বশুর প্রদত্ত অর্থ "মর্য্যাদা" স্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরে পদধৌত ও পত্নী সম্ভাষণ করিতেন। তাঁহারা মর্য্যাদা না পাইলে আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিতেন এবং যতক্ষণ মর্য্যাদা না পাইতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্বশুর গৃহে স্নানাহার কিছুই করিতেন না। কুলীন ব্রাহ্মণগণ বহু বিবাহ করিতেন। সেই বিভদ্রার জন্য পরে যৌতুক ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত অর্থ লইয়া নতঃ তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এতদ্ভিন্ন যে সকল কুলীন "স্বকৃত-ভঙ্গ" হইতেন, অর্থাৎ কুলীন কন্যার পরিবর্ত্তে বংশজের কন্যা বিবাহ করিতেন, তাঁহারা কন্যা পক্ষ হইতে চারি পাঁচ শত, এমন কি সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন। কুলীন কন্যাগণ উপযুক্ত কুলশীল সম্পন্ন পাত্র না হইলে বিবাহিতা হইতে পারিতেন না। সেই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ষাটি, সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিতেন। সেই বয়সেও পাত্র মিলিলে, এমন কি বালক বর যুটিলে ও বৃদ্ধা কুমারীদিগকে তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হইত। নিতান্ত পাত্রাভাব ঘটিলে কুলীন কুমারীগণ চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়াই মানব লীলা সংবরণ করিতেন। এইসকল কার্য্যে সমাজ তাঁহাদিগের প্রতি কোনও দোষারোপ করিত না। কুলীন কন্যাগণ এবম্বিধ দুরদৃষ্ট লইয়া জন্মগ্রহণ করিত বলিয়া তাহারা ভূমিষ্ঠ হইলে সূতিকা গৃহে আনন্দধ্বনির পরিবর্ত্তে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইত। মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ তাহাদের মৃত্যু কামনা করিতেন। পরে মঙ্গল বিধাতা ভগবানের কৃপায় প্রাতঃস্মরনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ দেশ হিতৈষী মহাত্মাদিগের প্রভুত চেষ্টার ফলেও জন সমাজে সুশিক্ষা বিস্তার হওয়াতে এই অনার্য্যোচিত কৌলীন্য প্রথা অনেক অংশে নিবারিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এই কৌলীন্য প্রথা হইতে বঙ্গদেশে প্রথমে বরপণ প্রবর্ত্তিত হয়, এবং ঐ বরপণ পূর্ব্বে কেবল কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছিল, সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে নহে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, বঙ্গদেশে বর্ত্তমান বরপণ গ্রহণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমে ইহা প্রধানতঃ কলিকাতার মধ্যে প্রচলিত হয়, ক্রমশঃ সংক্রামক রোগের ন্যায় সমস্ত বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যদিও বরপণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যেই বিশেষরূপে প্রচলিত, তথাপি কায়স্থদিগের মধ্যেই ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক, এ কথা অনেকেই জানেন। বরপণে যেমন রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক,

বংশজ, কুলীন প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের পার্থক্য নাই, সেইরূপ উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ এবং কুলীন, মৌলিক ও বংশজ বলিয়া কায়স্থদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই সকলেই বরপণ লইতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথমতঃ এই বরপণ কৃতবিদ্য অর্থাৎ পাশ করা বরেরই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু এখন আর পাশ করা বর বলিয়া নহে, যাহার সামান্যরূপ ভরণ-পোষণের সংস্থান আছে, যাহার লেখা পড়ায় কিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞান আছে, যাহার সন্তানাদি না হইতেই প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, যে কৃত বিদ্য বা উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ (প্রৌঢ় হউক আর যুবা হউক), যে দুই চারিটী সন্তানের জনক হইয়া বিপত্নীক হইয়াছে, যে বর্ত্তমান কালে দরিদ্র হইলেও ধনীর প্রপৌত্র, যে নিজে দরিদ্র ও মূর্খ হইলেও কোন কৃতী, প্রথিতযশ ব্যক্তির শ্যালক, ভাগিনেয় কিম্বা তদপেক্ষা দূরতর সম্বন্ধীয় — ইহারা সকলেই বরপণ দাবী করিতেছে। অধিক কি পাঁচ শত বরের মধ্যে দুইজন বর যদি পণ গ্রহণ না করে তাহা হইলে সৌভাগ্য মনে করিতে হয়। এই দারুণ পণ প্রথা এ দেশে কেন উপস্থিত হইল ?

অতি পূর্ব্ব কাল হইতে এ দেশে কন্যা বিবাহের সময়ে লোকেরা সাধ্যানুসারে যৌতুকাদি প্রদান করিত, কিন্তু তাহাতে বর পক্ষ বিশেষ কোন দাবী করিতেন না। যেখানে পাত্রী বর পক্ষের মনোনীতা হইত সেখানে তাঁহারা কিছুই বলিতেন না, তবে কন্যা কালো বা কুৎসিত হইলে কন্যা-পক্ষ বস্ত্রালঙ্কার (কোথাও বা ভূসম্পত্তি) অপেক্ষা কৃত অধিক পরিমাণে দিয়া বর পক্ষের মনস্তুষ্টি করিতেন। কিন্তু এখন-কার দিনে দেখা যায় যে, কত স্থানে বর নিজে কন্যা দেখিয়া মনোনীত করিলেন, অভিভাবকেরা ঠিকুজী কোষ্ঠি মিলাইয়া "উত্তম মিলন" স্থির বুঝিলেন, তথাপি পণের নগদ টাকা কম হইল বলিয়া সেই বিবাহের সম্বন্ধ অচিরকাল মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল!— জল বুদ্বুদের ন্যায় জলে মিশাইল। অন্যত্র অধিকতর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সেই বর আনন্দের সহিত সেই স্থানেই বিবাহ করি-লেন! এখন কথা এই যে এ বরপণ এ দেশে কোথা হইতে উপস্থিত হইল ?

অনেকে বলেন, এই পণ প্রথা কন্যা পণের প্রতিক্রিয়া। কেন না বর ও কন্যার মধ্যে—পুরুষ ও স্ত্রী লোকের মধ্যে—পুরুষ সর্ব্বতোভাবে প্রবল। অতএব যে মূল্য দিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত, তদপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে পতি লাভ করাই স্ত্রী জাতির পক্ষে সমীচীন। এই যুক্তি বরপণের আংশিক কারণ হইলেও উহার মুখ্য কারণ স্বতন্ত্র। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে তাহার যেরূপ উপলব্ধি হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিতেছি।

অনেকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, বঙ্গ-বাসিদিগের অনুচিকীর্ষা বৃত্তি অতীব প্রবল। বঙ্গবাসির বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি যে দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ

করিতেছে. এই অনুচিকীর্ষা বৃত্তির প্রবলতা তাহার এক প্রধান কারণ। বর্ত্তমান কালে ইংরেজ আমাদের রাজা, অধ্যবসায়, সাহস, জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বাবলম্বন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, রাজনীতি ও বাণিজ্যে বর্ত্তমানকালে ইংরেজ প্রভূত ক্ষমতাশালী। ইংরেজী শিক্ষায় অনেক বিষয়ে বঙ্গবাসির মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় বিলাস-বিমুখতা, ইয়োরোপের চাকচিক্যপূর্ণ সভ্যতা-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। অনুচিকির্ষু বঙ্গবাসী বেশ-ভূষায় ও আচার ব্যবহারে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে সেই অনুকরণ-প্রিয় বঙ্গবাসী যখন জানিতে পারিল যে, যে ইংরেজ জাতিকে তাহারা "আদর্শ জাতি" বলিয়া মনে করিতেছে, সেই জাতি (পূর্ব্বানুরাগ প্রথা সত্ত্বেও) পত্নীর পিতৃপক্ষ হইতে প্রচুর ধন লাভ করে, অথবা সেইরূপে প্রচুর ধন লাভ করিতে পারিলে তবে পত্নী গ্রহণ করে * তখন তাহারাও সেইরূপ আরম্ভ করিল।

ক্রমশঃ

যামিনীর আত্মকথা।

সন্তানের প্রতি মায়া মাতার হৃদয়ে অদম্য। সে সময়ে ক্রোধের বশে পুত্রকে কটু কথা বলিয়া ভৎসনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, পুত্রের মুখ না দেখিয়া জননীর প্রাণে ভীষণ চিন্তাস্রোত বহিতে লাগিল।

আশায়, নিরাশায়, উৎকণ্ঠায় যেন ছটফট করিয়া কিয়ৎক্ষণ কাটাইলেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, যেমন সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণ ধরণীকে উত্তপ্ত হইতে উত্তপ্ততর করিয়া তুলিতেছিল, সেইরূপ মাতার হৃদয় পুত্র-বিরহে অধিকতর আকুল হইয়া উঠিল। সেই আকাঙ্ক্ষা বিক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ, লইয়া, একে একে গৃহ কর্ম্ম সকল সারিলেন বটে, কিন্তু অশ্রুবন্যা আর বাধা মানে না। কাজেই সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ নিরম্বু হইয়া বিরলে বসিয়া কেবল রোদন করিতে করিতে তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর চরণে নানাবিধ মানসিক করিয়া রাখিতেছেন। যেদিন হারানিধি ঘরে আসিবেন সেই দিনই প্রতিশ্রুত উপহারে দেবতাকে তুষ্ট করিবেন।

কষ্টে পড়িলে মানুষের মনে উপায়ও জাগিয়া উঠে। অবশেষে মাতার মনে এক কৌশল জাগিল। হঠাৎ উঠিয়া তিনি স্বামীর নিকট গমন। রাগে দুঃখে, ভাবনায়, উচিত, অনুচিত, অনেক আলাপ প্রলাপের পর, চাকরকে হেড মাষ্টারের বাঙ্গালাতে

* ব্যক্তি বিশেষের কথা আমাদের আলোচ্য নহে। সাধারণের কথাই বলিতেছি।

পুত্রের সংবাদের নিমিত্ত পাঠাইয়া পথ পানে চাহিয়া রহিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়, সাহেবের বিশ্রামাগারে এখনও দাস দাসী কেহ যাইতে সম্মত নহে। এদিকে প্রতীক্ষার প্রতি মূহুর্ত্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। যাহা হউক সুঘটনাক্রমে সেই সময়ে একটা টেলিগ্রাম লইয়া পিয়ন উপস্থিত হইল, সুতরাং আরদালি সেইজন্য হুজুরের নিকট যখন সংবাদ দিল সেই সময়ে প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসু ভৃত্যেরও কথা তাঁহাকে বলিল।

সাহেব একে দয়ালু স্বভাব তাহাতে ভৃত্য জানাইতেছিল যে তাহার প্রভু বাড়ীতে কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শুনিবামাত্র তিনি স্বয়ং বাহিরে আসিয়া চাকরকে কহিলেন তোমার বাবুর জন্য কোন ভয় ভাবনার কারণ নাই, কোন বিশেষ কাজে দুই চারি দিনের জন্য তাঁহাকে নিকটে পাঠাইয়াছি শীঘ্রই আসিবেন।" ভৃত্য আশ্বস্ত মনে আসিয়া কর্ত্রীকে এই সম্বাদ দিবামাত্র জননী একেবারে তেলে বেগুণে, জ্বলিয়া উঠিলেন। সন্তান বৎসলা এখন রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হেড মাষ্টার ও তাঁহার উদ্ধতন পুরুষ পর্য্যন্ত যথেষ্ট সম্মানিত করিয়া স্বামীকে কহিলেন তুমি যেমন ভ্যাবা গঙ্গারাম কিছু বোঝনা, সর্ব্বনাশ হয়েছে, ছেলেও গেল জাতও গেল, ঐ পোড়ার মুখো হেড মাষ্টার তাকে খৃষ্টান করবে বলিয়া কোথায় সরিয়ে দিয়েছে। এখনি যাও, আমার ছেলে এনে দাও নতুবা আমি এ প্রাণ রাখবো না।"

গৃহিণীর জ্বলন্ত বহ্নি সদৃশ উগ্ররূপ দেখিয়া নিরীহ ব্রাহ্মণ আরও কষ্টে পড়িলেন। স্বভাবতঃ তাঁহার প্রকৃতি শান্ত ও নম্র ছিল তাহার উপরে পুত্রের নিরুদ্দেশ হওয়াতে দুঃখ ও চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

স্ত্রীকে কোন উত্তর না দিয়া তিনি চাদর খানি কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন ও সোজা হেড মাষ্টারের বাঙ্গালায় উপনীত হইলেন।

সাহেব উহাঁকে দেখিবামাত্র আগমনের কারণ বুঝিতে পারিলেন। ঈষৎ হাস্য সহকারে করমর্দ্দন পূর্ব্বক কহিলেন বাবু, আপনার পুত্র টাকা উপার্জ্জন করিতে গিয়াছে, আপনি শীঘ্রই তাহার পত্র পাইবেন। আপনার স্ত্রীকে নিশ্চিন্ত করুন, উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই।"

"সে কি মহাশয়? সে যে ছেলে মানুষ সবে ষোল বৎসর বয়স সে টাকা উপার্জ্জনের কি জানে? ইহা কি সম্ভব?

আচ্ছা, আপনি যখন বলিতেছেন, আমি আপনার কথার উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। ঈশ্বর সর্ব্বত্র তাহাকে রক্ষা করুন" এই বলিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদ্যম ও উৎসাহ থাকিলে, মানুষের "উন্নতির পথে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে কষ্ট হয় না। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ।"

পিতা সেই দশটি টাকা পাথেয় লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি অতি কষ্টে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলেন। কেবল মাত্র হাতে তখন দুইটি টাকা আছে। কালের মহিমা আশ্চর্য্য! শতাব্দী প্রায় কাটিয়া গিয়াছে প্রকৃতির কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই সঙ্গে মানুষের কত উন্নতি অবনতি হইয়াছে। দেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়াছে। সেকালে দেশে পাশ্চাত্য বিদ্যার এত প্রভাব ছিল না, যৎসামান্য ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া লোকে কত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে? এখনকার কালে ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও লোকে তদুপযুক্ত অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ নহে। হেড মাষ্টার সাহেবের বন্ধুও একজন ইংরাজ। আগ্রায় ইঞ্জিনিয়ারী কার্য্য করেন।

পিতা অসম সাহস ও অধ্যবসায় বলে খুঁজিতে খুঁজিতে শিক্ষক মহাশয়ের বন্ধুর নিকটে উপস্থিত হইলেন।

একে পথের ক্লেশ, তাহাতে প্রায় অনাহারী, মলিন বেশ,মনের অবসাদে সে সময় তাঁহার চেহারাটি এমন হইয়াছিল যে তাঁহাকে ভদ্র সন্তান বলিয়া চেনা কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু গ্রহ সুপ্রসন্ন বলিয়া তাঁহাকে কেহ ভিক্ষুক,অনাথা,বা জুয়াচোর বলিয়া তাড়াইল না। তখনকার দিনে সকলে বাঙ্গালী জাতিকে আরও সম্মান ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখিত।

বেলা অবসান হইয়াছে, অস্তোন্মুখ রবি আকাশ লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছে। বৈকালিক সমীরণ বৃক্ষের পত্র দোলাইয়া মাঠে মাঠে শস্যের উপর লুটাইয়া পড়িতেছে। পক্ষিণী নীড়াভিমুখী,হইয়া কোমল কূজনে পক্ষীকে আহ্বান করিতেছে, "এস সখে, চল যাই,সন্ধ্যা এল বেলা নাই"। প্রিয়তমকে একা রাখিয়া বিহগিনীর যাইতে মন সরিতেছে না। ওদিকে কুলায় শাবকেরা মুখগুলি তাহার নয়ন ও প্রাণে জাগিয়া উঠিয়া চিত্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। সারাদিনের অদর্শনে এখন সে কাতর হইয়াছে তাহার প্রাণে প্রেমলহরী উথলিয়া উঠিয়াছে।

বিহঙ্গম কর্ম্মক্ষেত্রে নিমগন। তাহার নেত্রে কর্ত্তব্যের কঠোর দায়িত্ব বিদ্যমান। প্রিয়ার অপেক্ষিত মুখপানে চাহিবার তাহার মোটে সময় নাই। কিন্তু প্রকৃতির প্রাণে তাহা আর সহিল কই। তিনি ধূসর আঁচলে মুখ ঢাকিলেন। সুতরাং কর্ম্মী মাত্রেই কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিল।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সস্ত্রীক সজ্জিত হইয়া পোর্টিকোতে উপস্থিত হইয়াছেন। ফিটন্ সেখানে প্রস্তুত। পিতা নির্ভয়ে একেবারে সাহেবের সম্মুখীন হইয়া বিনীত ভাবে অভিবাদন পূর্ব্বক হেড মাষ্টারের পত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

জগতে বাল্যবন্ধু সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। বিশেষ সহপাটির প্রণয় জীবনে একটি পরম প্রীতিপদ ও উপকারী শক্তি।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, বাল্য সহচরের হস্তাক্ষর দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাহাতে কি যে লিখিত ছিল তাহা জানি না, এক এক বার চিঠিখানি পড়েন আর পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখেন। অবশেষে সাহেব খানসামাকে আদেশ করিলেন, "এই বাবুকে একখানি ঘর ও ইহাঁর যাহা যাহা আবশ্যক হয় তাহা দেও।"

এইরূপ আদেশের পর তিনি সস্ত্রীক সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পরদিন বেলা আটটার সময় সাহেব পিতাকে ডাকিয়া কহিলেন "দেখ বাবু! আমি তোমাকে কি কাজ দিব? তোমার লেখা পড়া অপেক্ষা উদ্যম, অধ্যবসায় ও সাহস দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কেবল আমার কুলিদের হিসাব পত্র রাখিবে, আর রাত্রিতে একটু একটু ইংরাজী পড়িবে, আমি তোমাকে পনর টাকা করিয়া দিব। ইহার পর পিতার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া কহিলেন উপস্থিত তোমার যাহা যাহা আবশ্যক হয় ইহাতে তাহা করিয়া লও।

সেই পাঁচ টাকাই তখন পিতার পক্ষে পাঁচ মোহর হইল। মানুষের আহার অভাবে যেমন ক্লেশ, পরিচ্ছদের অভাব যে তদপেক্ষা অল্প কষ্টদায়ক তাহা নহে। এক বস্ত্র হইয়া পিতা বড়ই মনের কষ্টে কাল কাটাইতে ছিলেন, অপরিচ্ছন্নতার গ্লানি তাঁহাকে বড়ই পীড়া দিতে ছিল, এই জন্য প্রথমেই বেশ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। আহার সম্বন্ধে তিনি অনাড়ম্বর ছিলেন, কেবল দুগ্ধই তাঁহার প্রধান খাদ্য ছিল।

পিতার বিদ্যা অল্প হইলেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় শীঘ্রই প্রকাশ হইয়াছিল। সাহেব তাঁহাকে ইহার পর ওভারসিয়ার হইবার মত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সে কালে এ সকল শিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ কলেজে পারদর্শিতা না দেখাইলেও এরূপ কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া দুর্লভ ছিল না।

পিতার সুসময় আসিয়াছিল, তিনি সাহেবের সুনজরে ত পড়িয়া ছিলেন, আবার হঠাৎ একদিন মেম সাহেব ডাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন—"বাবু! তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দয়া হয় অতএব আমি তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে তুমি আমার সংসারের হিসাব রাখিও আমি তোমাকে মাসে মাসে দশ টাকা করিয়া দিব।

মেম সাহেবের এই অনুগ্রহে পিতার মনে আশাতীত আনন্দ হইল। তিনি করযোড়ে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিলেন, "মাতঃ! আমি জানি না কি বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিব। এ উপকারের নিমিত্ত আমি চিরজীবন আপনাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। ঈশ্বর আপনাদিগকে সুখে রাখুন।

ক্রমশঃ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

একেশ্বর বাদী সম্মিলন — এবার আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ইউনিটেরিয়ান প্রচারক রেভারেণ্ড ডাক্তার স্যাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব কংগ্রেসের একেশ্বরবাদী সম্মিলনীর সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে আমেরিকা হইতে কলিকাতায় আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসিদিগের সাহার্য্যার্থ ভিক্টোরিয়া স্কুল গৃহে মহিলাদিগের একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বহু সম্ভ্রান্ত রমণী সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে ১৭০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

নূতন প্রস্তাব—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে যুক্তপ্রদেশ, বাঙ্গালা, বিহার ও মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি লইয়া পুনরায় নূতন প্রদেশ গঠন করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

ভারত সচিবের মন্ত্রণা সভার নূতন সদস্য স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত কে, সি, এস, আই মহোদয় এক বৎসরের জন্য ইণ্ডিয়া কাউনসিলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারত সচিব মহাশয় যখন না থাকিবেন তখন গুপ্ত মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসিদিগের সাহায্যার্থ সম্প্রতি টাউন হলে এক মহা সভা হইয়া গিয়াছে, বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ঐ সভায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই কথা বলিয়া এলান থরসবাই তাঁহার জন নামীয় একজন ভৃত্যকে কোন কার্য্যের আদেশ দিবার জন্য জানালার নিকটে গমন করিলেন। ইতবৎসরে গিলিয়ান টেবিল হইতে এক খানা সংবাদপত্র অন্য মনস্ক ভাবে তুলিয়া পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিল। সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি লিখিত রহিয়াছে—"লর্ড আরমিডেবলের কন্যা সিলভিয়া আরমিডেবলের সহিত মেজর জেনারেল হাগ ফ্রেজারের বিবাহ এই সপ্তাহের মধ্যেই সম্পন্ন হইবে।" এই সংবাদ পাঠে গিলিয়ান চমকিয়া উঠিল। এলানি থরসবাইয়ের পূর্ব্ব বাগদত্ত সিলভিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ তবে সত্য সত্যই ভঙ্গ হইয়াছে। সে ভাবিল হায়! আমারই জন্য এই ঘটনা

ঘটিল। মিস্ লেথাম যদি আমাকে ব্যারণস্কম্বের জমীদারীর উত্তরাধিকারিণী না করিতেন তবে নিশ্চয়ই এলান থরসবাই ব্যারণস্কম্ব জমিদারীর অধিকারী হইতেন। তাহা হইলে লর্ড আরমিডেবলেরও কন্যার তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার কোন আপত্তি থাকিত না"। ইতি মধ্যে এলান থরসবাই গিলিয়ানের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন "ব্যাপার কি? আপনাকে এরূপ অস্থির দেখাইতেছে কেন? অবশ্য আপনি সংবাদ পত্রে কোন মন্দ সম্বাদ পাঠ করেন নাই?

এই বলিয়া গিলিয়ান পঠিত সংবাদ পত্রখানি উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। গিলিয়ান তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁহার দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "আমি ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না।"

এলান থরসবাই গিলিয়ানের দিকে ফিরিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন "আপনি কি লেডি সিলভিয়ার বিবাহ সংবাদের বিষয় বলিতেছেন? ইহা সম্পূর্ণ সত্য আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন আমি ইহা শুনিয়াছিলাম।" গিলিয়ান তাহার কথার উত্তরে বলিল "আমি লেডি সিলভিয়ার অপর লোকের সহিত বিবাহ সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।"

এলান থরসবাই বলিলেন "কেন আপনি দুঃখিত হইতেছেন? আমার বিশ্বাস লর্ড আরমিডেবল মেজর ফ্রেজারকে জামাতা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। আর মিস্ আরমিডেবলের পক্ষেও এই বিবাহ খুব সুখের হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। তবে কেন আপনি দুঃখিত হইতেছেন?

গিলিয়ান অপ্রস্তুত হইয়া বলিল আমি জানি না আমি কেন দুঃখিত হইতেছি। এক্ষণে আমি যাই, বোধ হয় মিসেস থরসবাইয়ের আমাকে আবশ্যক হইয়া থাকিবে।

এলান থরসবাই তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "না, আমার ঠাকুর মার এখন আপনাকে আবশ্যক হয় নাই। তিনি এতক্ষণে তাঁহার প্রাতঃ ভোজন শেষ করিয়াছেন। আমার জানিতে ইচ্ছা হয় কেন আপনি সিলভিয়ার বিবাহ সংবাদে দুঃখিত হইয়াছেন? তবে কি আপনি আমার জন্য দুঃখিত হইয়াছেন?"

গিলিয়ান দুঃখিত হইয়া বলিল "আমি আপনার জন্য দুঃখিত হইয়া অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছি।"

এলান থরসবাই গিলিয়ানের এই উত্তরে জোরের সহিত বলিলেন "আপনি যথার্থই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছেন। মিস্ আরমিডেবলের অপরের সহিত বিবাহ ব্যাপারে আমার দুঃখের কোন কারণ নাই। আপনি কি তাহা জানেন না? আপনি কি তাহা বুঝিতে পারেন না?

গিলিয়ান এলান থরসবাইয়ের এই কথায় লজ্জিত ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল।

এলান থরসবাই পুনরায় বলিলেন আপনি কি জানেন না যে সে দিন সন্ধ্যাকালে হাইডপার্কের সেই প্রথম দর্শনাবধি কাহার মধুর স্মৃতি আমার সঙ্গের সঙ্গী হইয়াছে? আবার যখন আপনাকে পুনরায় এখানে দেখিলাম তখন আমি বুঝিলাম যে আপনিই আমার জীবনের আশার আলোক এবং আমি কতবার আপনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। কিন্তু একজন দরিদ্র কৃষকের স্ত্রী হইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ উপস্থিত হইয়াছে। বলুন এখন আপনাকে বিবাহ করিবার আশা কি আমি করিতে পারি?

গিলিয়ান বলিল "প্রিয় এলান আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে আমার সম্বন্ধে কোন একটি বিশেষ কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

এলান থরসবাই বিষাদ পূর্ণ স্বরে বলিলেন "সে কথা কি? তুমি পূর্ব্বে আর কাহাকে ভাল বাসিতে তাহাই কি আমাকে বলিতে চাও? তবে কি আমার তোমাকে বিবাহ করিবার কোন আশা নাই?

গিলিয়ান এলান থরসবাইয়ের এই কথায় অধীর হইয়া বলিল "না না, এলান এ জগতে তোমাকেই আমি প্রথম ভাল বাসিয়াছি, অন্য কাহাকেও ভালবাসি নাই।

তৎপরে এলান থরসবাই আগ্রহ পূর্ণ স্বরে বলিলেন "তবে এখন অন্য কোন বিষয় উত্থাপন করিবার আবশ্যক নাই। আমাদের বিবাহের উপরই আমার জীবনের সমস্ত সুখ নির্ভর করিতেছে, আর কোন কথার প্রয়োজন নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নকাল। নটন হল প্রস্থানোন্মুখ সূর্য্যের আলোকে হাস্য করিতেছিল। সকলে বসিবার ঘরে উপবেশন করিয়াছিলেন এমন সময়ে মিসেস থরসবাই পশম বুনন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিরাশ ভাবে বলিলেন "এই গলাবন্ধের একটা ঘর পড়িয়া গিয়াছে, তাহা আমি আর তুলিতে পারিতেছি না।

গিলিয়ান মিসেস থরসবাইয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল "মিসেস্ থরসবাই গলাবন্ধটা আমাকে দিন, আমি ইহার ঘরটা তুলিয়া দিতেছি।

এলান থরসবাই চিমনির নিকট উপবেশন করিয়া তাঁহার সপ্রেম কটাক্ষপাতে গিলিয়ানকে লজ্জায় আরক্তিম ও বিব্রত হইয়া পড়িতে দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন। যখন গিলিয়ান মিসেস্ থরসবাইকে গলাবন্ধটা ঠিক করিয়া প্রত্যার্পণ করিল, তখন বৃদ্ধা তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল "সিলভিয়া কোন কোন সময় তোমাকে সচরাচর যেরূপ দেখায় তদপেক্ষা আমার প্রতি অধিক দয়াশীলা ও মনোযোগিনী বলিয়া মনে হয়।"

গিলিয়ান যখন গলাবন্ধটি মিসেস্

থরসবাইয়ের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক আপনার বসিবার চৌকিতে গিয়া পুনরায় উপবেশন করিল তখন তাহার নয়নদ্বয় লজ্জায় আনত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার এই রূপ সলজ্জ ভাব দর্শনে এলান থরসবাইয়ের ওষ্ঠদ্বয় সকৌতুক হাস্যে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এলান থরসবাই অস্পষ্ট স্বরে গিলিয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঠাকুর মা প্রায়ই তোমাকে লেডি সিলভিয়া আরমিডেবল বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন। কেন তিনি এরূপ ভুল করেন ইহা আমার খুব আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।

গিলিয়ান লজ্জিত ভাবে উত্তর করিল "আমি জানি না, কেন তিনি এরূপ ভুল করেন।"

এলান থরসবাই কিছুক্ষণ গিলিয়ানকে নিরব প্রশংসা পূর্ণ কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া দাড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—এখন আমাকে একবার যব ও গমের ক্ষেত দেখিবার জন্য যাইতে হইবে। ক্ষেতটাতে লাঙ্গল দেওয়া হইতেছে। যাহারা লাঙ্গল দিতেছে তাহারা নূতন লোক, নূতন লোকদিগের প্রতি আমার বিশ্বাস হয় না। তাহারা ভাল করিয়া কাজ করিবে কি না বলা যায় না।

এলান থরসবাই যবের ক্ষেত্রে যাইবার জন্য উদ্যত হইবামাত্র সহসা বাটীর প্রবেশ দ্বারে উচ্চ করাঘাতের শব্দ শ্রুত হইল। এলান থরসবাই প্রস্থানে বিরত হইয়া বলিলেন "আমি আশ্চর্য্য হইতেছি কে আবার এরূপ অসময়ে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন?" কিন্তু সেইক্ষণে বাটীর হানা নাম্নী পরিচারিকা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক মিষ্টার চেকলাণ্ড নামক একজন ভদ্রলোকের আগমন জ্ঞাপন করিল। তাহার পরক্ষণেই মিষ্টার চেকলাণ্ড গৃহে প্রবেশ করিলে এলান থরসবাই তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক বলিলেন "মিষ্টার চেকলাণ্ড, এখানে আপনার সহসা এই আগমন কি জন্য? নর্টন হলের এই সৌভাগ্যের কারণ কি?"

মিষ্টার চেকল্যাণ্ড বলিলেন—না না, আমার আগমনে নর্টন হলের সৌভাগ্যের কোন কারণ নাই। আমি নর্টন হলের নিকটস্থ কোন স্থানে আগমন করিয়াছিলাম। আপনার মিলার এণ্ড নামক জমিদারীর বন্ধক সম্বন্ধে কি করিতে হইবে সে বিষয়ে আমার আপনার উপদেশের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্যই আমি নর্টন হলে আগমন করিয়াছি।

ইহার পর মিষ্টার চেকল্যাণ্ডের দৃষ্টি গিলিয়ানের উপর পতিত হইল। এ স্থানে বলা আবশ্যক যে মিষ্টার চেকলাণ্ড গিলিয়ানের একজন এটর্ণী। ইহার বিষয় প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বিস্মিত ভাবে বলিলেন "মিস্ সিটন আপনার সহিত এ স্থানে সাক্ষাৎ হওয়া অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমি জানিতাম যে আপনি এখন রিয়াবটিতে অবস্থিতি করিতেছেন।

গিলিয়ান এতক্ষণ পর্য্যন্ত মিষ্টার চেক-ল্যাণ্ডের সহিত নর্টনহলে এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ হওয়ায় একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে মিষ্টার চেকল্যাণ্ডের জিজ্ঞাসায় সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর করিল "আমি সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি. বলিতে কি আমি সেখানে একেবারেই যাই নাই। আমি মিসেস ধরিসবাইয়ের নিকট রহিয়াছি।"

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোম রাজ্যের ইতিহাস)

১২৩ পৃষ্ঠার পর।

১৯ অধ্যায়।

রোমের ভদ্র ও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিবাদ।

৮। প্লীবিয়দিগের ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর লিসিনিয়স ও সেক্সটন নামে দুইজন ট্রিবিউন লিসিনিয়ান রোগেসন্স বলিয়া কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিলেন। তদনুসারে ৩৬৬ খৃঃ পূঃ অব্দে প্লীবিয়েরা কন্সল পদ পাইল এবং খৃঃ পূঃ ৩০০শকে তাহারা পৌরহিত্যের ও অধিকারী হইল।

৯। কিন্তু প্লীবিয়দিগের প্রতি পেট্রিসীয়দিগের যে দ্বেষ ও ঘৃণা, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। যে ব্যক্তি প্লীবিয়দিগের পক্ষ হইয়াছে, পেট্রিসিয়েরা কোন না কোন উপায়ে তাহার বধসাধনের চেষ্টা পাইয়াছে। স্পিউরিয়স কেসস, মিলিয়স এবং ম্যানিলিয়স এই তিন ব্যক্তি প্লীবিয়দিগকে দারুণ দুরবস্থার সময়ে রক্ষা করাতে বিপক্ষেরা রাজ্যাকাঙ্ক্ষী অপবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে কালগ্রাসে প্রেরণ করে এবং অতঃপর গ্রাকাই নামক ভাতৃদ্বয়কেও এইজন্য ভয়ানকরূপে হত্যা করে।

১০। খৃঃ ১৩৩ পূঃ প্লীবিয় বংশজাত আফ্রিকা বিজেতা সিপিওর জামাতা টাইবিরিয়স্ গ্রাকস্ দরিদ্র প্লীবিয়দিগের দুঃখ দূরীকরণে সচেষ্ট হইয়া লিসিনিয়ান নিয়ম পুনঃ প্রচলিত করিতে যত্ন পান। পেট্রিসীয়েরা অনেক দিবস সে নিয়ম স্থগিত করিয়া রাখিয়া ছিল, এক্ষণে এই কথা শুনিয়া তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া ৩০০ বন্ধুর সহিত টাইবিরিয়াস্‌কে নিধন করিল। তাঁহার মৃত্যুর ১০ বৎসর পরে তাঁহার ভ্রাতা কেয়স গ্রাকস ভ্রাতার অনুবর্ত্তী হওয়াতে পেট্রিসীয়দিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া হত হইলেন। এইরূপ সাধারণতন্ত্র যতদিন ছিল প্লীবীয়দিগের প্রতি পেট্রিসীয়দিগের দ্বেষানল নির্ব্বাণ হয় নাই কিন্তু শেষে দুই জাতি এক হইয়া গেল।

২০ অধ্যায়।

ডিসেম্ভারেট।

১। অনেক দিবস পর্য্যন্ত রোমে কোন নিয়ম পুস্তক ছিল না। ইতঃপূর্ব্বে রাজারা স্বেচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন, পরে কন্সলেরা ও যিনি যখন নিযুক্ত হইতেন তাঁহারা আপনাপন মত চালাইতেন। অবশেষে অনূন ৪৫১ খৃঃ পূঃ অব্দে টারিণ্টিলস নামে একজন ট্রিবিউন প্রত্যেক শ্রেণীস্থ লোকের কর্ত্তব্য ঘটিত কতকগুলি নিয়মের প্রস্তাব করেন, কিন্তু পেট্রিসীয়েরা তাহাতে তাঁহার বিপক্ষ হইল।

তিনবার।

(গল্প।)

জে রজার্স একজন খাটি ইংরাজ। ভারতীয় কোন প্রাদেশিক রেলওয়ে বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। রেলওয়ে বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের জীবন কিরূপ বিপদ সঙ্কুল ও দায়িত্বপূর্ণ তাহা সর্ব্বজন বিদিত। এক সেকেণ্ডের তফাতে কিরূপ প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে সে জ্ঞানটা রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের মাথার মধ্যে অহরহ জাগাইয়া রাখিতে হয়। জে রজার্স প্রথম যখন রেলওয়ে বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স খুব অল্প। সেই অপরিণত বয়সে, যখন রক্ত টাট্‌কা, উত্তেজনায় পূর্ণ, তখন অহরহ হট্টগোল সমাকুল রেলওয়ের কার্য্যটি তাঁহার কেমন এক রূপ নেসার মত মনে হইত। এক এক দিন টেলীগ্রামের পর টেলীগ্রাম আসিতেছে। নবীন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের উপর তলব অমুক রেলওয়ে ষ্টেসনটি অতিরিক্ত বৃষ্টি পতনে প্রায় ধ্বংশোন্মুখ অতএব অবিলম্বে ইহার সংস্কার দরকার। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের জরুরী উপস্থিত আবশ্যক। যাত্রার জন্য স্পেসেল ট্রেন প্রস্তুত। তার পর ষ্টেনের পর ষ্টেসন। কি হট্টগোল! কি জনতা! কি উত্তেজনার পর উত্তেজনা! এক একটা বড় জংসনে ট্রেনের পর ট্রেন আসিতেছে। কি অসম্ভব যাত্রীর সমাগম! কি কলরব! খেয়াল উঠিলে আবশ্যক ও অনাবশ্যক সকল স্থলেই একটা মুরুব্বীআনা চাল চালিবার লোভ সম্বরণ করা অনেক সময় নবীন ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। অনেক সময়ে প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ষ্টেসনে নামিয়া ঈষৎ তাচ্ছিল্য ও প্রভুত্ব সূচক ভাবে রেলওয়ের সাধারণ কর্ম্মচারিদিগের সকল কার্য্যের খুটি নাটি ধরিয়া তীব্র সমালোচনা করা তাঁহার কেমন একটা অভ্যাসগত কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। অনেক সময়ে, এমন

কি বড় বড় রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ তাহার মুরুব্বীআনা ও হাব ভাবে কেমন যেন তটস্থ হইয়া পড়িত। অল্প বয়স সত্ত্বেও তাঁহার কেমন একটু রাজোচিত গাম্ভীর্য্য দর্শনে, তাঁহার অসহনীয় অনধিকার খামখেয়ালি ও মুরুব্বীআনা ধরণ ধারণটাও তাহারা বেমালুম সহিয়া যাইত। কত সময়ে তাঁহার বিশ্রামের সময় থাকিত না। দিনে, রাত্রিতে কাজের ভিড়েও ব্যাস্ততায় তাঁহার দিনগুলি একটা সকম্প বাষ্পস্ফীত উত্তপ্ত এঞ্জিনের ন্যায় দ্রুত সমারোহের সহিত চলিয়া যাইত। কত সময়ে কোথা দিয়া দিন আসিল, রাত্রি যাইল, তাহার একটা হিসাব নিকাশ লইবার তাঁহার একটুও অবসর থাকিত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অহরহ এতদূর উৎকট কর্ম্ম সংগ্রাম তাঁহার যৌবন তারুণ্য সজীব উত্তপ্ত হৃদয়টিকে ক্লান্তি কি অবসাদের বিন্দুমাত্র ছায়াপাতে কিছুমাত্র শীতল করিয়া তুলিতে পারিত না।

তাঁহার সহ কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেরই সারাজীবন দ্রুত এঞ্জিনের ন্যায় রেলওয়ের এলাকাধীন কার্য্যের মধ্যেই আবর্ত্তিত ও ঘূর্ণীত হইয়া আসিতেছে। অনেক স্থলে দেখা যাইত যে তাহাদের জীবন রেখাগুলি রুক্ষতার সাক্ষাৎ গণ্ডিরেখা বদ্ধ, নিরেট ও নিরস। কবিত্ব ও মানবীয় কোমল ভাবাবেশগুলির প্রবেশের রন্ধ্রমাত্র বর্জ্জিত। জে রজার্স সংসার পথে সহজ প্রাপ্য নিত্য কর্ম্ম উত্তাপ শুষ্ক তাঁহার সহকর্ম্মীদের অনুরূপ ব্যক্তিদিগের সম্পূর্ণ বিপরীত সৃষ্টি স্বরূপ ছিলেন। হীম শীতল কনকনে আর হাওয়ার মধ্যে জাত ও বর্দ্ধিত উদ্ভিদ সহসা সূর্য্যালোক উত্তপ্ত শুষ্ক ঝনঝনে আবহাওয়ার মধ্যে পতিত হইলে যেরূপ অবসাদ ত্বরিত আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া বসে, ভারতীয় উগ্র সূর্য্যালোক তপ্ত বায়ু খাটি ইউরোপ পালিত ও বর্দ্ধিত এবং অবারিত সুকোমল কবিত্ব ও ভাবাবেশ-স্নাত জেরজার্সের ইউরোপীয় হৃদয়টিকে অবসাদ শীর্ণ, কর্কশ ও খনখনে করিয়া তুলিতে পারে নাই। দিগদিগন্ত ঝলসিত ভারতীয় সূর্য্যালোক, নিত্য পরিবর্ত্তিত ভারতীয় আবহাওয়ার প্রতি বিরক্তির পরিবর্ত্তে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার কেমন একটা টান জন্মিয়া গিয়াছিল। কতদিন অবসর কালে যখন তাঁহার নির্জ্জন বাংলাখানির চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর চকিত করিয়া ভারতীয় প্রভাতিক প্রতপ্ত সূর্য্যালোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িত, সে সময়ে তিনি প্রশংসাপূর্ণ নয়নে প্রভাতিক সূর্য্যালোককে অভিবাদন করিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিতেন, "কি সুন্দর! কি সুন্দর! এই মহোজ্জ্বল জমকালো প্রভাতের তুলনায় তাঁহার স্বদেশের প্রভাত কি শীর্ণ ও ক্ষীণালোক সম্বল মাত্র। এক কথায় এসিয়ার একান্ত শেষ পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত প্রকৃতির অনুগ্রহ ও আলেখ্য

দেশটির প্রতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কেমন একটা আশ্চর্য্যরূপ মায়া জন্মিয়া গিয়াছিল অনেক সময়ে তিনি নিজেই বিস্মিত হইতেন ও প্রশ্ন করিতেন যে এই অল্পদিনের প্রবাসে জগতে নিতান্ত অজ্ঞাত ও অপরিচিত এই দেশটির প্রতি তাঁহার কেন এত টান হইল। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর ছিল না। তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেন না কেন ইহার প্রতি তাঁহার এত টান। ভারতের সকলই তাঁহার কেমন একটু শোভন স্বপ্ন ভাবাবেশ মণ্ডিত বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। এই ছায়া ও আলোকের দেশটি কোন মায়ারাজ্য হইতে স্খলিত একখানি দৃশ্যপটের ন্যায় অহরহ ওতঃপ্রোতঃ ভাবে তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিত। তাঁহার মতে এখানকার সবই সুন্দর ও স্বপ্ন দৃষ্ট মায়ালোকে বিধৌত।

উষার ক্ষীণালোকে সদ্য জাগরিত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ভৃত্যের হস্ত হইতে দুইখানি টেলিগ্রাম লইয়া তাড়াতাড়ি তাহাতে একবার চোক বুলাইয়া যাইলেন। টেলিগ্রাম পাঠে তাঁহার নয়নে একটা ত্বরিত দুশ্চিন্তার ছায়া জাগিয়া উঠিল। টেলিগ্রামদ্বয়ের সংবাদ বিশেষ গুরুতর। একটা বড় জংসনে চালকের অমনোযোগে বোম্বে মেলের সহিত এক খানা যাত্রী গাড়ীর ভীষণ সংঘর্ষণের সংবাদ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আর পাঠ করিতে পারিলেন না। তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে টেলিগ্রাম খানা টেবিলের উপর পতিত হইল। একটা অনির্দ্দিষ্ট উৎকণ্ঠায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল। হায়! হতভাগ্য হতাহতগণ! এখনও হয়ত তাহাদের মধ্যে কাহারও প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। এই যে দুর্ঘটনা ইহা কেবলমাত্র দৈবের দুর্বিপাক। কোন মানুষের উপর এ ঘটনা সংঘটনের বিন্দুমাত্র দোষ স্পর্শে না। জে রজার্সের অন্তঃকরণে সর্ব্বাগ্রে এই চিন্তাটাই নিতান্তই অনাহুতভাবে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু আর চিন্তা করিবার সময় ছিল না। তাহার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে চঞ্চল প্রাণ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে উৎকট উৎকণ্ঠা বহন করিয়া ততোধিক বেগে স্পেসেল ট্রেন ক্ষীণ উষালোকে অস্পষ্ট-লক্ষিত প্রান্তর চকিত করিয়া গন্তব্য স্থলাভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইল।

বড় জংসনটি সে দিন অতিরিক্ত কার্য্য বাহুল্যে কেমন যেন গম গম করিতেছিল। চারি দিকে রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণের ত্বরিত সমাবেশ ও দ্রুত পদবিক্ষেপে যেন জংসনটি সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদের ঘর্ম্মাক্ত মুখে একটা গভীর উৎকণ্ঠার ছায়া পড়িয়াছিল। সকলেই শশব্যস্ত। মেল গাড়ীর এঞ্জিন খানি একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ এবং যাত্রিদিগের শকটগুলির অধিকাংশই ভগ্ন। তখন হতাহতগণের সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট। ভগ্ন শকটগুলি সেই হতভাগ্যদিগের ক্ষীণ কাতরধ্বনিতে পূর্ণ। সমস্ত জংসনটি কি যেন একটা শুষ্ক বিভীষিকার ছায়ায় মলিন। এই শীতল মৃত্যু ও বিভীষিকার

বিভৎস অভিনয়ের উপর যখন প্রভাতের উত্তপ্ত অথচ কোমল স্পর্শ অবারিত নদীর স্রোতের ন্যায় উচ্ছ্বলিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন আকস্মিক আশা ও আনন্দের আবির্ভাবের ন্যায় চতুর্দ্দিক কেমন একটু জম জমে হইয়া উঠিল। ভগ্ন শকট হইতে হতাহত যাত্রিগণের উদ্ধার কার্য্যে রত জে রজার্সের সহানুভূতি-ব্যগ্র ও বেদনায় ম্লান মুখও প্রভাত দর্শনে একটু সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হতাহতগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সেদিনকার সেই প্রভাতের আলোক যেন সেই সাক্ষাৎ দৃশ্যমান মৃত্যুর মধ্যে জীবনের প্রোজ্জল সঙ্কেত স্বরূপ সহসা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে হতাহতগণের উদ্ধার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। জংসনটিতে সমবেত সমস্ত কর্ম্মচারিগণই কি যেন এক আশ্চর্য্য উদ্যমের আকর্ষণে অধীর ও ত্রস্তভাবে চতুর্দ্দিকে চলাফেরা করিতে ছিল। কোন স্থানে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভগ্ন শকটের চতুর্দ্দিকে জটলা করিয়া বৃথা জল্পনায় ব্যস্ত। কেহ বা অনাবশ্যক কাজের ওজরে একান্তে ত্রস্ত ভাবে দণ্ডায়মান। কাজের শেষ নাই, ভিড়েরও অন্ত নাই। চূর্ণ শকট ও হতাহতগণের মধ্যে কাহার হস্ত কাহার পদ কাহার মস্তক চূর্ণ। কেহ একেবারে মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত। কেহ বা আতঙ্কে মৃতবৎ মূর্চ্ছা গ্রস্থ। হতাহতদিগের আর্ত্তনাদ চতুর্দ্দিকে কেমন একটা শুষ্ক ঔদাস্যের ভাব সৃষ্টি করিয়া তুলিতে ছিল। চাক্ষুস দৃশ্যমান মৃত্যুর দেদীপ্যমান আবির্ভাব ক্ষেত্র জে রজার্সের নিকট তাঁহার সমস্ত জীবনের মধ্যে এমন করিয়া আর কখনও সম্পূর্ণ যবনিকা উত্তোলিত করে নাই। জে রজার্স নিমেষ মাত্র কার্য্যে ক্ষান্ত হইয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক প্রভাত রশ্মি মণ্ডিত জগতের দিকে একবার করুণা-ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। হায়! কি বৈপরিত্য! এক দিকে আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে প্রাচুর্য্যে জাগরিত অগাধ স্রোতরেখা, অন্যদিকে মৃত্যু ও নিরাশার কি নির্ম্মম ভ্রূকটি! কিন্তু জে রজার্সের এ সমস্ত ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। তখন তাঁহার অনেক কাজ বাকি পড়িয়া ছিল। অদূরে একখানি অর্দ্ধ ভগ্ন শকট সহসা দীপ্ত প্রভাতের আলোকপাতে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিতে স্নাত হইয়া এই সময়ে তাঁহার করুণা-ব্যগ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইল। তিনি বিস্মিত হইলেন। এতক্ষণ এই শকট খানি তাহার চক্ষুতে পড়ে নাই কেন? উষার অস্পষ্ট আলো আঁধারে এতক্ষণ কি ইহা প্রচ্ছন্ন ছিল? শকট খানি রেল পথের এক পার্শ্বদেশ ঠেসিয়া একান্তে অর্দ্ধ এলাইত অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। জে রজার্স ব্যগ্র পদবিক্ষেপে এই শকট খানির সম্মুখিন হইলেন। শকট খানি কি আরোহি শূন্য? তাঁহার মনে চকিতে এই প্রশ্ন উদিত হইল। কিন্তু

এই যে কাহার অস্পষ্ট গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসে আগাগোড়া সমস্ত শকট খানি একবার না একটা করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! এই যে পুনরায় তাহারই একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি! এ কি? ইহা কি কোন জীবিতের অথবা কোন মুমূর্ষের জীবনের শেষ বিদায়ের অভিবাদন-শ্বাস। জে রজার্সের অন্তরে বিদ্যুতের ন্যায় অনুশোচনার একটা কঠোর দ্রুত প্রবাহ বহিয়া যাইল। হায়! এতক্ষণে কেন এই শকট তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই, কিন্তু মৃত অথবা জীবিত যে কেহ হউক না কেন তাহাকে বাহিরে আনিতেই হইবে, তাহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। মুমূর্ষু মানবাত্মার এই শেষ সৌন্দর্য্য ও আলোক পানে মত্ত বহিঃপ্রকৃতির মুক্ত বাহু মধ্যে অনন্ত শোভায় স্নাত হইয়া প্রস্থান কি রমণীয়! জে রজার্স বদ্ধ শকট খানির দৃঢ়রুদ্ধ দ্বার জানালা গুলি সবেগ পদাঘাতে খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর যখন একটা প্রচণ্ড আঘাতে শকট খানির সেই রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন সহসা বাহিরের উজ্জ্বল আলোক প্রবাহ স্নাত শকটের অভ্যন্তর ভাগ ভালরূপে নিরীক্ষণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সম্মুখে অতি নিকটে একটা ধীর সঙ্কোচ পদধ্বনি ঈষৎ সম্ভ্রস্তভাবে সহসা ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি সচকিত ত্রস্ত কটাক্ষে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। ভগ্ন শকটের দ্বার দেশে এ কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? জীবনের পূর্ণ ব্যক্ত মূর্ত্তির এ কি সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি রেখা। দুর্য্যোগপূর্ণ অন্ধকার রাত্রির অবসানে ঊষার প্রথম উজ্জ্বল দীপ্তি-স্পর্শ সমস্ত বিশ্ব যেমন একটা আকস্মিক বিস্ময়ের সহিত উপভোগ করে, জে রজার্স নিবিড় মৃত্যুর অভিনয় ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ জীবনের পূর্ণ ব্যক্ত মূর্ত্তিটির সহসা আবির্ভাব তেমনি একটা আকস্মিক বিস্ময়ের সহিত উপভোগ করিতে লাগিলেন। বিস্ময়াবেগে কিছুক্ষণ তাঁহার বাক্ স্ফূর্ত্তি হইল না। ভগ্ন শকটের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান সাক্ষাৎ জীবনের মূর্ত্তি রূপিনীর মুখে ও চক্ষুতে এই সময়ে এই জগতের সহিত যেন এই প্রথম নূতন পরিচয়ের একটি চকিত আভাষের ভাব পরিস্ফুট হইতে হইয়া উঠিয়াছিল। ঘনীভূত নিশিথ রাজ্যের চির নিবাসী প্রাণীর মুখে ও চক্ষুতে হটাৎ আলোকের উদ্ঘাটিত রাজ্য দর্শনে যেমন একটা ভয় সন্ত্রস্ত সঙ্কোচ জাগরিত হইয়া উঠে, সে দিনকার সেই সদ্য জাগরিত প্রভাতের অংশ রূপিনীর সুদীর্ঘ নয়ন দুটি তেমনি একটা ভয় সন্ত্রস্ত সঙ্কোচে সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিনকার প্রভাত রশ্মি সেই বরণীয়া প্রভাতরাজ্ঞী রূপিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, জে রজার্সের মনে হইতে লাগিল যেন সেই প্রভাত কন্যার হটাৎ আবির্ভাবে তাঁহার পদতলে বিস্তৃত মৃত্যুস্রোতও যেন ক্ষণকালের জন্য নির্ম্মমতা বর্জ্জিত হইয়া উজ্জল জীবনে স্নাত হইয়া উঠিয়াছে এবং কবিত্বের পূর্ণ স্বরের ন্যায় ইহারই মধুর নয়নের দৃষ্টিপাতে

সেদিনকার প্রভাতের কোমল সৌন্দর্য্যে হটাৎ যেন সমস্ত জগৎরূপ নিখাদে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। কল্পনার অপ্রত্যাশিত এই দৃশ্যপটের আকস্মিক অবতরনায় জে রজার্স প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত কেমন একরূপ হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এই বিপন্না রমণীর প্রতি এই স্থলে তাঁহার কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের দায়িত্ব কত গুরুতর সে বিষয় ভাবিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার অবসর মাত্র রহিল না। ইতি মধ্যে নবীন প্রভাতের প্রখর আলোক নিখিল বিশ্বকে উষার স্বপ্নাবস্থার অবগুণ্ঠন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে বাস্তবিক সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। চারিদিকে যেন জীবন রেখার একটা তীব্র আলোড়ণ পড়িয়া গিয়াছিল। চারিদিককার সচ্ছল ও সচকিত প্রবাহ ধাক্কায় জে রজার্সের নয়নের সম্মুখ হইতে এতক্ষণ পরে একটা ঘন মায়ার স্বপ্নাবরণ অপসৃত হইল। এতক্ষণ পরে যেন তাঁহার নিজের অস্তিত্ব তাঁহাতে ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কি মন্ত্রবলে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান ব্যাপারে এরূপ বালকবৎ অপব্যবহারের প্রশ্রয় দিতেছিলেন। লজ্জার সঙ্কোচে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু আর এরূপ বিমূঢ়বৎ আচরণের প্রশ্রয় দেওয়া নিতান্তই অন্যায় হইয়া উঠিতেছিল। জে রজার্স যাদুমন্ত্র বিমুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার সমস্ত বিস্ময় ভাব হইতে নিজেকে সবল আকর্ষণে একরূপ টানিয়া লইয়া বিপন্না বিদেশিনীর নিকট অগ্রসর হইলেন।

তখন অনেকটা বেলা হইয়া উঠিয়াছিল। নবীন প্রভাতের টকটকে সোনালী বর্ণছটার পরিবর্ত্তে তীব্র রৌদ্রালোক আকাশ ও ধরণীর বিস্তৃত বক্ষটিকে বেশ একটু তপ্ত ও প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই বিভীষিকার উদ্‌ঘাটিত নাট্য ক্ষেত্র খানিকটা পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া যখন জে রজার্স ভগ্ন শকটের বিদেশিনী রমণীটিকে লইয়া রেলওয়ের বিশ্রামাগারে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি কেমন একটু আয়াস ও সচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারিনী স্ত্রীলোকটির নিটোল নিখুঁত ললাটদেশ পার্থিব জীবনের হিল্লোল স্পর্শে সতেজ সজীব ও আরক্তিম বর্ণছটায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এতক্ষণে তাহাকে কোন অপার্থিব রাজ্য নিবাসিনী জীবন হীন প্রাণীর ন্যায় কেমন একরূপ অদ্ভুতরূপ নিরক্ত ও ম্লান দেখাইতেছিল। এতক্ষণ পরে তাঁহার নয়নে চতুর্দ্দিককার জীবন ও জাগরণের দিব্য ছবি সজীব তুলিকা স্পর্শে যেন সুপষ্টতর হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিককার সজীবতা এতক্ষণ পরে যেন তাঁহার কণ্ঠে স্বর ও নয়নে আগ্রহ জাগাইয়া তুলিল, এবং পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিদেশী উদ্ধারকারির সংবাদ লইবার তাহার অবসর হইল। পরে তাঁহার সেই স্বভাবিক সৌন্দার্য ও কোমলতা পূর্ণ নয়নে, একটি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার

ভাবে যেন স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়া উঠিল।

প্রখর অথচ পেলব চিক্কণ রৌদ্রালোক ভেদ করিয়া সকম্পিত স্পর্দ্ধায় নব আনিত ট্রেণ অবশিষ্ট অনাহত যাত্রিদলকে লইয়া তখন বড় জংসনটি পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার হুইসল ধ্বনিও সুদূর বিলীন প্লাটফর্ম্মে দণ্ডায়মান জে রজার্সের মন্ত্রাবিষ্ট দৃষ্টি ট্রেনের স্বর্প গতির শেষ আবর্ত্তন রেখা খানির শেষ মুহূর্ত্ত অনুসরণে ব্যস্ত রহিয়াছিল। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে ভগবান দেবদূতগণের নিখুঁত আদর্শে মানব দেহ মনের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কবিগণ প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল চিত্রাদর্শেই মানব মন গঠিত হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করেন। শাস্ত্রবিদগণ অপেক্ষা কবিগণই মানব চিত্ত অঙ্কন কার্য্যে অধিকতর দক্ষ। শিল্পি চির নবীনতার মন্ত্র সিদ্ধ সরস বসন্তের অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ক্ষণিক আগমন চির শীত প্রভাব শুষ্ক প্রদেশের বনে ও প্রান্তরে চারু যৌবনের যেমন একটি মধুর কনক সজীব উচ্ছলন সমৃদ্ধি ছড়াইয়া দিয়া, তাহার পর তাহার পশ্চাতে একটা উদাস বিস্ময়ের স্মৃতি রাখিয়া প্রস্থান করে, আজিকার প্রভাতের অপ্রত্যাশিত ঘটনা—সেই ভগ্ন শকটের প্রভাতের অধিষ্ঠাত্রি দেবতারূপী সেই বিদেশিনীর প্রথম দর্শন হইতে তাহার শেষ প্রস্থান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটি জে রজার্সের কঠোর শুষ্ক চির কর্ম্ম কোলাহল উচ্ছলিত জীবন বেষ্টন করিয়া চির শীত ঋতু প্রবল প্রদেশে ক্ষণিক বসন্তের আগমনের ন্যায় চারু যৌবনের কি যেন একটি মধুর সরস সৌন্দর্য্যের আবাহন গীতি রচনা করিয়া তুলিতেছিল। প্রস্থানশীল ট্রেণের আরোহিনীর বিদেশী উদ্ধারকারির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা পূর্ণ সপ্রতিভ শেষ দৃষ্টিটি এবং সলজ্জনত গ্রীবার সহিত তাহার শেষ বিদায় অভিবাদনের ভঙ্গিটি শিল্পি কল্পিত মানসী প্রতিমারই প্রতি আরোপনীয় মানবীয় শ্রেষ্ঠ ভাব পরিকল্পিত এবং সেই বিদেশিনী সুন্দরীর সহিত কয়েক ঘণ্টার পরিচয়টি বিজন নদীসৈকতে অকস্মাৎ উচ্ছলিত উর্ম্মি প্রবাহে [illegible]নির ন্যায় আপাত উপভোগ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তাঁহার স্বজাতীয় পারসী জাতির উপাস্য চির জাগ্রত চির প্রজ্বলিত অগ্নি দেবতার স্তোত্রগীতির ন্যায় প্রীতি বিজড়িত তাঁহার কণ্ঠ স্বরটি, এবং সেই গরিয়ান চির জাগ্রত দেবতার শিখারই অনুরূপ তাহার মহোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য, গরিমাটি একটি অসমাপ্ত কাব্য গাথার ন্যায় জে রজার্সের মর্ম্মে মর্ম্মে একটি মধুর কল্পনার ভাব জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল আজিকার প্রভাতটি যেন তাহার জীবনের সমস্ত সুখের দিনের একটি পূর্ণ সমষ্টি এবং আজিকার প্রভাতের ঘটনাটির জন্যই যেন তিনি আপনার সমস্ত জীবন ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

নূতন সংবাদ

১। মিঃ গোখেলে দক্ষিণ আফ্রিকার নিগৃহীত ভারতবাসিদিগের সাহায্যের জন্য দুই লক্ষাধিক টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

২। এদেশের ভদ্রমহিলাগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যাদি যাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারেন তজ্জন্য ৮৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে ১৪ই ডিসেম্বর হইতে একটী মহিলা শিল্পবাজার খোলা হইতেছে।

৩। বড়লাট পত্নী লেডি হার্ডিঞ্জ মহোদয়া আগামী ২১শে মার্চ্চ স্বদেশ যাত্রা করিবেন এরূপ শুনা যাইতেছে।

৪। সম্প্রতি জর্ম্মনিতে মিঃ কালক্রাল নামক একব্যক্তি মনুষ্য শিশুর ন্যায় কিণ্ডার গার্টেন প্রণালনুসারে অশ্বদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং ইহাতে আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছেন। এক বৎসরের মধ্যে কোন কোন অশ্ব অঙ্কের যোগ বিয়োগ, গুণ ও ভাগ অবধি শিখিতে সমর্থ হইয়াছে।

৫। সম্প্রতি লণ্ডনে ৺ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে তত্রত্য ব্রহ্মোপাসকগণ এক সভা করিয়াছিলেন। সভায় উপাসনা বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইয়াছিল। ভারত মহিলাদিগের পক্ষ হইতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই সভায় কেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব ও অতীত জীবনের আলোচনা করিয়াছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত ইয়ুরোপীয় নরনারী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৬। দক্ষিণ আফ্রিকার নিগৃহীতদিগের জন্য গুরুকুলের বালকগণ কুলী মজুরের কার্য্য করিয়া ১১০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। বালকদিগের এই মহত্ত্বের জন্য ভগবান্ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

৭। আমাদের বড়লাটপত্নী লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া কলিকাতায় আগমন করিলে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ৩০০০৲ টাকা মূল্যের একখানি অলঙ্কার প্রদান করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। সহৃদয়া লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া এই প্রস্তাবের উত্তরে জানাইয়াছেন ঐ অলঙ্কারের মূল্যে কলিকাতার কোন হাস্পাতালে একজন রোগীর শয্যার বন্দোবস্ত করিলে তিনি অধিকতর সুখী হইবেন। এতদ্বারা লেডী হার্ডিঞ্জের দয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বামারচনা।

নীরব সাধক।

১

আমার নির্জ্জন ঘরে,
আমি রহিব একেলা পড়ে,
ধরার আলোক বায়ু
হেথা পশোনা করুণা করে।

২

চাঁদের অমিয় রাশি,
বিকচ কমল হাসি,
এ মলিন আঁখি আগে
কভু দিওনা দরশ আসি।

৩

আমার কুটীর দোরে,
কোকিল পাপিয়া ওরে!
থামিও সবার গান
নিবেদন করযোড়ে।

৪

অবনীর ভালবাসা,
সুখ-সাধ প্রীতি আশা,
আমার মানস পুরে
কেহ বেঁধোনা আপন বাসা।

৫

ভব কোলাহল হ'তে,
আপনারে কোন মতে,
রাখিতে সরায়ে দূরে
বাসনা আমার চিতে।

৬

বসুধা পাবক প্রায়,
পরশিলে দহে তায়,
অবোধ বুঝেনা তবু
কুহকে ছুটিয়া যায়।

৭

নির্জ্জনে নীরবে আমি,
সমাধিব দিবা যামী,
গোপন সাধনা মম
তব প্রতীক্ষায় স্বামী!

৮

সকল হৃদয় ময়,
সুগভীর আশা রয়,
সাধনার অবসানে
দিবে তুমি পদাশ্রয়।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।
চট্টগ্রাম।

জীবন্ত দেবতা।

জীবন্ত দেবতা মোর
এই ধরা মাঝে,
সাজাতে হয় না তাঁরে
নানা ফুল সাজে

চন্দনে চর্চ্চিত করি,
জাহ্নবীর জলে
পূজিতে হয়না তাঁরে,
ফুল বিল্ব দলে।

চরণে হয়না দিতে
অর্ঘ্যের অঞ্জলি
ধূপ ধুনা উপচার
নৈবিদ্যের ডালি
আমার 'দেবতা' সে যে
হৃদয়ের ধন,
প্রেম পুষ্পে:পূজি আমি
সে দুটী চরণ।
দেহ প্রাণ স'পে দিছি,
চরণে তাঁহার
কিছু আর রাখি নাই
বলিতে 'আমার'।

শ্রীচারুমতি দেবী।

চির সম্বল।

দাওনি প্রেম দাওনি পুণ্য দাওনি আমায়
পবিত্রতা,
বি[illegible] দিয়েছ মোরে অনুতাপ কাঁদ্‌ছি বসে
[illegible]
[illegible]
তোমার নাম, তোমার গুণ,তোমারই দত্ত
অশ্রুজল,
[illegible] বালকগণ [illegible]
কা[illegible] [illegible]মহাপাপীর ইহাই শুধু চির-
সম্বল।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা
ঢাকা।

তোলেন ক্রোড়ে।

একি অপূর্ব্ব শোভা একি অপূর্ব্ব
রূপের মাধুরী?
নয়ন মুদে হৃদয় পথে আজি আমি
একি হেরি?
একি আস্য একি হাস্য লীলাময়ের একি
লীলা গো?
হরি পাপীর সনে খেল্‌তে আসেন (তাঁর)
একি খেলা গো?
সতত আমি মোহেতে ভুলে, দলন করি
চরণ তলে,
তাঁর পুনঃ পুনঃ নিষেধ বাণী তবু তাঁর
একি ভাব?
দয়াময়ের এ দয়ার কি গো হয়না কভু
অভাব?
মানব তাঁর মানব সন্তানকে ফেলে বধ
করে,
তবু তিনি করেন না রাগ, কাছে নিয়ে
করেন সোহাগ,
জ্ঞান চক্ষু খুলে দিয়ে আদর করি তোলেন
ক্রোড়ে।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

---

৩৭ নং মথুরার লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ১১ নং অ‍্যাণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 605. January, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৫ সংখ্যা। { পৌষ, ১৩২০। জানুয়ারী, ১৯১৪ } ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

বিবাহে পণ গ্রহণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বঙ্গবাসিগণ তখন নিজেদের অবস্থা, উপযোগিতা অথবা সামাজিক কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া বরপণ প্রার্থী হইয়া বসিল। এদিকে "সু পাত্র" লোভাকৃষ্ট, ধনবান কন্যাভার-গ্রস্ত তাহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিল। এইরূপে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বরপণ প্রথা ভারতীয় সমাজে বিস্তৃত হইয়া সমা-জের অস্থি ও মজ্জা শোষণ করিতে লাগিল। তখন আর পাত্রাপাত্র বিচার নাই, যে "বর" হইয়া আসিবে, সে সেই পণের প্রার্থী হইবে। যে কন্যার বিবাহ দিবে, সে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত হইবে। বরপণ এইরূপেই ভারতীয় সমাজে প্রচলিত হইয়াছে।

এখন, যাঁহারা অন্যান্য সমাজের অনু-করণে এদেশে বরপণ অনুমোদিত করেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে ভারতীয় সমাজ, অপর সমাজের ন্যায় নহে। সে সব দেশে ধনবান ব্যক্তিদিগের সংখ্যা অধিক, ভারতবর্ষে দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক। অপর দেশে কুমারীগণ ধন-শালিনী না হইলে তাহাদিগের অদৃষ্টে প্রায়ই বিবাহ সংঘটন হয় না, তাহারা চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিলেও সমাজ তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না। কিন্তু ভারতীয় সমাজে হিন্দু কুমারীগণের যথাকালে বিবাহ না হইলে, অভিভাবক-গণ বিশেষরূপে সমাজে লাঞ্ছিত, এমন কি সমাজচ্যুত হইয়া থাকেন। অন্যান্য দেশের লোকেরা সাধারণতঃ ভোগ বিলাস পরায়ণ, সেইজন্য প্রচুর অর্থ সঞ্চিত না হইলে [illegible] না,

[illegible] "[illegible]পণ" প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইল।

প্রঃ লেঃ।

চন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেকে তাহা করেন। তবে বিবাহের জন্য ভাবী শ্বশুরের সহিত এই রূপ একটা বন্দোবস্ত করিয়া মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণকে (তাঁহাদের কন্যা দায় সময়ে) বিপন্ন করা এবং নিজের প্রবৃত্তিকে নীচ ভাবাপন্ন করা কাহারও উচিত নহে। জামতার এইরূপ সাহায্য প্রার্থনা যেন বরপণ হিসাবে না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩য়। যে সকল ধন কুবের ধনবৃদ্ধির জন্য ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই "পাপী" নহেন। কারণ ধনোপার্জ্জন মনুষ্য জীবনে বিশেষ আবশ্যক। সে জন্য পৌরুষ বা পুরুষকার অবলম্বন করাই মানবের কর্ত্তব্য। তাহা যিনি করেন তিনি ত কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি। একজন (দায় গ্রস্ত) ব্যক্তিকে বাধ্য করিয়া, কৌশল পূর্ব্বক তাহার অর্থ গ্রহণ দ্বারা নিজের ধনবৃদ্ধি আর ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা ধনবৃদ্ধি, এই দুই যে তুল্য নহে, একথা বোধ হয় সকলেই বুঝেন। তথাপি যে দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তর্ক স্থলেও এরূপ কথা বলিতে লজ্জিত না হন, সে দেশের প্রকৃত উন্নতি এখনও অনেক দূরে।

৪র্থ। এখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে সাধারণতঃ আপোগণ্ড শিশু কন্যার বিবাহ হয় না। প্রায়ই দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কা বালিকাদিগের বিবাহ হইয়া থাকে। সেই বয়সে বালিকাদিগের মাতাপিতা প্রভৃতি পিতৃকুলস্থ আত্মীয় গণের প্রতি গভীর মমতা ও সহানুভূতি হইয়া থাকে। অতএব—যাহারা ধনীর কন্যা, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, যাহারা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, পিত্রাদিকে নির্য্যাতন পূর্ব্বক বিবাহ কালে বরপক্ষ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন জানিয়া তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে বিশেষ বেদনা অনুভব করে। এরূপ স্থলে কন্যা পক্ষের নিকট হইতে কৌশল পূর্ব্বক সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সেই কন্যার সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র। বঙ্গকুমারীগণ অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা হউক, তাহারা যখন ভগবদ্ প্রেরণায় মাতৃহৃদয়ের অঙ্কুর লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহারা এতদূর স্বার্থ পরায়ণা নহে যে তাহাদের জন্য তাহাদের পিতা মাতা প্রভৃতি বিশেষ আত্মীয়বর্গ সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, আর তাহারা সেই অর্থ দ্বারা নিজেদের ধনপিপাসা চরিতার্থ করিয়া সুখানুভব করিবে! বরং তাহারা ভাবী স্বামী বা শ্বশুর কুলের অর্থ লোভের আতিশয্যরূপ নীচতা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা, একটা বিতৃষ্টা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে। এইরূপ অশ্রদ্ধা ভাব বদ্ধ মূল হইলে দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত সুখ শান্তির আশা সবই দূরীভূত হইয়া যায়। আমাদের দেশের কোনও সহৃদয়, সূক্ষ্মদর্শী, সুপ্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন।

"বাবা! থাকুক আমার বিয়ে,
রেখে কোলে কাঁখে বুকে, পালন কল্লে
কত দুখে,

আজো তোমার স্নেহ দয়ায় রয়েছি বাঁচিয়ে।
আজো তোমার এম্নি ব্যাথা, যা' কিছু পাও যখন যেথা,
পাখীর মত দিচ্চ এনে নিজে না খাইয়ে।
সেই তোমারে চির দুঃখে, ফেল্‌বো যে গো পাষাণ বুকে,
সে পশুকে পতি বলে পোড়্‌বো লুটাইয়ে?
ঘৃণা নাই কি নারীর মনে, সিদ্ধি নাই কি নারীর পণে
সংযমে তার যম ডরায়—সরে দাঁড়ায় গিয়ে!"

বঙ্গদেশের প্রত্যেক বিবাহার্থী যুবকের এই কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ কর কর্ত্তব্য।

৫ম। বোধ হয় সকলেই জানেন, বর্ত্তমান কালে এদেশে প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই। যে শিক্ষা পাইলে রমণীর মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি সমুহ সমুচিত রূপে বিকাশ লাভ করিবে, যে শিক্ষা পাইলে রমণী সুকন্যা, সুভগ্নী, সুভার্য্যা, সুমাতা এবং সুগৃহিনী হইয়া সংসার শান্তিময়, আনন্দময় এবং পুণ্যময় করিবেন, যে শিক্ষা পাইয়া রমণী জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিতা হইয়া, পুরুষ জাতির শ্রদ্ধার পাত্রী রূপে সমাজে তাঁহাদের সহকারিনী ও সহযোগিনী হইবেন, সেই সর্ব্ব কল্যাণময়ী স্ত্রীশিক্ষা, হিন্দু সমাজে এখনও স্বপ্নরাজ্যে অধিষ্ঠান করিতেছে। অতএব কন্যাকে সুপাত্রে—অর্থাৎ সচ্চরিত্র ও কৃতবিদ্য পাত্রে অর্পণ করিয়া পিত্রাদি অভিভাবক কৃতার্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আদরের কন্যা সুপাত্রে অর্পিত হইলে, বর তাঁহার মনোমত রূপে বধূকে গঠন করিয়া লইবেন, ইহাতে কন্যার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা অনেকটা দূর হইয়া তাহার নারী জন্ম সার্থক হইবে, তাঁহারা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে ও কথিত আছে,

"যাদৃগ্‌ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।"
মনু ৯। ২২।

কিন্তু সমাজের দুরদৃষ্ট ক্রমে এই সকল "সুপাত্র"ই অধিক পরিমাণে অর্থ দাবী করেন। আশা মরীচিকা-মুগ্ধ কন্যাপক্ষ সেই দাবী পূরণ করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন। অধিকাংশ স্থলে কন্যাপক্ষ এই সকল কারণে মনোনীত পাত্র পাইয়া তাহাকে (অর্থাভাব প্রযুক্ত) পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

কোন কোন স্থলে বর "সুপাত্র" না হইলেও যে টাকার দাবী করেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোন কোন স্থলে অপাত্রও ঐ, টাকার দাবী করেন, কেন না কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে কন্যা পক্ষের "জাতি" যাইবে, অতএব বর অপাত্রই হউক আর কুপাত্রই হউক, "পুরুষ ছেলে" ত বটে, সুতরাং সে বিনা টাকায় বিবাহ করিয়া কেন এক জনের

---

* কন্যাভার পীড়িত পিতার প্রতি কন্যার উক্তি। ৭ম স্তম্ভ।

জাতি রক্ষা করিবে? বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা এইরূপই দাঁড়াইয়াছে।

৬ষ্ঠ। বরপণ অনুমোদনকারী ব্যক্তি গণের ষষ্ঠ প্রস্তাব (অর্থাৎ ধনীদিগের কন্যাকে কিছু সম্পত্তি দান) যে অতি সুযুক্তি পূর্ণ বিজ্ঞোচিত প্রস্তাব তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এদেশে কন্যা সন্তানদের পক্ষে যে অনেকটা অবিবেচনা হয়, এ কথা যথার্থ। পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করিয়া ভ্রাতা লক্ষপতি বা কোটি-পতি, আর বিধবা ভগিনী আপোগণ্ড সন্তানদিগকে লইয়া গ্রাসাচ্ছদনের নিমিত্ত পরের দাসীত্বে নিযুক্তা—এমন কি সেই ভ্রাতার গৃহে ভ্রাতৃজায়া কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা ও অবমানিতা হইতেছেন, এমন দৃষ্টান্ত বঙ্গ দেশে অনেক গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই অন্যায়াচরণের প্রতীকার করা যে বিশেষ কর্ত্তব্য, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে বরপণ দ্বারা ইহার প্রতীকার হইতে পারে না। কেন না বরপণ এক পক্ষে যেরূপ উপকার হয়, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। অতএব সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণকে বরপণে বাধ্য না করিয়া, তাঁহারা স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া অবস্থার উপযোগীতা ক্রমে কন্যাকে যৌতুক কিম্বা কন্যাধন স্বরূপ কিছু সম্পত্তি দান করিলে সকল দিকেই মঙ্গল হইতে পারে।

এই শেষোক্ত প্রস্তাবে যাহা উক্ত হইল তাহা অবশ্য ধনবান ব্যক্তিদিগের পক্ষেই প্রযোজ্য। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানবের পক্ষে এ নিয়ম সঙ্গত হইতে পারে না।

এখন কথা এই, বরপণ হইতে এ দরিদ্র দেশের চরম দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিবাহের অন্যান্য ব্যয় আছে। যথা বিবাহ রাত্রির এবং পল্লিগ্রাম-বাসির বিবাহে আত্মীয় কুটুম্বদিগের প্রীতি ভোজন দান, গুরু পুরোহিত প্রণামী ও দক্ষিণা, বাদ্যকর প্রভৃতি বিদায়, ফুলশয্যা প্রভৃতির তত্ত্ব, এ সকল ব্যয় দরিদ্র কন্যাপক্ষের যে কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা অনেকে স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন না। অথচ বিবাহ কালে, এবং বিবাহের পরে এই সকল ব্যয় যথোচিত রূপে সম্পন্ন না হইলে সমাজে কন্যাপক্ষের এবং শ্বশুরালয়ে কন্যার লাঞ্ছনা ও অনাদরের পরিসীমা থাকে না।

এইরূপে "কন্যাদায়ে" দেশের যে রূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা ত সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইহার পরিণাম আরও যে কি ভয়াবহ, কন্যা সন্তানের দরিদ্র জনক জননী যে কি উপায় অব-লম্বন করিয়া জাতি কুল রক্ষা অর্থাৎ সমাজে নিজেদের সম্মান রক্ষা করিবেন, তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাই জানেন। আমরা যুক্ত করে, বিনীত বাক্যে, কন্যার— বিবাহ যোগ্যা কন্যার অর্থহীন অভিভাবক দিগকে বলিতেছি, তাঁহারা সকলে সম-বেত হইয়া মানবোচিত সাহস প্রকাশ করুন। কন্যা বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত এমন কি পথের ভিক্ষুক হইয়া, এ দরিদ্র দেশের

দরিদ্রতা আর বৃদ্ধি করিয়া কাজ নাই। শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবে, তাহাও শ্রেয়ঃ তথাপি কেহ অপাত্রে কন্যা দান করিবে না। অতএব, যদি কন্যার জন্য সুযোগ্য পাত্র না মিলে অথবা সুযোগ্য পাত্রে কন্যা দান করিবার উপযুক্ত অর্থ না থাকে, তবে শাস্ত্রকারদিগের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহারা এরূপ পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বিরত হউন। যদি আজিকার দিনে মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ উপস্থিত থাকিয়া, বিবাহের এইরূপ পণপ্রথা প্রত্যক্ষ করিতেন, তবে তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে সকলকে বলিতেন "হে দীন দরিদ্র ভারতবাসি! তোমরা কথনই কন্যার বিবাহের চেষ্টা করিও না। ইহাতে লোকক্ষয় প্রভৃতি প্রভূত অমঙ্গল সাধিত হইবে সত্য, তথাপি তোমরা তোমাদের সুবর্ণ প্রতিমা অতল জলে বিসর্জ্জন করিও না। স্বহস্তে দেশের সর্ব্বনাশ ঘটাইও না। আমরা ব্যবস্থা দিতেছি, তোমাদের কুমারীগণ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, গৃহের সেবা সমাজের সেবা এবং বিশ্বের সেবা অবলম্বন করিয়া নারীজন্ম সার্থক করুক। সুপাত্রে কন্যা দান করিয়া যে পুণ্যাচরণ হয়, অক্ষম পিতা কন্যাকে পারিবারিক সুখ হইতে বিরতা করিয়া, ভগবচ্চরণে উৎসর্গ করিয়া রাখিলে তদধিক পুণ্যাচরণ হয়।" সেই সকল নিরপেক্ষ, সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, সর্ব্বজন হিতৈষী আর্য্যগণ, আজিকার দিনে নিশ্চিত এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া সমাজে শান্তি স্থাপন করিতেন। বরপণ প্রথা সমূলে উৎপাটিত হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(উপসংহার)

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার কালে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে যাঁহাদের সহৃদয় সদাশয়, যাঁহারা স্বাবলম্বনকারী, উন্নত চেতা, যাঁহারা পারিবারিক সুখ শান্তি প্রার্থী, যাঁহারা সমাজ হিতৈষী এবং যাঁহারা এ দুর্ভাগ্য দেশকে উন্নত করিতে প্রাণপণ করিয়াছেন, তাঁহারা সমবেত চেষ্টাদ্বারা পণ প্রথা নিবারণে বদ্ধ পরিকর হউন। পণ প্রথা হইতে ব্যক্তি বিশেষের সুবিধা হইলেও যখন উহা সাধারণের বিশেষ অনিষ্টকর, তখন যে উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। যাঁহারা দেশের আশা ও ভরসা স্থল, তাহারা তাঁহাদের দেশকে সকল কুপ্রথা ও কদাচার হইতে রক্ষা করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দান করুন, তাঁহাদের দেশের জন্য এই উপকার করুন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

আমরা সত্য ও মঙ্গলের নির্দ্দেশে এই প্রবন্ধ আরম্ভ ও সমাপন করিলাম। কোনরূপ হিংসা বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া নহে। অতএব আমাদিগের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

লেখিকা

বঙ্গবাসিনী

ভুল।

যোগেন বাবু কলিকাতার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার পশমের বড় কারখানা ছিল। নূন্যাধিক চারি সহস্র কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনে কাজ করিত। তাঁহার অধুনাতন বিচিত্র বিশাল কলঘর খানা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হন।

ব্যবসা বুদ্ধি যথেষ্ট থাকিলেও, রিপু দমন করিবার শক্তি তাঁহার একেবারে ছিল না। ক্রোধ তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃতি এমনি উগ্র ছিল যে সামান্য ত্রুটি বা ভ্রম তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকিত, এমন কি তাঁহার সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হইত।

শুনা যায়, তাঁহার পত্নীর জীবদ্দশায় তাঁহার স্বভাব এতদূর কঠোর ছিল না। তিনি পত্নীর প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিলেন, এবং স্নেহপ্রাণা নারী তাঁহার রিপুকে কতকটা সংযত রাখিয়াছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ উগ্রভাব ধারণ করে।

যতীন তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাকে শাসনে রাখিতেন ও তাহার প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু ইদানীন্তন তাঁহার কঠোর শাসনে যুবকের স্বাধীন চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। পিতার কথার প্রতিবাদ করিতে তাহার সাহসে কুলাইত না বটে, কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহিভাব ধারণ করিয়াছিল।

শীতের প্রারম্ভে যতীন বাবু বায়ু পরিবর্ত্তনে বাহির হইয়াছিল। নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া যোগেন বাবু একখানি টেলিগ্রাম পাঠ করিতেছিলেন। কলের ঘর্ঘর রবে কর্ণটী কম্পিত হইতেছিল। দূরে কর্ম্মচারিগণের অস্ফুট কোলাহল শ্রুত হইতেছিল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া যোগেন বাবু টেলিগ্রাম খানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখ কঠোর ভাব ধারণ করিল। তিনি অন্য মনস্ক ভাবে ধূম পান করিতে লাগিলেন।

দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিল। যোগেন বাবু উঠিয়া ভৃত্যকে ডাকিতে যাইবেন, এমন সময়ে যতীন সশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিল।

পুত্রকে দেখিয়া বৃদ্ধ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন, "তুমি এসেছ? এত দেরী হ'ল কেন? তোমার টেলীগ্রামের তাৎপর্য্য ত আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাপার কি? বস।

এই বলিয়া বৃদ্ধ পুনরায় উপবেশন

করিলেন। কিন্তু যতীন বসিল না। দণ্ডায়মান হইয়া পিতার কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিল। পিতার কুঞ্চিত ভ্রূ ও কম্পিত ওষ্ঠ দেখিয়া আজ সে ভীত হইল না—তাহার অন্তর টলিল না। এ যাবৎ-কাল সে তাঁহার আদেশ কখন অবহেলা করে নাই, তাঁহার বাক্যের কোনদিন প্রতিবাদ করে নাই। কিন্তু আজ সে স্থির প্রতিজ্ঞ। আজ আর সে পিতার আজ্ঞা কৃতদাসের ন্যায় পালন করিবে না। সে নির্ভিক ও স্থির দৃষ্টিতে পিতার ক্রোধ-রঞ্জিত কটাক্ষ অবলোকন করিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া যোগেন বাবু বলিলেন, "কি! দাঁড়িয়ে কেন? ব'স না।" যতীন নীরবে নিকটস্থ একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। যোগেন বাবু পুনরায় কহিলেন, "তারপর! সব কথা খু'লে ব'ল।"

যতীন পূর্ব্ববৎ নীরব, নিস্তব্ধ। বোধ হয় সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত বল সঞ্চয় করিতেছিল।

যোগেন বাবু তখনই টেলিগ্রামখানি টেবিল হইতে উঠাইয়া লইয়া ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "কাল সন্ধ্যাবেলা আমি এই টেলিগ্রাম পেয়েছি। তোমার এ টেলিগ্রাম পাঠাবার অভিপ্রায় বুঝ্তে পার্‌লাম না। তুমি বিবাহ করিতে চাও! টেলিগ্রামে জানাইবার কি আবশ্যক ছিল? তুমি ত আস্‌বেই। এক-দিন আর অপেক্ষা করিতে পারিলে না?"

যতীন তথাপি বাক্য হীন। কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে কেবল তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল।

যোগেন বাবু। কতদিন তুমি তাহাকে জা'ন?

যতীন। ২ মাস মাত্র। আমি যখন—

তাহার কথায় বাধা দিয়া যোগেন বাবু কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এক দিনের মধ্যেই তুমি এমন অধৈর্য্য হ'য়ে উঠ্‌লে? ২৪ ঘণ্টাও আর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না? এতক্ষণ পর যতীন কথা কহিল, "আমি পূর্ব্বেই আপনাকে টেলিগ্রাম করিতাম, কিন্তু প্রথমে বুঝ্‌তে পারি নাই যে মায়া—"

সহসা সে থামিয়া গেল। পিতার নিকট তাহার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে সে কেমন কুণ্ঠিত হইল।

যোগেন বাবু। বটে, তবে তোমাদের সব ঠিকঠাক হ'য়ে গে'ছে।

যতীন। হাঁ সবই ঠিক হইয়াছে।

তৎপরে আর্দ্রস্বরে সে কহিল, "বাবা আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে তাহাকে দেখিলে আপনার অমত হবে না।"

বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তার বাপ কত টাকা দিতে পারিবে?"

যতীন ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "তা'র বাপ? তা'র বাপ পাঁচ বৎসর হ'ল মারা গেছে। তা'দের বিষয় সম্পত্তি কিছুই নাই। তারা কিছুই দিতে পার্‌বে না। আর আমাদেরই বা টাকার আবশ্যক কি?"

বৃদ্ধ রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "ভাল হয়েছে! আর কিছু বল্‌তে হবে না। আমি তা'র কথা, তা'র ইতিহাস কিছু শুন্‌তে চাই না। তা'রা বোধ হয় টাকার লোভেই তোমাকে বে' কর্‌বার জন্য ধরে পড়েচে। তবে তুমি বেশ জে'নো আমি আমার টাকা অপাত্রে দেব না!"

যতীন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আপনাকে সংযত করিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল "তা'র কথা আমি আপনাকে শুনাইতে চাই নাই। তা'র কথা তুলিবারই আবশ্যক ছিল না।

যোগেন বাবু। আবশ্যক ছিল না বটে। কিন্তু এখন সেই যে অনিষ্টের মূল হইয়াছে। যাক্, তোমরা কিরূপে তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন চালাইতে চাও।"

যতীন। কেন, আমাদের অভাব কি?

যোগেন বাবু। অভাব যথেষ্ট আছে তোমার নিজের কোন সম্পত্তি নাই। আমার অনুগ্রহের উপর তুমি নির্ভর করিতেছ।"

যতীন। আমি কাজ কর্‌ব—যেরূপে পারি অর্থ উপার্জ্জন কর্‌ব।

যোগেন বাবু। ব্যস্ত হইও না। কাজ! কাজের ব্যাপার তুমি কিছুই জান না। ও কথা মুখে বলা বড় সোজা, কিন্তু কাজ বড় শক্ত জিনিষ অনেক কষ্ট করে, অনেক পরিশ্রম করে তবে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে হয়। তোমার এখনও সে শিক্ষা হয় নাই। শোন তবে, আমার মত শোন। আমি স্থির করেছি বড় ঘরে তোমার বিবাহ দিব। গরীব ভিখারীর মেয়ে আমার বাড়ীতে এনে আমি অর্থের অপচয় করিব না।

ঘৃণায় যতীনের হৃদয় জর্জ্জরিত হইল। কিন্তু সহসা পিতার সহিত কলহ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। মনভাব গোপন করিয়া সে সহজ ভাবে কহিল, "আপনার ত টাকার অভাব নাই। তবে বৃথা কেন এত বচসা—তর্কবিতর্ক? আপনার অনুমতি কি পাব না?

যোগেন বাবু। না কখনই নয়! এ বে'তে আমি কখনও মত দিতে পারি না।

স্থির প্রতিজ্ঞ যতীন এবার কঠিন হইয়া কহিল, "বেশ কথা। বিবাহের যখন সব স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন এ বিষয়ে তর্ক নিষ্প্রয়োজন, এখন আপনার কি ইচ্ছা।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তার পর বৃদ্ধ একখানি চেক্‌বই টানিয়া লইয়া লিখিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন, "দেখ, যতীন, যদি তুমি এ সম্বন্ধ ত্যাগ কর, তবে তোমাকে আমি এক লক্ষ টাকার চেক দিব। আর যদি তুমি আমার অমতে বিবাহ কর তবে তোমার সহিত আমার এই শেষ।"

বৃদ্ধের আর বাক্য স্ফুর্ত্তি হইল না। তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। এক মাত্র পুত্রকে তিনি যথার্থই বড় ভাল বাসিতেন। তাহাকে গৃহ হইতে বিতা-

ড়িত করিতে ও তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে বঞ্চিত করিতে বৃদ্ধের কঠিন হৃদয়ও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি কেবল ভাবিতেছিলেন যতীন লক্ষ টাকার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিবে না।

যতীন ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বল সঞ্চয় করিয়া কহিল, "এই আপনার শেষ কথা ?"

বৃদ্ধ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার দেহ কাঁপিতেছিল। তাঁহার একবার মনে হইল যে বিবাদে আর কাজ নাই, পুত্রের প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। কিন্তু মেঘ আসিয়া আকাশের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাকে যেমন আবৃত করিয়া ফেলে, তেমনি গর্ব্ব আসিয়া বৃদ্ধের হৃদয়ের উদ্বেলিত স্নেহকে আবৃত করিয়া ফেলিল।

যতীনের হৃদয়ও আবেগে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আজন্ম-পালিত, বাল্য-স্মৃতি-বিজড়িত গৃহ সহসা ত্যাগ করিতে সেও সঙ্কুচিত হইল। স্নেহময়ী জননীর মুখ তাহার মনে পড়িল, সে মর্ম্মাহত হইল।

যতীন পুনরায় কাতর-কণ্ঠে কহিল, "এই কি আপনার স্থির প্রতিজ্ঞা।" কর্কশ-স্বরে যোগেন বাবু কহিলেন, "আমার আর বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার কর্কশ-কণ্ঠও যেন আবেগে পূর্ণ হইয়াছিল।

উভয়েই নীরব। এবার বৃদ্ধের ধৈর্য্য টলিল। তিনি বিচলিত হইয়া বলিলেন, "নির্ব্বোধ মূর্খ—সামান্য খেয়ালের জন্য তুমি কতটা বিসর্জ্জন করিতেছ বুঝিতে পারিতেছ না ?"

যতীন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বেশ বুঝেছি। কিন্তু বাবা টাকাতে সুখ হয় না। টাকা ত আপনার অনেক আছে কিন্তু তথাপি আপনি অসুখী কেন ? আমি নিঃসম্বল হ'য়েও সুখ পেয়েছি। মনে করেছিলাম, আপনাকেও সুখী করিব। কিন্তু—যাক্।"

যতীন ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। তাহার নয়ন-পল্লব অশ্রু-সিক্ত হইল।

তাঁহার সেই সুবৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে যোগেন বাবু নির্জ্জনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

দিনগুলি নানা প্রকার কাজ-কর্ম্মে কোন মতে কাটিয়া যাইত। কিন্তু সন্ধ্যা-ভ্রমণের পর একাকী গৃহে ফিরিতে তাহার মনটা কেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। সুবৃহৎ চেয়ার পরিবেষ্টিত টেবিলে একাকী ভোজন করিতে কেমন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। শূন্য পরিত্যক্ত চেয়ারগুলি যেন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিত—শূন্য কক্ষাবলী যেন তাঁহাকে তিরস্কার করিত। এ কি! এ যে তাঁহার পক্ষে নির্জ্জন কারাবাস।

বৃদ্ধের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পুত্র ফিরিয়া আসিবে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, নিঃসম্বল পুত্রকে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। অর্থকে তাচ্ছিল্য করিবে এমন শক্তি কাহারও নাই।

কিন্তু দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল, তথাপি যতীনের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সে অতিতের মত একেবারে অন্তর্হিত হইল।

যোগেন বাবু চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহার মন আর কোন মতে সান্ত্বনা মানিতে চাহিল না। তাঁহার শূন্য হৃদয়ে একটা অব্যক্ত ক্রন্দন আসিতে লাগিল। স্নেহের অভাব ও পরিজনের সঙ্গ তাঁহার বুক চাপিয়া ধরিল।

আপনার মনকে শান্ত করিবার নিমিত্ত তিনি ব্যবসায়ে চিত্ত-সংযোগ করিলেন। অন্তর্নিহিত কোমল বৃত্তিগুলিকে আমল না দিয়া তিনি তাঁহার ব্যবসা বৃদ্ধি করিবার মানসে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

তাঁহার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায় সফল হইল। তাঁহার ব্যবসা ফাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার যশ ও প্রতিপত্তি সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ক্রোর মুদ্রা তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

কিন্তু হায়! তাঁহার অর্থ ভোগ করিবে কে? যাহাদের লইয়া যোগেন বাবুর ভোগ সুখ, তাহারা কোথায়? কোথায় তাঁহার স্নেহের পুত্র?—তিনিই যে তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছেন।

পূর্ব্বে কাজের গোলমালে দিনগুলি একপ্রকারে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন অবসরের সময় তাহারা একটা বোঝার ন্যায় হইয়া উঠিল। দুর্দ্দমনীয় মনকে তিনি কোন মতে ঠেকাইতে পারিলেন না, অন্তরের সে অসীম অভাব তিনি কোন মতে পূরণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

ক্রমে সেই জনশূন্য সঙ্গিহীন জীবন যাপন করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিল। পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের আশা যতই ক্ষীণ হইতে লাগিল, গৃহের সেই দারুণ শুষ্কভাব ততই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। আশাহীন, সুখহীন ও নিরানন্দ জীবন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

শেষে তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হইল, অর্থ-মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। পুত্রের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরূপে পারি পুত্রকে ফিরাইয়া আনিব।

পুত্রের অনুসন্ধানের জন্য যোগেন বাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহারা পিতা পুত্রে একত্রে থাকিতেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ যতীনের বন্ধুবান্ধবের কোন খোঁজই রাখিতেন না। যতীন কোথায় খেলাইতে যাইত অথবা কোথায় গল্পগুজব করিত, বৃদ্ধ তাহার কিছুই জানিতেন না।

সুতরাং তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। বহু কষ্টে তিনি যতীনের কয়েকটী বন্ধুর খোঁজ পাইলেন। কিন্তু তাহারা যতীনের

পলায়ন-বৃত্তান্ত কিছুই জানে না। ব্যর্থ হইয়া বৃদ্ধকে ফিরিতে হইল।

যোগেন বাবু স্থির করিলেন যতীনের প্রণয়িনী নিশ্চয়ই যতীনের সংবাদ জানে। কিন্তু বালিকার সন্ধান তিনি কিরূপে পাইবেন? তিনি শুনিয়াছিলেন বালিকার নাম মায়া। কিন্তু নাম ব্যতিরেকে তাহাদের আর কোন খবর তিনি জানিতেন না। এ বিশাল জগতে মায়ার সন্ধান তিনি কিরূপে পাইবেন? পূর্ব্বে যতীনের নিকট বালিকার সমস্ত ইতিহাস শুনেন নাই বলিয়া আজ তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

যোগেন বাবু ভাবনায় অস্থির হইলেন। পুত্রের সন্ধান চিন্তা তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। কাজ কর্ম্ম তাঁহার বিরক্তিকর হইল। অন্নে তাঁহার রুচি রহিল না, রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইত না।

সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সুযোগ মিলিল। একদিন সান্ধ্য-ভ্রমণের পর তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন পথের অপর পার্শ্বে দুইটী যুবক গল্প করিতে করিতে যাইতেছে। "মিহিজাম্ বেশ জায়গা। আমি গত বৎসর পূজার সময় সেখানে গিয়াছিলাম।" যুবকদ্বয় চলিয়া গেল। আর কিছু শোনা গেল না।

মিহিজাম। মিহিজাম! এ জায়গাটার নাম তাঁহার চেনা চেনা বলিয়া ঠেকিল। কোথায় কাহার নিকট এ নামটা তিনি শুনিয়াছিলেন। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল—মিহিজাম্ হইতেই যতীন টেলিগ্রাম করিয়াছিল। মিহিজামেই মায়ার সহিত তাহার সাক্ষাত হয়। হর্ষে তাহার হৃদয় লাফাইয়া উঠিল। মায়ার সন্ধান এবার তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন।

পর দিন পূর্ব্বাহ্নে আহারের পরই একটি ছোট হ্যাণ্ড ব্যাগ লইয়া যোগেনবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলেন ট্রেন ছাড়িতে তখনও অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। এক খানা খবরের কাগজ কিনিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেন ছাড়িলে তিনি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। উত্তেজনায় তিনি ঘড়িটা পর্য্যন্ত ফেলিয়া আসিয়াছিলেন।

ট্রেন ছুটিতে লাগিল। কত মাঠ কত ঘাট, কত ক্ষেত ও কত পথ অতিক্রম করিয়া ট্রেন চলিল। যোগেন বাবু বেঞ্চে বসিয়া ভাবিতেছিলেন—মায়া কত মেয়ের নাম আছে, কিরূপে তিনি বালিকাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন? তাহার আকৃতি প্রকৃতি কিছুই তাঁহার জানা নাই। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হইলেন। তাঁহার উল্লাস ও স্ফূর্ত্তি যেন একটু হ্রাস হইয়া গেল।

মিহিজামে পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। ওয়েটিং রুমে চা পান করিয়া তিনি বাহির হইবেন, সহসা বিনয় বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিনয় বাবুর সহিত ব্যবসা-সূত্রে তাঁহার আলাপ হইয়া ছিল।

সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে সহসা যোগেন

বাবুকে দেখিয়া বিনয় বাবু বিস্মিত হই-লেন। পল্লীটি স্বাস্থ্যকর সন্দেহ নাই, কিন্তু যোগেন বাবুর মতন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি সামান্য।

যোগেন বাবুও বিনয় বাবুকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন. ভাবিলেন বিনয় বাবু নিশ্চয়ই এই পল্লীর পরিচিত, মায়ার সংবাদ হয়ত বলিতে পারিবেন।

যথাযোগ্য সম্ভাষণের পর বিনয় বাবু বলিলেন, "আমি দুইদিনের জন্য এখানে এসেছি। আজ আমার ভগ্নীর জন্মদিন। তা'র নিমন্ত্রণ আর উপেক্ষা করতে পারলাম না।"

যোগেন বাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বিনয় বাবুও যে এখানকার অপরিচিত তাহা তখন বুঝিলেন। ক্ষণেক চিন্তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা! আপনার ভগ্নীর নাম কি মায়া?

এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিস্মিত হওয়া বিনয় বাবু বলিলেন, "না—তা'র নাম লাবণ্য। আমি পচ্ছন্দ করিয়া তা'র এই নাম রেখেছিলাম।"

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা কবিরের কয়েকটী উপদেশ

কবির—সুমিরণ মন্ লাগৈ নাহি, জগসোঁ সমিটা যায়। কহ হিঁ কবির শুন সাধুয়া, তাকা কাঁহা উপায়।

কবির বলিতেছেন স্মরণ করিতে মন লাগেই না। জগতের দৃশ্যমান পদার্থে মন লাগিয়া থাকে, কবির বলেন সাধু শুন তাহার উপায় কি?

কবির—সুমিরণ্ সে মন্ লাগৈ, জগসোঁ হোয়ে নিরাশ।
কায়াকো সুখ ছোড়ি কেয়, জগসেঁা হোয়ে উদাস্।

কবির বলিতেছেন স্মরণ করিতে যখন মন লাগে, তখন জগৎ হইতে মন নিরাশ হয় ও শরীরের সুখ ছাড়িয়া দিয়া জগৎ হইতে উদাস হয়।

কবির—সুমিরণ মন্ লাগৈ নাহি, বিখে হলাহল খায়। কবির হাট্ কানা রহে, করি করি থকে উপায়।

কবির বলিতেছেন স্মরণ করিতে ত মন লাগে না, সুখ হইবে মনে করিয়া হলাহল পান করে।

কবির বলেন, ঐ বিষয়রূপ বিষের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিয়া আবার করিব করিব মনে করে।

কবির চিন্হ য্যাসা হরি জানিয়া, তিন্ হুকো ত্যাসা লাভ

য্যায়সে পিয়াস ন ভজাই, যব লাগি ধসেন আর। ১

কবির বলিতেছেন যিনি, যেমন হরিকে জানিয়াছেন তাঁহার সেইরূপ লাভ, যেমন যত টুকু জল পান করিবে, পিপাসাও তত টুকু নিবারণ হইবে। যখন একেবারে বেশী

পরিমাণে জল পান করিবে তখন পিপাসা আর লাগিবে না। ১

কবির রাম নাম কি লুট হায়, লুটিশকে সোলুট।
ফেরি পাছে পছু তাহুগে, যব তন্ যইহে ছুট। ২

কবির বলিতেছেন রাম নামের লুট হইতেছে, যদি লুটিবার ইচ্ছা হয় তবে লুটিয়া লও, নচেৎ দেহত্যাগের সময় বড় অনুতাপ হইবে। ২

কবির ইস্ দুনিয়ামে আইকোয়,
ছোড়ি দেও তোম অাঁয়েট্।
লেনা হোয় সো লেইলে, উঠি যাতু হায় পায়েট।

কবির বলিতেছেন এই জগতে এক মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়াছ, অহংকার করিও না। আর যদি হরিনাম লইতে হয়ত এই বেলা লও, কারণ দিন দিন তোমার প্রাণ উঠিয়া যাইতেছে অর্থাৎ দিন দিন তোমার আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে)। ৩

কবির কুরু বন্দে তু বন্দেগি,
যো পাওয়ে পাক্ দিদার।
আঁও সব মানুষ জন্মকা,
হোয় না বারম্বার। ৪

কবির বলিতেছেন যদি তুমি ভগবান ব্রহ্মকে পাইয়া থাক তাহা হইলে বন্দনা করিয়া লও, কারণ এরূপ মনুষ্য জন্ম বারম্বার আর হইবে না। ৪

কবির—যোহি মারগ সাঁইমিলে,
তাঁহি চলো করি হোস্।
ফেরি পাছে পাছতাওগে কহেনা মানসা রোষ। ৫

কবির বলিতেছেন যে রাস্তায় ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তাহাতে খুব সাবধানে চলিবে, কারণ তাহা না হইলে পশ্চাতে অনুতাপ হইবে, আর যদি আমার কথা না শুন তাহা হইলে মনেতে রাগ হইবে। ৫

কবির যাঁহা মতিহু ঝালরী
হীরহুকা পরগাশ।
চাঁদ সূর্য্য কি গমি নহি, তাঁহা দরশন্ পাওয়ে দাস। ৬

কবির বলিতেছেন যে স্থানে মতির ঝালর ঝুলিতেছে ও হীরার ন্যায় জ্যোতি প্রকাশ হইতেছে, যেস্থানে চন্দ্র সূর্য্যেরও যাইবার উপায় নাই, এমন স্থলে যাইবার একমাত্র উপায়—যিনি দাস ভাব অবলম্বন করিতে পারেন তিনি (অর্থাৎ নিরহঙ্কারী ব্যক্তি) দর্শন পান। ৬

কবির সুরতি কওঁলমে বইঠকে,
অমী সরোয়র চাখ।
কঁহে কবির বিচারকৈ, তব শন্ত বিবেকী ভাখ। ৭

কবির বলিতেছেন সুন্দর ইচ্ছারূপ কমলে বসিয়া অমৃতরূপ সরোবর রস আস্বাদন কর, কবির বিচার করিয়া কহিতেছেন যে তাহা কেবল শান্ত বিবেকী ব্যক্তিরাই পারেন, অপরে নয়। ৭"

কবির হরি রস্ এয়োপিয়া, বাকি রহিম ছাক।
পাকা কলস্ কোঁ ভারকা, বহুরী চড়ে নহি চাক। ৮

কবির বলিতেছেন হরিরস যে একবার পান করিয়াছে তাহার আর কোন রসের সক্ থাকে না, যেমন পোড়া কলসি আর কুমারের চাকে চড়ে না। ৮

কবির হরিরস মাহঙ্গে পিয়ন্তা,
ছোড়ি জীওয়নকি বাণ।
মাথা সাটে সাঁই মিলে, তব্ত লাগি সুলভ্ জান। ৯

কবির বলিতেছেন হরিরস বড় দুষ্প্রাপ্য, তাহা যদি পান করিতে চাও তাহা হইলে জীবনের আশা ছাড়িয়া দাও, তবে যদি মাথা কাটিয়া দিতে পার তাহা হইলে একদিন সাঁই মিলিবে (তখন সুলভ হইবে)। ৯

কবির বির্ছয়ো ঢুঁড়ে বীজকোঁ, বীজ বির্ছকেমা পাঁহিনিওজো ঢুঁড়ে বর্ম্মকো, ব্রহ্মজিওকে মাহি। ১০

কবির বলিতেছেন বৃক্ষ বীজকে খুজিতেছে কিন্তু বীজ বৃক্ষেতেই রহিয়াছে অথচ খুজিয়া বেড়াইতেছে, এইরূপ সকলে ব্রহ্মকে খুজিয়া বেড়াইতেছেন কিন্তু ব্রহ্ম যিনি তিনি জীবের মধ্যেই রহিয়াছেন।১০

কবির বাদ বিবাদ বীথর ঘনা,
বোলে বহুত উপাধি।
মৌনরূপ যহি হ'র ভজে, সো কোই জানে সাধি।১১

কবির বলিতেছেন বেশী কথা বার্ত্তায় বিষয় বুদ্ধি বাড়িতে পারে, আর অনেক উপাধির কথাই বলে, আর যিনি সাধন করেন, যিনি মৌনভাবে হরির ভজন করেন, তিনিই জানিয়াছেন। ১১

কবির—সুরতি টেকুরিসো লেজুরি,
মন নিতি ভার নিহার
কৌন কুথামি প্রেম রস, পীওয়ে বারম্বার। ১২

কবির বলিতেছেন স্থির মনে টেকুরার সুতা বাহির কর, ও সর্ব্বদা তাহাতে মন ফেলিয়া রাখ, কমলের মধ্যে যে কুয়া আছে তাহাতে প্রেমরসও আছে তাহাই বারম্বার পান কর। ১২

কবির চৈতথি রহেঁা ন বিসরেঁা,
তু পদ দরশিথায়।
এহ অঙ্গ বঁদরো ভলা, যব তুঝ সোঁ মিলিয়া আয়।১৩

কবির বলিতেছেন সর্ব্বদা চিন্তা করিও, ভুলিও না, যেন তোমার পাদপদ্মেতে মন থাকে, এই শরীর যদি বাঁদরের মতন হইয়া যায় সেও ভাল, যদি তোমাতে মিলিয়া থাকিতে পারি, নচেৎ সকলেই বৃথা।১৩

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

নীতিজ্ঞানের পুষ্টিসাধন।

প্রথম প্রস্তাব।

শিশুর জন্ম হইতে সর্ব্বদা উপযুক্ত যত্নের সহিত আমরা যদি তাহার শারীরিক ও মানসিক সকল বিষয় ও বৃত্তির পুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করি, ও তাহার স্বভাব বুঝিয়া ঐ বাল্য প্রকৃতির সকল ভাগের একপ্রকার বৃদ্ধি সাধন করিতে প্রয়াস পাই,তাহা হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে যে কেবল তাহার নীতিজ্ঞানের পুষ্টি সাধনের জন্য প্রস্তুত করা হয়, এমন নয় উহাতে ঐ মহা কার্য্যেরও একপ্রকার আরম্ভ হইয়া থাকে।

শিশুর মানসিক পুষ্টিসাধন হইতে নৈতিক পুষ্টিসাধনের কি কিছু প্রভেদ আছে?—হাঁ আছে, কিন্তু ঐ বিভিন্নতা অতি সূক্ষ্ম। মানসিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ পুষ্টি-সাধনকেই নীতি জ্ঞান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তবে শারীরিক শিক্ষার জন্য শিশুর স্বভাব সম্বন্ধে পিতামাতার সকল বিষয়ে জ্ঞানী হওয়া আবশ্যক। আর তাঁহারা যদি স্নেহ, প্রেম, বিশ্বাস ও দৃঢ়তা দ্বারা ঐ জ্ঞানের চালনা করেন, তাহা হইলে শিশু নিশ্চয়ই সুনিয়মে উহা পালন করিয়া তাহার প্রেম ও ভক্তির পরিচয় দিবে। শৈশব কালের মানসিক শিক্ষার জন্যও ঐরূপ ভিত্তির আবশ্যক। আর পিতামাতা যদি সকল নিয়ম ও শিক্ষা পালন করিয়া চলিতে পারেন,তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর হৃদয়ে যত নৈতিক সাধনের ভিত্তি গাঁথা হইয়া থাকে।

তবে কি নীতি জ্ঞান ব্যতীত যথার্থ বুদ্ধি বিকাশ হওয়া সম্ভব? আমরা দৈনিক অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়াছি যে উহা সম্ভব বটে। আমরা উপযুক্ত নৈতিক উন্নতি বিনা জ্ঞানবুদ্ধির স্থিতি যতই অস্বীকার করি না কেন, আমাদের চারিদিকস্থ মানব জীবনে ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে অনেক অতি উন্নত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান লোকও সর্ব্বদা নীতি জ্ঞানকে অবহেলা করিয়া থাকেন। সেই কারণে শিশুদের শৈশবকাল হইতে নীতিশিক্ষার ধারা আমি এই প্রবন্ধে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন যে শিশুর যত মানসিক সরলতা, সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্মভাব, নীতিজ্ঞানের চর্চ্চা প্রভৃতি গুণ, তাহা সে শৈশবকালে তাহার মাতার নিকট হইতে শিক্ষা করে।

প্রেম, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, ধৈর্য্য, বাধ্যতা, অন্তরাত্মার জ্ঞান ও ধর্ম্ম এ সকলেরই অঙ্কুর শিশুহৃদয়ে তাহার জননীর নিরন্তর প্রবাহিত অপরিসীম স্নেহবারি হইতেই উৎপন্ন হয়। মার প্রতি শিশুর যে আকর্ষণ ও ভালবাসা, তাহাই মানব জাতির সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধতম

প্রেম। ঐ নূতন জীব মাতার নিকট হইতেই ঐ সকল ধর্ম্ম ও উহার চালনা সর্ব্বাগ্রে জানিতে পারে, আর সময়ে উহাই সে তাহার চারিদিকস্থ অন্যান্য মানুষের প্রতি অর্পণ করে, এবং পরে তাহার আত্মা উপযুক্ত রূপে প্রশস্ত ও পরিপুষ্ট হইলে সে ঐ ধর্ম্মভাব ঈশ্বরে সমর্পণ করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিশুবুদ্ধি প্রথম বিকাশ পাইবার সময় প্রেম, বিশ্বাস ও সত্যবাদিতা দ্বারা উহাকে অতি সতর্কভাবে ঘিরিয়া রাখা আবশ্যক। ঐ সকল গুণই মানব জীবনে প্রশস্ত নীতিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি।

মা জননী ভালবাসা শিখাও সন্তানে,
শুধু শিখাইতে পার প্রেম দিয়ে তারে।

এই প্রথম মধুর সুশিক্ষার দ্বারা সন্তানের অন্যান্য গুণেরও পথ পরিষ্কার হয়। ঐ সকল যে শুধু প্রেম হইতে জন্মায় তাহা নহে,কিন্তু প্রেমেতে উহাদের শিকড় বসিয়া যায়। শিশুর বাল্যকালের ভাল বাসার স্বভাব নৈতিক প্রেমের মত একটা গুণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা চরিত্র ও নীতির ভিত্তি স্বরূপ। উহার উপর এমন সকল গুণের মূল স্থাপিত থাকিতে পারে যে সময়ে তাহা দ্বারা প্রেম আরও উন্নত হইয়া নীতিজ্ঞানের সমান হইতে পারে। যে শিশু জন্ম হইতে চিরদিন পিতামাতার স্নেহে ডুবিয়া থাকে ও যাহাকে জননী নিরন্তর প্রেম ও যত্নের সহিত লালন পালন করেন, সে সুস্থ ও সবল হইলে স্বর্গীয় দূতের ন্যায় সতত আনন্দে ভাসিয়া থাকে। তাহার সেই আনন্দ দেখিয়া কেবল পিতা মাতা নহে, যে কেহ তাহার কাছে আসে সেই আনন্দিত হয়। শিশু জীবনের সরল, পবিত্র ও পূর্ণ আনন্দ আমাদের হৃদয়ের প্রতি ছিদ্রে প্রবেশ করে। আমরা অধিক দিন ঐ নির্ম্মল সুখের অধিকারী না হইলেও শিশুর ঐ অপরিসীম আনন্দ দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য ও নিজেদের যত দুঃখ জ্বালা সব ভুলিয়া যাই। দেখ, কেহ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র শিশু কত আহ্লাদ প্রকাশ করে, আর পিতা মাতাকে দর্শন করিলে তাহার ঐ উল্লাস কত অধিক প্রবল হইয়া উঠে। শিশুর আত্মীয়েরা তাহাকে কোলে লইবার জন্য ও তাহাকে সুখে রাখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা কত আয়োজন করিয়া থাকেন, এবং শিশু হাসি, চিৎকার ও লাফালাফি করিয়া কেমন মিষ্টভাবে তাঁহাদের ঐ যত্নের পুরস্কার দেয়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের চক্ষে শিশুদৃশ্যের মত মনোহর দৃশ্য আর কিছু নাই। সন্তান মানব গৃহে উৎকৃষ্ট প্রেমের চিত্র স্বরূপ। তাহার ঐ সৌন্দর্য্য ও মধুরতা পিতা মাতার প্রেমের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে অধিকতর রমণীয় হয়। তাঁহাদিগের স্নেহ দ্বারা ঐ শিশুহৃদয় এইরূপে কর্ষিত হয় যে, ইহার মধ্যেই তাহাতে উত্তম বীজের অঙ্কুর গজাইয়া থাকে, আর সময়ে উহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট ফলের আশা করা যাইতে পারে।

কিন্তু পিতামাতা ভাবিবেন না যে ঐ সকল অঙ্কুর বিনা যত্নে আপনা আপনি

বড় হইয়া সুফল দান করিবে। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের যত্নে কেবল ভূমি প্রস্তুত হইয়াছে মাত্র। আমাদের চারিদিকে অনেক সুন্দর শিশু আছে, কিন্তু প্রত্যেক মাতার কাছে তাঁহার নিজের শিশুই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বোধ হয়। তথাচ সমস্ত জগতে অতি উচ্চ ও মহৎ চরিত্রের এত অভাব যে তাহাতে বোধ হয় জননীগণ বাল্যকালে শিশুদিগকে ক্রোড়ে ধরিয়া যে সব মহাকার্য্যের আশা করেন, তাঁহাদের জীবনের প্রকৃত শিক্ষার অভাবে কিম্বা আর কোন কারণে তাঁহাদের সে সুন্দর বাল্য চরিত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অতি বিভৎস আকার ধারণ করে। শিশুর স্বভাবকে স্বার্থপর ও কর্কশ করিবার এক প্রধান কারণ—তাহাদিগকে সর্ব্বদা নিজের ইচ্ছামত চলিতে দেওয়া। শিশু দিন রাত কতপ্রকার অদ্ভুত দ্রব্যের জন্য বায়না করে, কিন্তু তাহাকে সকল সময়েই তাহার ইচ্ছামত জিনিষ দিয়া সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলে পিতামাতা সন্তানকে পরে যথেচ্ছাচারী ও দুর্দ্দান্ত মানুষে পরিণত করিবেন। বাল্যকালে শিশুর ঐ সকল দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা না থামাইলে সময়ে সে অন্যকে কষ্ট দিয়াও নিজের সুখের জন্য কোন জিনিষ লইতে বা কোন কর্ম্ম সাধন করিতে বিমুখ হইবে না। সুতরাং শিশু যাহাতে না স্বার্থপর হইতে শিখে, তাহার জন্য জননী মাত্রেরই যত্নবতী হওয়া আবশ্যক। শিশুর মনে তাহার সঙ্গী ও অন্যান্য লোকের প্রতি ভালবাসার সঞ্চার করিতে পারিলে ঐ দোষ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। সেই জন্য শিশুর প্রেম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাহাতে নীতি জ্ঞানের ফল উৎপাদন করে, এরূপ করিতে হইলে বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য্য ও বাধ্যতা দ্বারা ঐ প্রেমের পুষ্টিসাধন করা কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ

মিসেস, ডি, এন, দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বড়লাটের কলিকাতা আগমন ও তাঁহার সংবর্দ্ধনা—বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় প্রায় দুই বৎসর পরে বিগত ২৩শে ডিসেম্বর বড় দিনের সময় কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা ক্লাবের সদস্যগণ একটী ভোজ সভার আয়োজন করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন।

লেডী ডাক্তার নিয়োগ—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে এ দেশের মহিলাদিগের চিকিৎসার সুবিধার জন্য জাতীয় সমিতি নামে একটী সভা গঠিত হইয়াছে। উক্ত সভার চেষ্টায় কাউন্টেস অব ডফারিণ ধনভাণ্ডারের ব্যয়ে চব্বিশ জন লেডী ডাক্তারকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শুনা যায় এই লেডী

ডাক্তারদিগের মাসিক বেতন ৩৫০ হইতে ৫৫০ পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম শ্রীযুক্তা যামিনী সেন ইহাঁদের মধ্যে একজন নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা এ দেশের মহিলা ডাক্তারদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

নববর্ষের উপাধিদান—এ বৎসর নববর্ষে বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

মিঃ সৈয়দ আলি ইমান, কে, সি, এস, আই। মিঃ বি, এল, গুপ্ত, সি, এস, আই। ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সি, আই, ই। কৈশর ই হিন্দ (সুবর্ণ পদক) বর্দ্ধমানের মহারাজা বনবিহারী কাপুর। কৈশর-ই-হিন্দ (রৌপ্য পদক) বর্দ্ধমানের অস্থায়ী কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট শশীভূষণ মল্লিক। কুমার দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়, রাজা। খাঁ বাহাদুর মোলবী মহম্মদ আলি নবাব চৌধুরী, ত্রিপুরা, নবাব।

শঙ্করলাল মহেশ্বর শাস্ত্রী, কাথিওয়ার ও পণ্ডিত পরমেশ্বর ঝা বৈয়াকরণ কেশরী, দ্বারবঙ্গ, মহামহোপাধ্যায়।

হরিনাথ রায় ও মিঃ জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী দেওয়ান, বাহাদুর। বাবু কৃষ্ণকালি মুখার্জ্জি, রায় বাহাদুর।

ইংলণ্ডে রাজস্ব আয়—বিগত তিন মাসে ইংলণ্ডে সর্ব্বসমেত ৬৩ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪ শত ৯০ টাকা রাজস্ব আয় হইয়াছে। গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ৮৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত ১৫ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

জৈন উপাধি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "ভারত জৈন মহামণ্ডল" হইতে "সিদ্ধান্ত মহোদধি" উপাধি লাভ করিয়াছেন ও জর্ম্মনীর মিঃ হর্ম্মাণ জ্যাকবি, "জৈন দর্শন দিবাকর" উপাধি পাইয়াছেন।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্যের মৃত্যু—বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্য সার জন মোলস্-ওয়ার্থ ম্যাকফারসন ইংলণ্ডের রিগেট নামক স্থানে এক বন্ধুর বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় তিনি হঠাৎ অবসন্ন হইয়া প্লাটফরমে শুইয়া পড়েন এবং তখনই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইনি অনেক দিন ভারতের নানা বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন।

বৃত্তির ব্যবস্থা—কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারস্থ গোলদীঘীতে যে হেডকনেষ্টেবল হরিপদ দেব দুবৃত্তের গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পত্নীকে মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ শুনা যাইতেছে যে বিধবা যত দিন বাঁচিবেন তত দিন ঐ বৃত্তি পাইবেন। বিধবার পুত্রেরা সাবালক হইবার পূর্ব্বে যদি তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে পুত্রেরা মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া পাইবে।

মার্কিণে ভারতবাসীর প্রবেশ নিষেধ — এইরূপ প্রকাশ যে যে সকল ভারতবাসী অর্থ উপার্জ্জনের জন্য মার্কিনে যাইবে তাহাদিগকে মার্কিন রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

মাদক সেবন করাইয়া চুরি—একজন ভারতবাসী তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। দুইজন প্রবঞ্চক তাঁহার স্ত্রীকে মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া তাঁহার ১৪০০ টাকা ও ১৫০০ টাকার গহনা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

মহিলা সম্মিলন—ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের বিশ্ব বিদ্যালয় সমূহ হইতে যে সকল মহিলা উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে আগমন করিয়াছেন সম্প্রতি তাঁহাদিগের একটী সমিতি গঠনের চেষ্টা হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ উপাধিপ্রাপ্ত প্রায় ১৫০ জন মহিলা বাস করেন। বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সহিত সংশ্রব রাখিয়া যাহাতে ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের উন্নতি করিতে পারেন, তাহার জন্য এক সভা হইবে। একজন সম্পাদিকা ইহার কার্য্য পরিচালন করিবেন।

গিলিয়ন সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

মিষ্টার চেকল্যাণ্ড গিলিয়ানের এই অপ্রস্তুত ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে আর অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনুচিত বিবেচনা করিলেন। এলান থরসবাই এতক্ষণ পর্য্যন্ত মিষ্টার চেকল্যাণ্ড ও গিলিয়ানকে বিস্মিত ভাবে লক্ষ করিতেছিলেন। তিনি তৎপরে মিঃ চেকল্যাণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মিষ্টার চেকল্যাণ্ড! এই যুবতী মহিলাকে আপনি কি নামে সম্বোধন করিলেন? সিটন! না না ইঁহার নাম মিস্ সিটন নহে। ইঁহার নাম মিস্ এডাম।

মিষ্টার চেকল্যাণ্ড রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন, না, মহাশয় ইহাঁর নামই মিস্ সিটন। ইনিই ব্যারন্সকম্বের জমীদারণী। আমি মনে করিয়াছিলাম ইনি বিয়ারিটজে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছেন, এক্ষণে দেখিতেছি আমার ভুল হইয়াছিল।

এলান থরসবাই চেকল্যাণ্ডের এই কথায় গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, ওঃ। আমারও একটু ভুল হইয়াছিল। সে যাউক আসুন মিষ্টার চেকল্যাণ্ড, আমার আফিসে মিলারএণ্ডের বন্ধকের সমস্ত কাগজ পত্র আছে লইবেন চলুন।

এই অপ্রস্তুত অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার এইরূপ সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় মিষ্টার চেকল্যাণ্ড আহ্লাদিত হইয়া এলান থরসবাইয়ের কথার উত্তরে একেবারে দ্বারের সমপবর্ত্তী হইয়া

বলিলেন—হাঁ, নিশ্চয় আসুন সে সমস্ত কাগজ পত্র দেখাইবেন চলুন।

মিষ্টার চেকলাণ্ড, এবং এলান থরস বাই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে গিলিয়ান অবসন্ন ভাবে চৌকিতে বসিয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, কি অশুভক্ষণে মিঃ চেকল্যাণ্ড নর্টন হলে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। হায়! কেন আমি তাঁহার প্রথম দর্শন মাত্রই গৃহ হইতে পলায়ন করিলাম না? এক্ষনে এলান থরসবাই যখন আমি কে তাহা জানিতে পারিয়াছেন তখন আমার নর্টন হলে বাস করিবার উদ্দেশ্য বুঝিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না। মিষ্টার চেকল্যাণ্ড যখন তাঁহার নিকট আমিই যে মিস সিটন ইহা জ্ঞাপন করেন, তখন তাঁহার নয়নে যে কি গভীর ঘৃণা ও রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া গিলিয়ানের হৃদয় যার পর নাই ভয়াকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার পর কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে এলান থরসবাই ধীরে ধীরে পুনরায় বসিবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। গিলিয়ান তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নীরবে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাঁহার মুখ কি গম্ভীর ও অসন্তোষের ভাবে পূর্ণ হইয়াছে! তিনি গিলিয়ানের পার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এলান থরসবাইয়ের পিতামহী চিমনির পার্শ্বে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। সে গৃহে অপর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। এলান থরসবাই গিলিয়ানকে সম্বোধন করিয়া একজন নব পরিচিতের ন্যায় গম্ভীর শিষ্টাচারপূর্ণ স্বরে বলিলেন—মিষ্টার চেকল্যাণ্ডের নর্টন হলে সহসা আগমন ব্যাপারটি আপনার পক্ষে অবশ্য অতন্ত অশুভ জনক হইয়াছে।

গিলিয়ান তাঁহার এই কথায় নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে বলিল—আমার নর্টন হলে আসিবার উদ্দেশ্য যে কি তাহা সমস্ত আপনাকে প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য আজ আমি সঙ্কল্প করিয়াছি।

গিলিয়ানের এই কথায় এলান থরসবাইয়ের আনন হইতে গম্ভীর ও অসন্তোষের ভাব কিছুমাত্র অপসৃত হইল না। তিনি পুনরায় গিলিয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি "আর কতদিন আপনার উপস্থিতিতে নর্টনহলকে সম্মানিত করিবার ও এই প্রহসন অভিনয় করিবার জন্য আপনি সঙ্কল্প করিয়াছেন।

গিলিয়ানের হৃদয় তাহার স্বাভাবিক গর্ব্বিতভাবে পুনরায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে গর্ব্বিত স্বরে উত্তর করিল—যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব আমি নর্টন হল পরিত্যাগ করিতে পারি।

এলান থরসবাই বলিলেন—আমারও তাহাই ইচ্ছা।

গিলিয়ান বলিল—তবে আমি আগামী কল্য নর্টন হল পরিত্যাগ করিব। এলান থরসবাই গিলিয়ানের এই প্রস্তাবে সম্মতি

জ্ঞাপন করিলে গিলিয়ান তাহার স্বাভাবিক গর্ব্বিতভাব যথাসাধ্য গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে এলান থরসবাইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—আপনার অভিমত হইলে আমার নর্টন হলে এইরূপ কাল্পতনামে আসিবার কারণ বুঝাইয়া বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

এলান থরসবাই রুক্ষভাবে বলিলেন—না না, একথা বুঝাইয়া বর্ণনা করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতেছি না।

গিলিয়ান আপনার কম্পিত হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—আমি আপনার সহিত বন্ধুত্ব করিতে এখানে আসিয়াছিলাম। মিস লোথম যে সম্পত্তি আমাকে দান করিয়া গিয়াছেন সেই সম্পত্তি আমি আপনার সহিত বিভাগ করিয়া লইতে ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম। আপনি যখন আমার নিকট হইতে মিস লেথামের প্রদত্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তখন আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। তৎপরে আপনার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সম্পত্তির অর্দ্ধেক আপনাকে গ্রহণ করিতে সম্মত করাইবার সঙ্কল্প সাধন উদ্দেশ্যেই আমি নর্টন হলে আসিয়াছিলাম। আপনি যদি কেবলমাত্র দেখেন যে আমি—

এলান থরসবাই গিলিয়ানকে আর বলিতে অবসর না দিয়া বলিলেন—মিস সিটন যে আমার এই দীন ভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন ইহাতেই আমি যথেষ্ট আনন্দিত হইতেছি। এক্ষণে আমার বিশ্বাস যে এখানেই সমস্ত ব্যাপারের শেষ হইল। আমি এখনই কোন কার্য্যোপলক্ষে ঞিফোর্ড নামক স্থানে চলিয়া যাইতেছি। আগামী কল্য আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আমার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই আপনি আমার ভবন পরিত্যাগ করেন ইহাই আমার ইচ্ছা।

গিলিয়ান অপ্রতিভ হইয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল—আপনি যদি দয়া করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস করেন—

এলান থরসবাই গিলিয়ানের এই কথায় নিরাশার উচ্চ হাসি করিলেন। বাস্তবিক গিলিয়ানের প্রতারণায় এলান থরসবাইয়ের গর্ব্বে ও প্রেমে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। তৎপরে তিনি বলিলেন—

মিস সিটন, বিশ্বাস করা? এইরূপ অসম্ভব বিষয়ের আর উল্লেখ করিবেন না।

গিলিয়ান হতাশ ভাবে একটি চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। এলান থরসবাইয়ের নয়নে রোষাগ্নি উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছিল। গিলিয়ান নিরাশ মনে তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। হায়! এলান থরসবাই আর তাহাকে কখন ক্ষমা করিবেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পর মুহূর্ত্তে বসিবার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া এলান থরসবাই প্রস্থান করিলে গিলিয়ান চিন্তা ভারাক্রান্ত হইয়া একাকী চিমনীর সম্মুখে বসিয়া রহিল। তাহার নয়-

নয়নের সম্মুখে চিমনীর অগ্নি শিখা কেবলই মণ্ডলাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল। গৃহের অপর পার্শ্বে এলান থরসবাইয়ের পিতামহী শান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিলেন। গিলিয়ান চিমনীর অগ্নি শিখাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথম হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত তাহার সঙ্কল্পিত অভিসন্ধির বিষয় চিন্তা করিতেছিল, কিন্তু তাহার অভিপ্রায়ের পরিণাম এ কি বিপরীত হইল? তাহার অভিপ্রায় ও তাহার জীবনের সমস্ত সুখ ধ্বংশ হইল। সে যদি মেরিয়নের উপদেশ মানিয়া চলিত তাহা হইলে তাহার পক্ষে কি সুখের বিষয়ই হইত? মেরিয়ন তাহাকে ছদ্মনামে নর্টন হলে আসিতে নিষেধ করিয়াছিল। সে যদি তাহার নিষেধ শুনিত তাহা হইলে এলান থরসবাইয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত না। তাহা হইলে তাঁহার প্রেম লাভ করিয়া, পুনরায় তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না। এক্ষণে এলান থরসবাইয়ের প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়া অসুখের জীবন লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু তাহার ভাগ্যে যাহাই হউক না কেন, তাহাকে অদ্যই নর্টন হল পরিত্যাগ করিতেই হইবে! এলানের এই আদেশ পালন করিতেই হইবে। গিলিয়ান কতক্ষণ এইরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিল তাহা তাহার স্মরণ ছিল না। কিন্তু সহসা নিকটে অশ্বের দ্রুত পদধ্বনিতে তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন হইল। এলান থরসবাইয়ের নিদ্রিত পিতামহীরও বহিস্থ অশ্বের পদশব্দে এই সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গিলিয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—

ওঃ। দেখিতেছি আমি বহুক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম। প্রিয় মিস্ এডাম। এক্ষণে কয়টা বাজিয়াছে?

গিলিয়ান মিসেস্ থরসবাইয়ের এই কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেন না তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। গভীর কষ্টে তাহার বাকরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই সময় সহসা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; এবং হানা নাম্নী পরিচারিকা দ্বারদেশ হইতে গিলিয়ানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল—মিস এডাম, আমি কি আপনার সঙ্গে এখন কথা বলিতে পারি?

গিলিয়ান তাহার এই কথায় তাহার প্রতি বিস্মিতভাবে দৃষ্টিপাত করিলে, হানা পুনরায় বলিল—

প্রভু এলান থরসবাই যে অশ্বে চড়িয়া কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন সেই অশ্ব শূন্যপৃষ্ঠে কেবলমাত্র রেকাব ও লাগাম সমেত নর্টন হলে একাকী ফিরিয়া আসিয়াছে। আমার বোধ হয় প্রভু এলান থরসবাই কোন স্থানে অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া থাকিবেন। হয়ত তাঁহার ভাগ্যে কোন ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

গিলিয়ান হানার প্রমুখাৎ এই সংবাদ শ্রবণে বজ্রাহতের ন্যায় বিস্মিত ও অধীর স্বরে বলিল—

এলান থরসবাইয়ের অশ্ব শূন্যপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছে?

তৎপরে তাহার আর বাক স্ফূর্ত্তি হইল না। তখন সে বুঝিল যে নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এলান থরসবাই কোন প্রকারে আহত হইয়া অশ্ব হইতে কোন স্থানে পতিত হইয়াছেন, হয়ত তাঁহার জীবন সংশয় হইয়াছে। গিলিয়ানের মনে এই চিন্তার উদয় হইবা মাত্র সে এক বোতল মদ্য লইয়া এবং মস্তকে টুপি পরিধান করিয়া এলান থরসবাই কোথায় আহত হইয়া পতিত হইয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পরিচারিকা হানাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাটীর ভৃত্যগণ ও ক্ষেত্রের কুলিরা সকলে এক্ষণে কোথায় রহিয়াছে জান কি?" পরিচারিকা হানা গিলিয়ানকে ব্র্যাণ্ডির বোতল হস্তে এবং টুপি পরিধান করিয়া গমনে উদ্যত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—

"মিস সিটন, আপনি কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন? বাটীর ভৃত্য ও কুলিরা ক্ষেত্রেতে কে কোথায় কাজ করিতেছে তাহার ঠিক নাই। আজকে আরনল্ড কর্ত্তা স্যাক কারসটোনিকে কোন কাজে পাঠাইয়াছেন। গিলিয়ান হানার কথার উত্তরে বলিল "তোমার প্রভু কোথায় আহত হইয়া পতিত হইয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি।"

হানা বলিল—এখন আপনার যাইবার কোন আবশ্যক নাই। বাটীর ভৃত্য ও কুলিরা শুনিয়া ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিবে।

গিলিয়ান বলিল, আমি এখনই যাই, লাউণ্ড ক্লোজ নামক রাস্তা দিয়া তিনি গ্রিফিল্ডে যাইবেন, আমি জানিয়াছি। সকলকে ক্ষেত্র হইতে ডাকিয়া আনাইয়া লাউণ্ড ক্লোজ রাস্তার উদ্দেশে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিও। গিলিয়ান হানাকে এই কথা বলিয়া রোভার নামক প্রহরী কুকুরকে সঙ্গে লইয়া এলান থরসবাইয়ের সন্ধানে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

গিলিয়ান যখন লাউণ্ড ক্লোজে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। রোভার পথ দর্শকের কার্য্য করিতেছিল। অবশেষে যখন রোভার একটা কর্ষিত ক্ষেত্রের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দসূচক ধ্বনি করিল, গিলিয়ান তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে এখানে থরসবাই সেই কর্ষিত ক্ষেত্রের সিক্ত ভূমির উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত রহিয়াছেন এই দৃশ্য দর্শনে সে ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তৎপরে প্রাণপণে মনে বল সংগ্রহ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত এলান থরসবাইয়ের পার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক কয়েক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি তাহার মুখে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যখন বহু চেষ্টায় অচৈতন্য এলান থরসবাইকে এক ফোটাও ব্র্যাণ্ডি গলধঃকরণ করাইতে পারিল না, তখন সে রোভার দিকে ফিরিয়া বলিল—"রোভার, যাও, বাটী ফিরিয়া যাও, এবং

এলান থরসবাইয়ের ভৃত্যগণকে সাহায্য করিবার জন্য আসিতে বল। মুক পশু রোভারও যেন তাহার প্রভুর এই বিপদ বুঝিতে পারিয়াছিল, সে গিলিয়ানের এই আদেশ শুনিবামাত্র উর্দ্ধশ্বাসে নর্টনহল অভিমুখে পুনরায় ধাবিত হইল।

সেই অন্ধকারময় ক্ষেত্রের উপর মূর্চ্ছিত এলান থরসবাইয়ের শবের ন্যায় রক্তহীন বদন দর্শনে গিলিয়ানের হৃদয় ভয়াকুল ও নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে মনে সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার জ্ঞানোদ্রেক করিবার জন্য তাঁহার শীতল হস্তদ্বয় ঘর্ষণ করিতে লাগিল এবং কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগল "এলান, চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ তোমার অভাবে আমার মৃত্যু নিশ্চয়। আর একবার চেয়ে দেখ।" ঠিক এই সময় এলান থরসবাইয়ের দেহ স্পন্দিত ও নয়নদ্বয় উন্মিলিত হইল। স্বপ্ন হইতে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায় তিনি বিস্মিত কটাক্ষে সেই অন্ধকারের মধ্যে গিলিয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "গিলিয়ান!" এই সময়ে ক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব হইতে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনা যাইল এবং মশালের উজ্জল আলোক তাহাদের উভয়ের উপর পতিত হইল। কয়েক জন মজুর তাঁহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল—"রোভারই আমাদের এ স্থানে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে ঘটনাক্রমে ডাক্তার লিফফোর্ড এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন তাঁহাকেও আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি ডাক্তার লিফফোর্ড এক জন প্রাচীন লোক তিনি অবস্থা দেখিয়া সমস্ত বুঝিয়া লইয়া গিলিয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এক্ষণে আপনার স্থান আমাকে গ্রহণ করিতে দিউন।"

ডাক্তার লিফফোর্ড এলান থরসবাইয়ের পার্শ্বে উপবেসন করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"মহাশয়! এক্ষণে আপনি কিরূপ বোধ করিতেছেন বলুন" এলান থরসবাই অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন আমি মুমুর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়াছি।

ডাক্তার লিফফোর্ড মৃদু হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন—

"না মহাশয় ওরূপ কথা বলিবেন না, আপনাকে আমরা শীঘ্রই সুস্থ ও নিরাপদ করিয়া তুলিব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তর লিফফোর্ড চসমার মধ্য দিয়া গিলিয়ানের প্রতি সকরুণ কটাক্ষ পাত করিয়া বলিলেন "আপনিই কি মিস গিলিয়ান গিটন? আমার বোধ হয় আপনার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিবার জন্য এলান থরসবাই এতদূর ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি তাঁহাকে আপনার সহিত দু এক মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছি। আপনি যাউন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। কিন্তু সাবধান, অধিকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিবেন না।"

গিলিয়ান ডাক্তার লিফফোর্ডের এই

কথায় সলজ্জভাবে জিজ্ঞসা করিল "ডাক্তার, এলান থরসবাই এখন কেমন আছেন ?"

ডাক্তার লিফকোর্ড বলিলেন—"এলান থরসবাই এখন বেশ ভালই আছেন। যদিও তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, তথাপি শুশ্রূষা ও যত্নে তিনি যে শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হউন। অধিকন্তু একটা বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিবার আবশ্যকতা বোধ করিতেছি, সে বিষয়টি এই যে তাঁহার কোন কথার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিবেন না, তিনি আপনাকে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিবেন, আপনি বিনা প্রতিবাদে তাহা শ্রবণ করিয়া যাইবেন। তাঁহার মনে কোন রূপ উত্তেজনা উপস্থিত হইবার কারণ ঘটিতে দিবেন না। এক্ষণে যাউন, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন।" গিলিয়ান যখন বাটীর উপর তলাস্থিত এলান থরসবাইয়ের গৃহে উপস্থিত হইল, সে সময় পূর্ব্ব দিবসের সন্ধ্যাকালের ঘটনা স্মরণ হওয়ায় তাহার গণ্ডদেশ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাকালে এলান থরসবাই অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া মস্তকে গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন, তদবধি গিলিয়ানের সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। গিলিয়ান গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে ডাক্তার লিফকোর্ড প্রেরিত শুশ্রূষাকারিণীর পরিবর্ত্তে এলান থরসবাইয়ের পিতামহীর প্রধানা পরিচারিকা হেনসন এলান থরসবাইয়ের শুশ্রূষা করিতেছে। এলান থরসবাই বালিসে মস্তক স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। গিলিয়ানকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি হেনসনকে গৃহ হইতে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। হেনসন প্রস্থান করিলে, এলান থরসবাই গিলিয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

"প্রিয় গিলিয়ান, তুমি কি আমাকে দেখিতে আসিয়াছ ?"

গিলিয়ান নতবদনে অস্পষ্টস্বরে উত্তর করিল—"হাঁ, আমি আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

এলান থরসবাই বলিলেন—"গিলিয়ান, আমার হাতের উপর তোমার হাত রাখ। আর আমাকে ক্ষমা কর।"

গিলিয়ান ডাক্তার লিফফোর্ডের উপদেশ মত এলান থরসবাইয়ের এই কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহার হস্তের উপর নিজের হস্ত সংস্থাপন করিল। এলান থরসাবই তাঁহার হস্তে গিলিয়ানের হস্ত গ্রহণ করিয়া আপনাকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বলিলেন—"গিলিয়ান! আমি গত কল্য তোমার প্রতি নিষ্ঠুর পশুর মত ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু সেই সিক্ত ভূমিতলে, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া জ্ঞান হারাইবার পূর্ব্বে তোমার প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমার অন্তরদেশ আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু যখন আমার পুনরায় জ্ঞান হইল তখন তোমাকে আমার মুখের উপর নতবদনে আনত

হইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমার মনে এই বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল যে তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ। প্রিয় গিলিয়ান, ইহা কি সত্য নহে?"

গিলিয়ান ধীর ভাবে উত্তর করিল—"আমারও ইহাই মনে হয়, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ক্ষমা করিবার কিছুই নাই।

এলান থরসবাই বলিলেন "সত্য কি ক্ষমা করিবার কিছুই নাই? আমার বিশ্বাস ক্ষমা করিবার অনেক কারণ আছে। আমার বোধ হইয়াছিল—না, না হয়ত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। স্বপ্নে শুনিয়াছিলাম যে তুমি যেন আমাকে মৃত্যুর নিকটস্থ দ্বার হইতে এই বলিয়া আহ্বান করিতেছ প্রিয় এলান, এলান, ফিরে এস, ফিরে এস, তোমার অভাবে আমার মৃত্যু নিশ্চয়।"

গিলিয়ান এলান থরসবাইয়ের কথার উত্তরে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

"লোকে পীড়িত হইলে বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, সেই জন্যই আপনি এই রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।"

এলান থরসবাই বলিলেন "গিলিয়ান, সত্যই কি আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। ইহা কি স্বপ্ন মাত্র? সত্য ঘটনা নহে?" গিলিয়ান বলিল "আপনিই কি বলেন নি যে ইহা স্বপ্নমাত্র।"

গিলিয়ানের এই কথায় এলান থরসবাইয়ের নয়নদ্বয় আনন্দে উজ্জল হইয়া। তিনি সহাস্যে বলিলেন—আমি বলিয়াছিলাম যে ইহা স্বপ্ন হইতে পারে। গিলিয়ান, গিলিয়ান, বাস্তবিক ইহা স্বপ্ন নহে, আমার বিশ্বাস ইহা নিশ্চয় সত্য ঘটনা।"

গিলিয়ান সলজ্জ বদনে বলিল—"হয়ত উহা সত্য ঘটনা হইতে পারে।"

এলান থরসবাই সমুজ্জল বদনে গিলিয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"প্রিয় গিলিয়ান, তুমি কি ব্যারনস্বত্ব জমীদারীর উত্তরাধিকারিত্ব আমার সহিত ভাগা ভাগী করিয়া ভোগ দখল করিতে চাও?"

গিলিয়ান উত্তর করিল—"হাঁ, আপনাকে এক্ষণে জমীদারীর অর্দ্ধেক অংশ গ্রহণ করিতেই হইবে।"

এলান থরসবাই উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন—"হাঁ, আমি গ্রহণ করিব। কিন্তু এক্ষণে অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, আমি সমুদয় সম্পত্তি দখল করিব। আর এই সমুদয় সম্পত্তির সহিত তোমাকেও লইব প্রিয় গিলিয়ান! ইহাতে সম্মত আছত?"

গিলিয়ান সলজ্জ ও রক্তিম বদনে উত্তর করিল "ডাক্তার লিফফোর্ড আমাকে আপনার কোন কথার প্রতিবাদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই জন্যই বিনা আপত্তিতে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতেছি। কেমন আপনি এক্ষণে সন্তুষ্ট হইলেন ত?"

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার যাদুঘরের বয়স প্রায় শত বৎসর হইল। এইবার ইহার একটী উৎসবের আয়োজন করা হইবে। সম্প্রতি যাদুঘরকে জন সাধারণের শিক্ষাগার করিয়া আরও লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য যাদুঘরে নানা বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২। বৈজ্ঞানিক উপায়ে শবদাহের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী যে দাহগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে অধিক শবদাহ হয় না বলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী এক বৎসরের জন্য তথায় বিনা খরচে শবদাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩। ডাক্তার টুলুসে ভিলজিক বাতুলালয়ের প্রধান চিকিৎসক। তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শারীরের মধ্যে বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্রবিষ্ঠ করাইয়া দিলে কয়েক প্রকার উন্মাদ রোগ আরোগ্য হয়। অনেক চিকিৎসক পরীক্ষা দ্বারা এই চিকিৎসা প্রণালীর সাফল্য স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ উন্মাদ রোগ ইহাতে আরোগ্য হয় কি না তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কতকগুলি মস্তিষ্ক রোগ, সন্ন্যাসরোগ ও বিষন্নতা ব্যাধিও এই চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। এই আবিষ্কারে পৃথিবীর লোক উপকৃত হইবে এবং ডাক্তার টুলুসের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৪। ১৮ই জানুয়ারি ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনে বর্ত্তমান কুচবিহারেশ্বরীকে মহিলা সমিতি বিশেষ ভাবে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। সভাস্থলে বহু গণ্য মান্য মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ অভ্যর্থনা সূচক একটী সুমধুর সঙ্গীত হয়, তৎপরে মহারাণীকে তাঁহার উচ্চ আদর্শ স্বরূপ পিতামাতার কন্যা ও পুজনীয় শ্বশ্রূমাতার পুত্রবধূ বলিয়া সমাদর জ্ঞাপণ করা হয় ও তাঁহার উপর— উপস্থিত ও ভবিষ্যৎ রমণীকুলের সকল উন্নতির মূলে তাঁহার সম্পূর্ণ সহায়তা ও উৎসাহ যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করা হয়। পরিশেষে তিনি দীর্ঘ জীবিনী ও জন্ম এয়োতী হইয়া অশেষ সুখ শান্তি ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করুন, ভগবান সমীপে এই প্রার্থনা ভিক্ষা করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

৫। আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে উদ্ভিদ্‌গণের মৃত্যুকালীন আক্ষেপ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

৬। জাতীয় মাহাসমিতির পক্ষ হইতে বিহারের প্রতিনিধি স্বরূপে মিঃ মজাহরুল-হক ও মিঃ এস, পি, সিংহ মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

৭। নেপালের রাজকুমারী তারাদেবী কামিখ্যা হইতে নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন

কালে ছুবলহাটীর রাজপরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছুবলহাটীর রাজকুমারী শ্রীমতী স্নেহলতা পিয়ানো বাজাইয়া তারাদেবীকে সঙ্গীত শুনাইয়াছিলেন। নেপালের রাজকুমারীর অমায়ীক ব্যবহারে রাজ পরিবারের সকলেই যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

৮। সম্প্রতি একজন গুড় ব্যবসায়ী রংপুর হইতে কিছু গুড় কিনিয়া ট্রেনে পাঠাইয়া দেয় এবং অধিক রাত্রি হওয়ায় গুড় ব্যবসাই লোকটা মাল গাড়ীর তলায় শয়ন করিয়া থাকে। প্রাতঃকালে তাহার শয্যা ও গাড়ী প্রভৃতি যথাস্থানে রহিয়াছে কিন্তু লোকটিকে খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা যাইল একটী নূতন পথ লোকটী যে স্থানে শুইয়া ছিল তাহার পার্শ্ব দিয়া অরণ্যের দিকে গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া গমন করিয়া জঙ্গলের মধ্যে এক ভয়ানক অজগর সর্প পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যায়। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সর্পটিকে গুলি করিয়া হত্যা করার পর সর্পটীর উদর হইতে সেই গুড় ব্যবসায়ী লোকটীকে পাওয়া গিয়াছে। সর্পটীর দেহ অনুমান ১০ হাত।

৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোম রাজ্যের ইতিহাস।

২৪৭ পৃষ্ঠার পর ২০শ অধ্যায়।

ডিসেম্ভারেট।

২। তৎকালে গ্রীসের অন্তঃপাতী আথেন্স দেশ পেরিক্লিশ রাজার শাসনে অত্যন্ত বিখ্যাত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিল। রোমকেরা তিন জন বিদ্বান রোমানকে পাঠাইয়া তথা হইতে সোলনের নিয়ম সকল আনাইলেন এবং নগরের ভদ্র লোকদের মধ্য হইতে ১০ জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া এক খানি নিয়ম পুস্তক সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত করিলেন। রোমে তখন আর কোন শাসনকর্ত্তা রহিল না। এক বৎসরের জন্য রাজ্যের সমুদায় ভার তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত হইল এবং দশ ব্যক্তি শাসন কর্ত্তা ছিলেন। এই জন্য তাঁহাদিগের শাসনের নাম, ডিসেম্ভারেট, বা দশনায়ক তন্ত্র হইল।

৩। প্রথম বৎসর ইঁহারা নির্ব্বিবাদে রাজ্য শাসন করিলেন এবং তাহাতে সকল লোক তাঁহাদিগের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু অতিরিক্ত কতকগুলি নিয়মের প্রয়োজন ছিল' অতএব পরবৎসর আপিয়স ক্লিডিয়স নামে এক দুরাত্মা তাহার ৯৮৭ আত্মীয়ের সহিত এই পদে নিযুক্ত হইল।

৪। ইহারা এক্ষণে পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা-দিগের ভাব সকল পরিত্যাগ করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠিল এবং পরিশেষে ভার্জিনিয়া (ক) নাম্নী একটী বালিকার প্রতি অসদাচরণ করাতে (৪৪৭ খৃঃ পূঃ) তিন বৎসরের পর তাহাদিগের ক্ষমতার লোপ হইল এবং তাহারা রোম হইতে দূরীকৃত হইল।

৫। ডিসেম্ভারেটের প্রথম বৎসরে ১০টী এবং পরে আর ২টী নিয়ম পত্র সংগৃহীত হয়, সমুদায়ে ১২টী নিয়ম পত্র হইল। ইহাকেই টোএলভ্ টেবল বলে।

বামা রচনা।

ক্ষণিক সকলিত।

অবোধ জীবাত্মা সবে মহতি জগতি তলে,
সর্ব্বদা শঙ্কিত ভয়ে যে মৃত্যুর নামে,
অগ্রসর হইতেছে প্রতি পলে পলে,
সেই আতঙ্কের স্থল মরণের পানে।

২

বোঝেনা দেখিছে নিত্য চখের সম্মুখে
মরণের অনিবার্য্য লীলা চমৎকার
সঙ্গীহীন হইতেছে পলকে পলকে
তথাপি সকলে বলে আমার আমার।

৩

প্রতিদিন দেখে কত প্রাণহীন দেহ,
তথাপি নিজেকে ভাবে মৃত্যুঞ্জয় বলি,
নিজের মরণ চিন্তা নাহি করে কেহ,
ক্ষণেক ভাবেনা ভবে ক্ষণিক সকলি।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা
ঢাকা।

মদে মত্ত অনুক্ষণ।

অনিত্য বিষয় কেন চিন্তা কর তুমি মন,
লালসা বাড়াবে যত, লালসা বাড়িবে তত,
উঠিবে প্রবল হয়ে হিংসা দ্বেষ রিপুগণ
চিন্তা কর নিজ শেষ, স্মর সত্য নির্ব্বিশেষ,
তারিতে এ ভব-সিন্ধু তরি মাত্র একজন।
ওরে মন তুমি অজ্ঞ সার্থ ত্যাজী হও বিজ্ঞ,

(ক) ভার্জিনিয়া, ভার্জিনিয়স নামে এক রোমানের কন্যা। ঐ বালিকা অত্যন্ত রূপবতী ছিল এক দিবস সে রাজপথ দিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে যাইতেছিল, আপিয়স তাহার রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইল। পরে আপনার অধীনস্থ কোন ব্যক্তিদ্বারা তাহাকে আপনার গৃহে আনাইল এবং ঐ ব্যক্তিকে শিখাইয়া দিল যে সে যেন উহাকে আপন দাসী কন্যা বলিয়া বিচার প্রার্থনা করে। ভার্জিনিয়স তাহার কন্যাকে লইয়া আসিলে ক্লডিয়স স্বয়ং বিচার করিয়া দাসী কন্যা বলিয়াই প্রমান করিল। ইহাতে পিতা আর উপায় না দেখিয়া এক ছুরিকা প্রহার দ্বারা কন্যাকে বধ করিল। লুক্রিসিয়ার মৃত্যুর ন্যায় এই ঘটনাতেও রোমে মহা আন্দোলন হয় এবং ডিসেম্ভারেটদিগের মধ্যে কতক হত ও কতক পলাইত হইলে, ঐ পদ রহিত হইয়া যায়।

যাইতে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশু কর আয়োজন
আমি রাজা আমি ধনী, আমি বড় আমি
জ্ঞানী
ত্যজ এই আত্ম গর্ব্ব ত্যজ এই আস্ফালন,
অসম্পূর্ণ নরগণ, ক্ষুদ্রেতে রহে মগন,
চৌদিকে তটাবদ্ধ পঙ্কনার হ্রদ যেমন
প্রাণ ভরা পাপ ক্ষত, পুতি গন্ধে আমো-
দিত,
রাখেনা সত্যের তত্ত্ব মদে মত্ত অনুক্ষণ।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।
অম্ন রচয়িত্রি।

খোকা।

ভাবিলে জননি! হই নিমগন
বিস্ময়সাগরে আমি।
দিবস রজনী সহ এত ক্লেশ
খোকার কারণে তুমি।
যদিও তোমার স্নেহ ভাল বাসা
সে কিছু বুঝিতে নারে
তবু কর তুমি আহার প্রদান
রক্ষণাবেক্ষণ তারে।

২

নিদ্রার সময়ে কতদিন মাগো!
নাহি পাও ঘুমাইতে.
খোকার কারণ করি জাগরণ
হয় নিশি পোহাইতে।
হয় যদি কভু খোকা আমাদের
পীড়ায় কাতর অতি,
আর (ও) স্নেহ শীলা কোমলতা ময়ী
হও তুমি তার প্রতি।

ছিলাম যখন খোকার মতন
অতিশয় শিশু আমি,
অমনি যতনে লালন পালন
করিতে কি মোরে তুমি?
জননি গো আমি রাখিব গাঁথিয়া
স্মরণ পটেতে নিতি,
দিয়াছ দিতেছ চিরদিন মোরে
কত স্নেহ কত প্রীতি।

৪

কৃপা করি মোরে দাও এই বর
হে বিভো করুণাময়।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে প্রতিদিন যেন
দৃঢ়তম মতি হয়।
হই যেন আমি সত্য নিষ্ঠ আর
সুশীল সন্তান মার
সকল কার্য্যেতে পারি যেন আমি
তুষিতে হৃদয় তাঁর।

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

Nos. 606 & 607. February & March, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৬-৬০৭ সংখ্যা। | মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২০। | ১০ম কল্প। ২য় ভাগ

বুদ্ধদেবের অস্থি আবিষ্কার।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমস্থ পেশোয়ার নগরীর কোন স্থান খনন করিয়া বুদ্ধদেবের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের এই প্রকার কৃতকার্য্যতায় আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। এই সকল প্রাপ্ত অস্থিকে মানবসমাজের বহুমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া সকলেরই হৃদয় পুলকিত হইয়াছে। যদি সকলে এক বার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে এই আবিষ্কার বৌদ্ধ-জগতে কি এক মহা আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। বৌদ্ধগণ এখনও সংখ্যায় পঞ্চ শত লক্ষের ন্যূন নহেন এবং তাঁহারা জাপান, ফরমোজা, কোরিয়া, চিন, তাতার, শ্যাম, আনাম, কম্বোডিয়া, তিব্বত, ব্রহ্ম, নেপাল প্রভৃতি পৃথিবীর নানা স্থানে স্ব স্ব অধিকার বিস্তার করিয়া বাস করিতেছেন। বুদ্ধদেবের অস্থি পৃথিবীর কোন্ বিশেষ স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল, তাহা আর জানিবার কোন উপায় নাই। সেই জন্য এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার যে কেবল বৌদ্ধ-সমাজেই মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে তাহা নহে, ইহা দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকল নর নারীর হৃদয় পুলকিত করিয়া এক বিশ্বজনীন আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে।

কোন্ স্থানে এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও বিদিত ছিল না সুতরাং কেবল কল্পনার সাহায্যে ইহা আবিষ্কার করিতে বহু স্থানে অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল।

খৃঃ পূঃ পঞ্চ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব জীবিত ছিলেন। ভারতবর্ষে সেই সময়কার সর্ব্বসাধারণ প্রথা অনুসারে তাঁহার মৃতদেহের মালব-রাজগণ অগ্নিসংকার

করিয়াছিলেন এবং তৎপরে সেই দগ্ধ অস্থি সকল অতি যত্ন সহকারে সংগ্রহপূর্ব্বক আট ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা এই পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ ইহাদের উপর স্তূপ, অট্টালিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ মৃত প্রভুর স্মৃতিরক্ষার্থ যে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধের মৃত্যুর পাঁচ শত বৎসর পরেও ঐ সকল অস্থিখণ্ড কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, এবং বৌদ্ধ রাজা মহাত্মা কণিষ্ক—যিনি এক সময়ে কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থ গান্ধারনামক স্থানে খৃঃ পূঃ ৪০ চল্লিশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন—তাঁহার অধিকৃত অস্থিসমূহের উপর বৃহৎ বৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি এই অস্থিগুলিকে পবিত্র স্মৃতি জ্ঞান করিয়া অতি বহুমূল্য কারুকার্য্যপূর্ণ স্ফটিকপাত্রে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর নগরের মধ্যে অথবা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এই স্মৃতি রক্ষা করা হইয়াছিল বলিয়া এই নগরী ভবিষ্যতে তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। বহুদূরবর্ত্তী কাথে (Cathay) হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর নানা স্থানের বৌদ্ধগণ তাঁহাদের মৃত গুরুর অস্থি যে যে স্থানে সংরক্ষিত ছিল, তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালীন কোন কোন সাহিত্যসেবী চীন-পর্য্যটক নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং রাজা কণিষ্ক যে সকল মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। Fa Hian ইহাঁদের মধ্যে একজন। তিনি ৪০০ চারি শত খৃঃ অব্দে ঐ স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানের এক মন্দির ৪৭০ চারি শত সত্তর ফিট উচ্চ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। Tao Yung নামক আর একজন পর্য্যটকও বৌদ্ধ স্তূপ সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের বিবরণ সকল পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই সকল মন্দির এবং স্তূপ স্থাপিত হইবার বহু শতাব্দীর পর পর্য্যন্ত এইগুলি সংরক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু Hiuin Thsang ৬২৯ খৃঃ অঃ হইতে ৬৪৫ খৃঃ অঃ এর মধ্যে ঐ স্থানে উপনীত হইয়া উহাদিগকে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। ঝটিকা, বজ্র ও অগ্নির প্রভাবে এই সকল মন্দির বিনষ্ট হইয়াছিল। কালস্রোতে চীন দেশের তীর্থস্থানসমূহের সকল স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে এবং কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর নগরী কোন্ বিশেষ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহার সংবাদ কিম্বদন্তীও আমাদিগকে বলিতে পারে না। মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের অস্থিসমূহ কোথায় রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার আধুনিক বংশধরগণ

তাহার ধারণাও করিতেও পারেন না। বুদ্ধের দেহাবশেষ আবিষ্কার করিয়া ভারতীয় বৃটিশ গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যে যশস্বী হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহাদের এই কৃতকার্য্যতায় সকল ভারতবাসী গৌরবান্বিত হইয়াছেন। গত ১৯০৯ খৃঃ অব্দে এই সকল অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা এমন কি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও অবগত নহেন। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পত্রিকায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। সুতরাং এখানে যাহা যাহা উদ্ধৃত করা হইবে, তাহা এই দ্রষ্টব্য বিষয়ের পূর্ব্বাভাস মাত্র। এই সকল সংবাদপ্রাপ্তির জন্য বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের নিকটে আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

কণিষ্কের রাজধানী বুদ্ধের অস্থি আবিষ্কারের স্থান বলিয়া প্রথমে নির্ণীত হয়। নানা অনুসন্ধানের পর প্রাচীন কালের পুরুষপুর নগরীর স্থান বর্ত্তমান পেশোয়ারেই প্রায় স্থির করা হইয়াছে। তৎপরে কোন্ স্তূপ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রায় ৪০ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক জেনারেল কানিংহাম অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই স্তূপ পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী Sbah-Ji-Ki-Dheria নিকটেই কোনও স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার মূলে কল্পনা ব্যতিরেকে আর কিছু সত্য ছিল না এবং তজ্জন্য তিনিও এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। প্রথমে তিনি পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী Gor Katra নামক স্থানেই ঐ স্তূপ পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সেই স্থানই Gang gate-এর বহির্দ্দিকস্থ একটী গড়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক এই সকল বিষয়ে তাঁহার চিত্ত সন্দেহে এইরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল যে, তিনি অবশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা আর লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। তবে Shah-Ji-Ki-Dhari যে ঐ সকল বহুমূল্য স্মৃতিরক্ষণের ভূমি বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাহা আমরা তাঁহার সরকারী কার্য্য সম্বন্ধীয় লিখিত পত্র হইতে অবগত হই। বর্ত্তমান কালে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এক কথায় শেষ হইবার নহে।

চীন-পর্য্যটকগণ যে সকল বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই সকল উৎসাহী অনুসন্ধানকারীদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

ভূগর্ভে প্রবিষ্ট এই সকল মন্দিরের বিবরণ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অস্পষ্ট এবং কোন কোন স্থানে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। কারণ আমরা Tao

Yung ও Hiuin Thsang এর স্থান নিৰ্দ্ধারণ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাই, কিন্তু সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এই সকল পৰ্য্যটক যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা একবার নির্ণয় করিতে পারিলে স্মৃতিরক্ষণের স্থান নির্দ্ধারণ করা কিঞ্চিৎ সহজ হইয়া আসিত। কিন্তু এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত না হওয়ায় এই বিষয়টী কিছু জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল স্থান নির্দ্ধারণ অল্লাধিক বিজ্ঞানানুমোদিত না হইলে খনন কার্য্য আরম্ভ করা যায় না। কারণ অনির্দ্দিষ্টভাবে এই কার্য্য চালাইতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ১৯০১ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সদেশীয় এক পণ্ডিত Mr. Fouchier "Notes on the Ancient Geography" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, পেশোয়ার নগরীর বহির্দ্দিকস্থ Shah-Ji-Ki-Dheri নামক স্তুপ এত বৃহৎ যে, উহা রাজা কণিক কর্ত্তৃক স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষকে একেবারে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে। অবশ্য ইহা সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, Mr. Fouchier, General Cunningham-এর নিকট হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কারণ General Cunningham Dheri সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কিছুই প্রকাশ করেন নাই। Mr. Fouchier কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহার উপরে তাঁহার সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন যে, চীন পর্য্যটকগণ এই স্তুপকে পুরুষপুর নগর হইতে যত দূরে স্থাপিত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা বর্ত্তমান পেশোয়ার হইতে সেই পরিমাণ দূরবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত ছিল। তিনি আরও একটী কারণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তত্ত্বানুসন্ধানকারী ব্যক্তিদিগের চক্ষে এই Dheri কোন বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বলিয়াই মনে হয়। তৃতীয় কারণ তিনি এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কিম্বদন্তী অনুসারে এই স্থানটী অতি পবিত্র এবং ইহার নিকটে দুইটী স্মৃতিস্তম্ভ আছে। Mr. Fouchier তাঁহার অনুমান সপ্রমাণ করিবার জন্য কোন কার্য্য আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু আমেরিকা-নিবাসী David Brainard Spooner নামক এক পণ্ডিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উল্লিখিত বিষয়ের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ১৯০১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কার্য্য আরম্ভ করেন। Hiuin Thsang-বর্ণিত প্রধান মন্দিরের নিকটবর্ত্তী প্রায় এক শত বৌদ্ধ দেবমন্দির (Pagodas) কোন্ স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা তিনি প্রথমে আরম্ভ করেন। কারণ বৃহৎ মন্দিরগুলি বজ্রপাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই শুনা গিয়াছিল এবং ছোট ছোট মন্দিরগুলি ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়াই সকলের

বিশ্বাস ছিল। যাহা হউক, খনন কার্য্য আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল মন্দির কোন্ দিকে, কিরূপ ভাবে এবং পরস্পর হইতে কতটা দূরবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস কেহই জানিতেন না। সম্পূর্ণ কল্পনার সাহায্যেই এই কার্য্য-আরম্ভ করা হইয়াছিল। সুতরাং কার্য্যারম্ভেই যে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নানা গবেষণার পর কিরূপে কার্য্য আরম্ভ হইবে তাহার প্রণালী স্থিরীকৃত হয়। ৬ ছয় ফিট্ প্রস্থে এবং ১০০ এক শত ফিট্ দৈর্ঘ্যে পাঁচটী পরিখা এরূপ ভাবে খনন করা হইয়াছিল যে, ইহার মধ্যস্থিত মন্দিরগুলি যেরূপ দূরবর্ত্তী স্থানেই হউক না কেন, এই পরিখার মধ্যেই তাহাদের সীমা আবদ্ধ থাকিবে। প্রায় এক শত কুলি এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের অনুমান ঠিক কি না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা গান্ধারা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খনন করিয়া বাহির করিবার অভিপ্রায়ে এক দল কুলি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কারণ কণিক যখন এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, তখন ঐ স্থানে দেবমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা প্রকার স্থপতি ও শিল্প কার্য্যের উন্নতি হইয়াছিল। তৎপরে ৭০ সত্তর ফিট্ গভীর এক পরিখা খনন করিয়া রাস্তা বাহির করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়, কারণ অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, সেই পথ ধরিয়া প্রধান মন্দিরে পৌঁছান যাইতে পারে। কিন্তু ইঁহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অন্য দিকে আর এক দল ৮ আট ফিট্ গভীর আর এক পরিখা খনন করিয়া এক বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হন। ইহার পৃষ্ঠদেশ প্রায় ৮ আট ফিট গভীর ছিল। এই আবিষ্কারে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ইহার উপরেই সেই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত। কিন্তু অবশেষে দেখা গেল যে, উহা কেবল একটী বৌদ্ধ মন্দিরের অলিন্দ মাত্র। এইরূপে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহারা ভগ্নমনোরথ হন নাই। এই সকল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহারা এক প্রকার মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সকল মুদ্রাকে পণ্ডিতেরা অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীর মুদ্রা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারের দ্বারা প্রকৃত কার্য্য সাধনের কিছুই সহায়তা হয় নাই। Dr. Spooner এবং তাঁহার সহকারী ব্যক্তিগণ উল্লিখিত বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের সহিত প্রধান মন্দিরের যোগ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং সেই স্থানকেই তাঁহাদের কার্য্যের কেন্দ্র স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেক দূর খনন করিয়া তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, ঐ প্রাচীর পূর্ব্ব দিকে কিছু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে এবং তাহার গাত্রদেশ হইতে সমকোণভাবে একটী ছোট প্রাচীর দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে কিছু দিন ধৈর্য্য

সহকারে কার্য্য করিবার পর এই প্রাচীরের সমান্তরাল প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়। এই প্রাচীর চূর্ণ বালির দ্বারা আবৃত ও ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের সুবৃহৎ মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা সজ্জিত ছিল। এই সকল বস্তুর সন্ধান পাইয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু তখনও তাঁহারা এই প্রাচীরের শেষ সীমায় উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া তাঁহারা উত্তর দিকে পুনরায় এক পরিখা খনন করেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, এই সকল বৌদ্ধমূর্ত্তি উত্তর দিকেও বিস্তৃত রহিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সজ্জিত নহে। যাহা হউক, এই সকল আবিষ্কারের পর তাঁহাদের ধারণা হয় যে, অন্বেষণ করিলে আরও তিন দিকের প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের অস্থি যে স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল তাঁহারা যে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের আর সন্দেহ ছিল না। উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণসমূহের আবিষ্কারের পর অন্যান্য প্রাচীর এবং দুর্গ আবিষ্কারের উপায় কিঞ্চিৎ সহজ হইয়া আসিয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের শেষভাগে এই স্থির হয় যে, ঐ স্তূপের ব্যাস ২৮৬ দুই শত ছিয়াশি ফিটের ন্যূন হইবে না এবং প্রাচীন হিন্দুস্থানের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্তূপ বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়। ঐ বৃহৎ মন্দির আবিষ্কারের পর রাজা কণিষ্ক বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ যে সকল স্তূপের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা আরম্ভ হয়। মন্দিরের কেন্দ্রস্থানে এই সকল দ্রব্য অন্বেষণ করা হয়। কিছু দিন পর্য্যন্ত কুলিরা এই সকল স্থান খনন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। প্রথমে কোন ফল হয় নাই, অবশেষে যে প্রকোষ্ঠে বুদ্ধদেবের পবিত্র অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রকোষ্ঠ তেমন সজ্জিত ছিল না ইহার উপরে ছাদস্বরূপ যে আবরণ ছিল, তাহা কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান কালে ইহা মৃত্তিকার দ্বারাই আবৃত ছিল। ২।৩ খানি প্রস্তর উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত করিয়া এই প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে পাত্রে অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্নতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যে তিন খণ্ড অস্থি ছিল। এই পাত্রটী স্ফটিকনির্ম্মিত ছয় কোণবিশিষ্ট পাত্র ছিল এবং ইহা একটী ক্ষুদ্র ধাতু পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই পেটিকার উপরিভাগে যে আবরণ ছিল, তাহার মধ্যভাগে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, তাহার চারি পাশে অন্যান্য মূর্ত্তি এবং তাহার দুই দিকে বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি খোদিত ছিল। এই পেটিকার চারি পাশে বুদ্ধদেব এবং তাঁহার উপাসকগণের মূর্ত্তি এবং এক স্থানে রাজা কণিষ্কের মূর্ত্তি খোদিত ছিল। ইহার উপরে খোদিত পুষ্পমালা দ্বারা ইহা বেষ্টিত ছিল। এই সকল দেখিয়া মনে হয় যে, তৎকালীন শিল্পিগণ গ্রীক কলা-বিদ্যার

অনুকরণ করিয়াছিলেন। এই সকল দ্রব্য খনন করিবার সময় কণিষ্কের নামাঙ্কিত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহারা মথুরার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে কণিষ্কের আর এক মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। ভারতীয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গৌতম বুদ্ধের এই উদ্ধারপ্রাপ্ত মূল্যবান্ অস্থি সকল পূজার জন্য নানাদেশের বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন।

কালস্য কুটিলা গতিঃ।

অপ্সু প্রবন্তি পাষাণা মানুষা ঘ্নন্তি রাক্ষসান্।
কপয়ঃ কর্ম কুর্ব্বন্তি কালস্য কুটিলা গতিঃ॥—রামায়ণম্।

আমাদের জীবন যাহার অধীন, শুধু জীবন কেন—জীবনের যাবতীয় কর্ম্ম যাহার অধীন, যাহার অধীনে থাকিয়া আমরা এক স্থান হইতে অন্য স্থান, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হই, সেই আমাদের জীব-জীবনের নায়কটীর নাম সময় বা কাল। কাল কথাটি সাধারণতঃ সময়ের সমষ্টিকেই বুঝায়। দণ্ড, মুহূর্ত্ত, মাস, এমন কি এক তিল সময়কেও আমরা কাল বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। বহুক্ষণব্যাপী সময় যে কাল বলিয়া গণ্য হইবে, আর তন্নিম্ন সময়কে তাহা বলা যাইতে পারিবে না, তাহা নহে। জীব-জীবনের এক তিল সময় কার্য্যানুরোধে কাহারও পক্ষে নগণ্য, কাহারও পক্ষে 'কাল' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। এই কালের গতি অতি বিচিত্র! কেহই তাহার গতিবিধি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে সক্ষম নহে। আমরা সাধারণ চক্ষে যাহা অন্যায় বা অমঙ্গলজনক বলিয়া বোধ করি, তাহাই অন্যের চক্ষে পরম মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল বিধান বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। সুতরাং এমন যে দুর্ব্বোধ কাল, তাহার গতি এইরূপ আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মহাত্মারা বলিয়াছেন, কালের গতি কুটিল। এই কালের প্রভাব অতিশয় প্রবল, বুঝি বা প্রবল বারিধির উত্তাল তরঙ্গ অপেক্ষাও প্রবল, কেহই তাহাকে বাধা দিতে সক্ষম নহে। সেই জন্য, কালের সেই দ্রুতগমনশীলতার জন্য, কবিগণ সাধারণতঃ কালকে 'স্রোতের' সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। এমন যে কাল স্রোত, জীবগণ তাহাতে পতিত হইয়া তরঙ্গোপরি ভাসমান তরণীর ন্যায় বায়ুর গুণাগুণানুসারে কখনও অনুকূলে কখনও বা প্রতিকূলে আপনা আপনি বিধ্বস্ত হইয়া কত ক্লেশ ভোগ করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ঐ তরঙ্গোপরিস্থ তরণীর অনুকূল কোন পদার্থ

নাই, তাহা নহে। সদসদ্‌গুণযুক্ত অনন্ত উপাদান বর্ত্তমান। 'আপনাকে রক্ষার্থ তাহাকে উহার একটীকে না একটীকে অবলম্বন করিতেই হইবে, নতুবা তরঙ্গমধ্যে পতিত হইয়া তাহার স্বসত্তা লোপ পাইবে। জীব সাধারণতঃ ঐ অকূল সমুদ্র পার হইতে সুখতরীর আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকে, ভাগ্যানুসারে উত্তম তরীও মিলিয়া থাকে; কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে পড়িয়া উহারা জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হয়, কিম্বা দৃষ্টিগুণে দেবপ্রার্থিত অমৃতও বিষধর সর্পের বিষ জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে জীব প্রতিমুহূর্ত্তে স্ব স্ব অবলম্বনকে পরিত্যাগ করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে জলবিম্বের নাশ হইবে না, তাহা নহে। বায়ু যখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তখন তরঙ্গমধ্যে অসংখ্য জলকণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন তাহারা বায়ুর সাহায্যলাভে বঞ্চিত হয়, তখন আপনিই ঐ জলরাশির সহিত মিশিয়া যায়। তদ্রূপ এই জীবজগতে অবলম্বনহীন হইয়া কত শত জীব অকালেই লয় পাইতেছে। কিন্তু যিনি এই অকূল সমুদ্রে সুখতরী লাভ করিয়াছেন, তিনি সদানন্দে লিপ্ত থাকিয়া এই ঝঞ্ঝাবাতপূর্ণ সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। এমন যে সাধের সংসার, যাহা এক কালে কত আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও বিষবৎ হইয়া জীব সকলকে কত ব্যথাই না প্রদান করে। সেই ব্যথার যন্ত্রণায় জীব সুখান্বেষী হইয়া ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করে, জানে না কিসে তাহার শান্তি, অথবা জানিলেও সে দিকে মতি আসে না। কিন্তু যাঁহার সুখতরী লাভ হইয়াছে, আত্মার উপর যাঁহার নির্ভরতা আছে, পার্থিব যাবতীয় দ্রব্যের পরিণাম—বিয়োগ, যিনি তাহা স্থির করিয়াছেন, এবং যিনি জানেন যে, এক আত্মার উপর নির্ভরতা ব্যতীত সুখের কিছুমাত্র আশা নাই, তিনি এই দুঃখার্ণব অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। জাগতিক যাবতীয় পদার্থ তাঁহার পক্ষে সমান, তিনি ধনবান্ হইয়াও ধনী নহেন, অথচ দরিদ্র হইয়াও দুঃখী নহেন; তাহার কারণ, পার্থিব পদার্থমাত্রই বিয়োগাত্মক, আর বিয়োগেই দুঃখ। এই বিয়োগাত্মক দ্রব্যকে জীব সাধারণতঃ আপনার একমাত্র শান্তির উপায় বলিয়া তাহার উপর নির্ভর করে, এজন্য পদে পদে বাধা বিঘ্ন ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত হয়। কিন্তু যাহার তাগ নাই, তাহার সকল অবস্থাই সমান। সুতরাং তিনি যদি পরের সংসর্গে আসেন, তবে পরও আপনার হয়। এবম্বিধ ব্যক্তির নিকট কাল অজেয় নহে, কালের কোন আধিপত্য তাঁহার উপর খাটিয়া উঠে না, কারণ তাঁহার দেহস্থ আত্মা অবিনশ্বর ও নির্ব্বিকার। যাহাতে কোন মলিনত্ব নাই, তাহাতে সুখ ব্যতীত কখনও দুঃখ সম্ভবে না। এই আত্মার উপর যাহার যত নির্ভরতা অধিক, তিনি সেই পরিমাণে সুখ লাভ করেন।

কালের কর্ম্মই সমস্ত পার্থিব দ্রব্যের

নাশ। জীবন অল্প, এই অল্প দিনের জন্য আসিয়া দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষা সুখ-ভোগই সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা তাহার উপায় না বুঝিয়া অন্ধকারে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করি। স্বর্ণের অন্বেষণ করিতে যাইয়া নশ্বর কাচের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হই এবং হিতে বিপরীত করিয়া বসি—সুখ লাভ করিতে গিয়া দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হই এবং পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া যাবতীয় ক্লেশ ভোগ করিবার পথ প্রশস্ত করি, শুদ্ধা শান্তি ত দূরের কথা! কিন্তু যিনি তাহা না করিয়া আত্মস্মৃতির উদয় করেন, তিনি জাগতীয় দুঃখ ক্লেশ হইতে মুক্ত হন ও মরণান্তে সচ্চিদানন্দ লাভ করেন। সাধারণ জীবের ন্যায় পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া তাঁহাকে আর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না—মোক্ষই তাঁহার চরম অবস্থা!

সুতরাং আমাদিগকে এই কালের বিচিত্র বিষপূর্ণ মোহের করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে, প্রকৃত সুখ লাভের ইচ্ছা থাকিলে, স্ব স্ব আত্মার উপর নির্ভর করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। কর্ম্ম না করিয়া আমরা থাকিতে পারিব না, কর্ম্ম করিবার জন্যই আমরা জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব কর্ম্মান্তে যাহাতে মুক্তিলাভে সমর্থ হই তাদৃশ কর্ম্ম করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তিব্বত।

আমরা অনন্ত আকাশে যে সকল মেঘ-খণ্ড ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায় দেখিতে পাই, তাহা পৃথিবী হইতে প্রায় ২।৩ মাইল দূরে। সেই গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ মেঘ-রাজ্যে তিব্বত দেশ অবস্থিত। এই দেশ ও দেশবাসীদিগের বৃত্তান্ত অতীব কৌতুকজনক।

তিব্বত দেশ চীন সাম্রাজ্যের একটী অংশ। বহু বৎসর পূর্ব্বে এই দেশবাসিগণ ইহার মধ্যে কোনও বিজাতীয় মানবকে প্রবেশ করিতে দিতেন না। তিব্বত দেশ ভারতের উত্তরে হিমালয় ও কিউএন্‌লন্‌ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। তিব্বত-বাসিগণ এই দেশকে বোদ্‌ অথবা বোদ্‌-গাল (বোদ্‌দিগের বাসভূমি) বলিয়া থাকে। ইহার আয়তন প্রায় ভারতের অর্দ্ধেকের সমান। তিব্বত দেশের দক্ষিণে গগনস্পর্শী হিমালয় পর্ব্বত প্রশস্ত ও উচ্চ প্রাচীরস্বরূপ দণ্ডায়মান। এই হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া যে সকল অপ্রশস্ত পথ (অথবা পর্ব্বতগাত্রস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ) গিয়াছে, তাহা হইতে পাঞ্জাবের নদী সকল বহির্গত হইয়াছে।

তিব্বতে অনেক পথ আছে, উহারা সমুদ্র হইতে ১৬০০০ ফুট উচ্চ। সেই সকল পথ দিয়া ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে যাইতে হয়। তিব্বতে সান্‌পু (Sanpu), ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু (Indus), এই তিনটী

সর্ব্বপ্রধান নদী আছে। কৈলাস পর্ব্বতের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে সিন্ধুনদী (Indus), শতদ্রু (Sutlej) এবং ব্রহ্মপুত্র উথিত হইয়াছে। যেমন প্রবাদ আছে যে, গঙ্গা গোমুখী হইতে নিঃসৃত, তেমনি এইরূপ কথিত আছে যে, সিন্ধু নদী সিংহের মুখ হইতে, এবং শতদ্রু নক্রমুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে।

সিন্ধুনদী এমনি আশ্চর্য্য যে, ইহা গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় এবং দিনমানে কূলে কূলে জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ব্রহ্মপুত্র কৈলাস পর্ব্বতের পূর্ব্ব হইতে উথিত হইয়া তিব্বতের রাজধানী লাসা নগর দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তিব্বতবাসীরা রজ্জুনির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া তথাকার নদী সকল উত্তীর্ণ হয়। যখন পথিকগণ তাহার উপর দিয়া গমনাগমন করে, তখন ঐ সেতু এদিক ওদিকে দুলিতে থাকে।

ঐ রজ্জু বার্চ্চ (Birch) নামক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা দ্বারা জড়াইয়া জড়াইয়া প্রস্তুত করা হয়। তিব্বতবাসীরা সময় সময় বায়ুপূর্ণ মহিষের চর্ম্মনির্ম্মিত (মুষক) তরণীর দ্বারা নদী সকল উত্তীর্ণ হয়। পথিকগণ ঐ মহিষের চর্ম্মনির্ম্মিত মুষকের উপরে উপবিষ্ট হয় এবং মহিষের শরীরের নিম্ন ভাগ অর্থাৎ চারিটী পা উপর দিকে থাকে এবং উহার চালক তাহার পশ্চাৎ দিকে শুইয়া পড়িয়া যেরূপে সাঁতার কাটে সেইরূপে জলে পা ছুড়িতে থাকে। ধনী লোকেরা ঐরূপ দুইটী চর্ম্ম একত্রিত করিয়া তাহার উপর শয্যা পাতিয়া গমনাগমন করে। দ্রব্যসম্ভারও এইরূপে পার করা হয়। তিব্বতের মধ্যে কতকগুলি বড় বড় হ্রদ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির জল ভাল ও কতকগুলির জল লবণাক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হ্রদ মানসসরোবর (Manassarwar)। ইহার দক্ষিণ পশ্চিম চীন তিব্বতের মধ্যে, কৈলাস পর্ব্বতের নিকটে। বায়ু পুরাণে এইরূপ কথিত আছে যে, যখন সমুদ্র স্বর্গ হইতে মেরু পর্ব্বতের উপর অবতীর্ণ হয়, তখন ইহা চারি দিকে চারি বার প্রবাহিত হইয়াছিল; তৎপরে ইহা চারিটী নদীতে, এবং সেই গুলি পুনরায় চারিটী বৃহৎ হ্রদে পরিণত হয়—যথা উরু নদ (Urunada) পূর্ব্বদিকে, সীতদ (Sitada) পশ্চিমে, মহাভদ্র (Mahavadra) উত্তরে, মানস (Manasa) দক্ষিণে। পুরাণে, বলে যে গঙ্গা মানসসরোবর হইতে উথিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ভুল। বস্তুতঃ ইহা হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে উথিত হইয়াছে।

মানসসরোবর হইতে কোন নদী প্রবাহিত হয় নাই। শতদ্রু নদী ইহার নিকটবর্ত্তী পশ্চিমপার্শ্বস্থ "রাবণভদ্রা" হইতে উথিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, দেবতাগণ যে সকল হ্রদ হইতে জলপান করেন, মানসসরোবর তাহাদিগের মধ্যে একটি। পাল্‌টি সংপু ও ভুটানের

মধ্যবর্ত্তী একটী গোলাকার বৃহৎ হ্রদ। ইহার মধ্যভাগে একটী বৃহৎ দ্বীপ আছে।

তেংগ্রিনর (Tengrinor) অর্থাৎ আকাশ হ্রদ পাল্টি হ্রদের উত্তরে ও সংপুর বিপরীত দিকে। কোকোনর (Kokonor) অর্থাৎ নীল হ্রদ চীন অধিকারভুক্ত তিব্বতের উত্তর পূর্ব্বে এবং সমুদ্রের সমতল অপেক্ষা ১০,৫০০ উচ্চে। ইহা ডিম্বাকৃতি ও পরিধিতে প্রায় ২৫০ মাইল। ইহার তীরসমূহ অত্যন্ত বিস্তৃত এবং জল এত লবণাক্ত যে, পান করিবার অযোগ্য। এই হ্রদের চতুর্দ্দিকস্থ তুষারাবৃত পর্ব্বতগুলির নিকট ইহার লবণাক্ত জল গাঢ় নীল বর্ণের ন্যায় দেখায়। ইহা মৎস্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার তীরে অতি অল্পই ধীবর দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ হ্রদের জল জমিয়া থাকে, এবং নবেম্বর হইতে মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত ইহা বরফে আবৃত থাকে। ঐ হ্রদের পশ্চিম পার্শ্বে দাক্ষিণ তীরের প্রায় ১৪ মাইল দূরে ৭ মাইল পরিধিবিশিষ্ট একটী পার্ব্বত্য দ্বীপ অবস্থিত। তথায় একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে, সেখানে ১০ জন লামা অর্থাৎ সন্ন্যাসী থাকেন। গ্রীষ্মকালে তাঁহাদের প্রধান দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, কারণ তখন হ্রদে কোন নৌকা থাকে না। দেশবাসিগণ নৌকার আবশ্যকতা অনুভব করে না। শীতকালে তীর্থযাত্রিগণ তুষার অতিক্রম করিয়া সেখানে গমন করে এবং সন্ন্যাসীদিগের জন্য মাখন ও বার্লি খাদ্য আনয়ন করে। ঐ সময়ে সন্ন্যাসিগণও ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাদের গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া থাকে।

ভুল।

যোগেন বাবু লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বিনয় বাবুকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সহসা কুণ্ঠিতভাবে যোগেন বাবু কহিলেন, "আচ্ছা! আপনি কি আজ আমাকে আপনাদের বাটীতে লইয়া যাইতে পারেন?"

বিনয় বাবু স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। যোগেন বাবুর মত লোক যে বিনা নিমন্ত্রণে তাঁহাদের ক্ষুদ্র কুটীরে অতিথি হইতে স্বীকৃত হইবেন, এ কথা সহসা তাঁহার প্রত্যয় হইল না। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্ম। সুতরাং যোগেন বাবু তাঁহাদের গৃহে যাইতেও পারেন। বিনয় বাবু উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় যোগেন বাবু কহিলেন, "বোধ হয় আমার মত অপরিচিত বুড় লোক আপনাদের বাটীতে গেলে মেয়েদের অসুবিধা হইবে। তবে থাক্, আপনি কুণ্ঠিত হ'বেন না।"

বিনয় বাবু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না না! বরং আপনাকে পেলে তাহারা বিশেষ আপ্যায়িত হ'বে। কিন্তু আমি

ভাবছি মেয়েদের আমোদ প্রমোদ আপনার ভাল লাগ্‌বে কি ?" যোগেন বাবু বলিলেন, "বেশ লাগবে। কিছু ভাব্‌বেন না, আমি পেছনে থাক্‌ব। মেয়েদের কোন রূপ অসুবিধা হবে না।"

বিনয় বাবু বলিলেন "সে কি! আপনি দয়া করিয়া আমাদের বাটীতে যাইবেন, সে ত আমাদের সৌভাগ্য। আমি সন্ধ্যার পর আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব। আমিএখন যাই।"

বিনয় বাবু চলিয়া গেলে যোগেন বাবুও বাহির হইলেন। বালিকার জন্মদিন, তাহাকে কিছু উপহার প্রদান করিতে হইবে। অনেক দোকান ঘুরিয়া অবশেষে তিনি একটা বড় পুতুল ও এক শিশি লজেঞ্জেস সংগ্রহ করিলেন। পল্লিগ্রামে এ সব জিনিষ বড় দুষ্প্রাপ্য।

সন্ধ্যার পরই তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বিনয় বাবুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মায়ার অন্বেষণার্থ বৃদ্ধের হৃদয় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যেন আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছিলেন না।

অচিরেই বিনয়বাবু আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের গৃহ ষ্টেশনের নিকটেই। তাঁহারা গল্প করিতে করিতে শীঘ্রই সেখানে উপনীত হইলেন।

লাবণ্যদের গৃহে পৌঁছিয়া যোগেন বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বালিকাগণের আমোদ-প্রমোদ, তাহাদের হাস্যধ্বনি ও চীৎকার, যোগেন বাবুর প্রাণে নূতন আনন্দ আনয়ন করিল। বালিকাদের সংস্পর্শে তিনি বিশেষ কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

লাবণ্যের পিতা মাতা তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। লাবণ্যও তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত রহিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর লাবণ্যকে কক্ষের পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া অতি সঙ্কোচের সহিত যোগেন বাবু তাঁহার পকেটস্থিত পুতুল ও লজেঞ্জেস তাহাকে প্রদান করিলেন। লাবণ্য অসঙ্কোচে উপহার গ্রহণ করিয়া বলিল, "কি সুন্দর পুতুল! আপনি এ শিশিটা খুলে দিন না। আমরা লজেঞ্জেস খাব।"

নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া যোগেন বাবু শিশিটা খুলিতে লাগিলেন। লাবণ্যও আর একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। স্থানটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত।

শিশি খুলিতে খুলিতে যোগেন বাবু লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এখানে অনেক বন্ধু আসিয়াছে—না ?"

লাবণ্য। হাঁ, এখানে আমরা চারি ঘর ব্রাহ্ম আছি। আমাদের মধ্যে খুব ভাব আছে।

যোগেন বাবু। বটে। আচ্ছা! মায়াও কি তোমাদের বন্ধু ?

লাবণ্য। এখানে আমাদের দুই মায়া আছে—মায়া ঘোষ ও মায়া দত্ত। দুজনেই আমার খুব বন্ধু।

এতক্ষণে শিশির ছিপি খোলা হইল। খোলা শিশি লইয়া নাচিতে নাচিতে লাবণ্য চলিয়া গেল এবং আনন্দে

বন্ধুবর্গের মধ্যে লজেঞ্জেস বিতরণ করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে লাবণ্য ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চলুন না? আপনি এখানে ব'সে আছেন কেন? চলুন, আমরা তাস খেলিগে।"

যোগেন বাবু। আমি ত তাস খেলিতে জানি না। এস আমরা দুজনে গল্প করি। আচ্ছা! বল দেখি, মায়া ঘোষকে তুমি বেশী ভাল বাস, না মায়া দত্তকে?

লাবণ্য বলিয়া উঠিল, "এই যে মায়া ঘোষ আস্চে। তা'র সঙ্গে আপনি গল্প করুন। সকলেই তার সঙ্গে গল্প করিতে ভাল বাসে। আমি তাস খেলিগে।"

তাস-খেলার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া বালিকা প্রস্থান করিল।

মায়া আসিলেই যোগেন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যোগেনবাবুকে দেখিয়া মায়া সঙ্কুচিত হইয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল।

অধীর হইয়া যোগেন বাবু বলিলেন "যাইও না—দাঁড়াও। তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

ভীত হইয়া মায়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। যোগেন বাবু বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বালিকা রূপবতী। তাহার কমনীয় কোমল মুখকান্তি, বিস্ফারিত নীলাভ নয়ন অতি শোভনীয়, সন্দেহ নাই। বালিকা তাঁহার পুত্রবধূ হইবার উপযুক্ত বটে।

যোগেন বাবু দেখিলেন, উত্তেজনায় বালিকার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বক্ষের স্পন্দন স্পষ্ট শ্রুত হইতেছে। সহসা বালিকার হৃদয় এত আলোড়িত হইয়া উঠিল কেন! বালিকা কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে? সন্দিগ্ধ হইয়া যোগেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার ছেলে যতীনকে চেন?"

সুস্পষ্ট কণ্ঠে বালিকা উত্তর করিল, "হাঁ, চিনি।"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া যোগেন বাবু কহিলেন, "সে কোথায় আছে তুমি নিশ্চয়ই জান—কেমন?"

সলজ্জ মৃদু হাস্যে বালিকার বিম্বাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

যোগেন বাবু পকেট হইতে নোট্‌-বুক্ বাহির করিয়া কহিলেন, তা'র ঠিকানাটা আমায় বল দেখি?"

বালিকার হাসি শুখাইয়া গেল। গম্ভীর ভাবে কহিল, "মাপ করিবেন, আমি বলিব না।"।

অপমানে বৃদ্ধের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল। আজ এই সামান্য বালিকা তাঁহাকে যেরূপ অপমান করিল, এইরূপ অপমান তাঁহাকে জীবনে কখন সহ্য করিতে হয় নাই।

ক্রোধে তাঁহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তখনি তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালিকাকে তিনি কোন মতেই টলাইতে পারিবেন না বুঝিলেন।

মায়া পুনরায় উঠিতে উদ্যত হইল।

অঞ্চল-প্রান্ত টানিয়া যোগেন বাবু পুনরায় তাহাকে বসাইলেন। ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "যতীন ভাল আছে ত?"

মায়া! হাঁ। তিনি ভাল আছেন?

যোগেন বাবু। সে কোন্ দেশে আছে?

বালিকা গ্রীবা আন্দোলন করিয়া কহিল, "মাপ করিবেন। আমার আর কোন কথা প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। কেবল যদি তাঁর কোন বিপদ হয়, তবেই তিনি আপনাকে জানাইতে লিখিয়াছেন।" মায়ার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল।

উৎকণ্ঠিত-ভাবে বৃদ্ধ কহিলেন, "বিপদ! তা'র কি কোন বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে? আমাকে বল? আমার জানিবার অধিকার আছে।"

মায়া। এখন আর বোধ হয় আপনার কোন অধিকার নাই। আপনি তাঁর পিতা। কিন্তু আপনিই তাঁহার জীবন দুঃখময় করিয়াছেন।

বিস্ফারিত নেত্রে বৃদ্ধ বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন। সে কটাক্ষে কত নৈরাশ্য, কত বেদনা, কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা লুকায়িত ছিল, বালিকা তাহা বুঝিল। পুত্রের জন্য যে পিতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে মায়া তাহা অনুভব করিল। বালিকার অন্তরে সহানুভূতি ফুটিয়া উঠিল। তাহার নয়নপ্রান্তে যেন অশ্রু দেখা দিল।

হতাশ-দগ্ধ-কণ্ঠে যোগেন বাবু কহিলেন, "তুমি না কি তা'কে ভালবাস? তবু তুমি তা'কে বিপদে ফেলিয়া রাখিতে চাও।"

বালিকা কোন উত্তর দিল না। সঞ্চিত অশ্রু তাহার কপোলে বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মায়াকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া যোগেন বাবু আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "যখন তুমি যতীনকে পত্র লিখিবে, লিখিও যে আমিই ভুল করিয়াছি। সে ঠিক বলিয়াছিল, 'টাকা সব নয়, ভালবাসার সহিত অর্থের তুলনা হয় না'। লিখিও, আমি তাহাকে ভালবাসি। তাহার অসাক্ষাতে আমি বড় কষ্টে আছি। আমার একান্ত অনুরোধ, সে যেন সত্বর গৃহে ফিরিয়া আসে এবং তাহার মনোমত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া সুখী হয়।"

বালিকা এবার হাসিয়া ফেলিল। এক চক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে কান্না লইয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে সে কহিল, "চলুন না কেন, আমরা তাঁহাকে টেলিগ্রাম করে দিই। তিনি তাহা হইলে শীঘ্রই ফিরিতে পারিবেন।"

এতক্ষণে যোগেন বাবুর দুশ্চিন্তা দূর হইল তিনিও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠিক বলেছ। তোমার এত রূপ, এত গুণ, আগে যদি তাহা জানিতাম।"

মায়া লজ্জায় অধোবদনে রহিল।

শ্রীসতীশ চন্দ্র বসু,
ছাপরা।

৺ উমেশচন্দ্র দত্তমহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোমরাজ্যের ইতিহাস।)

২১ অধ্যায়।

সলা ও মেরিয়স।

১। যৎকালে মেথ্রিডেটিস যুদ্ধ অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন সলা ও মেরিয়স, এই দুই রোমান সেনাপতি সেই যুদ্ধে গমন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হন। তাঁহারা উভয়েই উচ্চাভিলাষী ও পরস্পর পরস্পরের দ্বেষী ছিলেন।

২। মেরিয়স সাধারণ লোকের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অতএব তিনি তাহাদিগকে আপনার দলস্থ করিলেন, আর সমস্ত ভদ্রলোক সলার দিকে হইল।

৩। যাহা হউক, উভয়ের মধ্যে অনেক বিবাদের পর সলা সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন।

৪। এখানে সলার অনুপস্থিতিতে মেরিয়স রোম অধিকার করিয়া সকলকে আপনার পক্ষ করিলেন। সুতরাং সলা জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিলে রোমে দুইটি মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে সলা জয়লাভ করিয়া "ডিক্টেটর" অর্থাৎ রোমের সর্ব্বাধিপতি হইলেন।

৫। তিনি দুই বৎসর মাত্র ডিক্টেটর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মধ্যে সেনেটের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করেন এবং সাধারণ লোকের ক্ষমতা অনেক হ্রাস করিয়া দেন। অনন্তর তিনি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কিউমি নামক স্থানে জীবনের শেষাংশ যাপন করেন। ৭৭ খৃঃ পূঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

৬। সলা ও মেরিয়সের ভয়ানক যুদ্ধে রোমের ২০০ সেনেটরের ও ১,৫০,০০০ নগরবাসীর মৃত্যু হয়।

২২ অধ্যায়।

সিজর ও পম্পের বিবাদ।

১। ৬৯৩ রোমাব্দে সিজর ও পম্পের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়।

২। তাঁহাদিগের উভয়ের উচ্চাভিলাষই এ যুদ্ধের নিদানভূত। পম্পে, সিজর ও ক্রীশস এই তিন ব্যক্তি তৎকালে রোম-রাজ্যে প্রধান ক্ষমতাপন্ন থাকাতে প্রথমে তাঁহারা তিন জনে একমত হইয়া রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। এই শাসন-প্রণালী ত্রিনায়ক তন্ত্র বলিয়া উক্ত হইল।

৩। এই একতা বদ্ধমূল করিবার জন্য পম্পে সিজরের কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন।

৪। পরে সিজর গল দেশ, পম্পে স্পেন দেশ ও ক্রীশস সিরিয়া রাজ্য শাসন করিতে সম্মত হইলেন।

৫। সিজর ও ক্রীশস স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। পম্পে রোমে বাস করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা স্পেন শাসন করিতে লাগিলেন।

৬। ক্রীশস সিরিয়াতে গমন করিয়া প্রথমতঃ জেরুজেলেমের দেবমন্দির লুণ্ঠন করিলেন এবং তত্রত্য সমুদায় সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করিলেন।

৭। তিনি তৎপরে পরাক্রান্ত সৈন্যদল সমভিব্যাহারে পার্থিয়ানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, কিন্তু পার্থিয় সেনাধ্যক্ষ সরিনা তাঁহাকে পরাজিত ও অধিকাংশ সৈন্যের সহিত নিহত করিলেন। পরিশেষে তাঁহার প্রবল ধনলোভের শাস্তি দিবার জন্য সিসা গলাইয়া তাঁহার মস্তক পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলেন।

৮। পম্পে আপনার সমকক্ষ লোক দেখিতে পারিতেন না এবং সিজর আপনাপেক্ষা প্রধান লোক দেখিলে ঈর্ষ্যান্বিত হইতেন। সিজর বলিতেন, "রোম নগরের দ্বিতীয় লোক হইবার অপেক্ষা পল্লীগ্রামের প্রথম লোক হওয়া ভাল"। এখন ক্রীশসের মৃত্যু হইলে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকাশ্য বিবাদ ঘটিল। সিজর গলের মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করিয়া রোমে আগমনপূর্ব্বক রাজকীয় ধনাগার লুণ্ঠন করিলেন। পম্পে এবং তাঁহার স্বপক্ষ লোকেরা হতবুদ্ধি হইয়া রোম হইতে পলায়ন করিল।

৯। পরে সিজর ও পম্পে স্ব স্ব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফার্জেলিয়ার রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সেখানে এক ঘোরতর সংগ্রাম হইল, পম্পে তাহাতে এককালে পরাস্ত হইলেন এবং তাঁহার সেনানী সকল ছিন্ন ভিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর পম্পে নিঃসাহস ও হীনবল হইয়া আফ্রিকায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু সিজরের প্রণয়ভাজন হইবে বলিয়া এক ব্যক্তি সেখানে তাঁহাকে হত্যা করিল।

১১। সিজর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ছিন্ন মস্তক দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইজিপ্টে গিয়া সিজর ক্লিওপেট্রা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী রাজ্ঞীর প্রেমে মুগ্ধ হন এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া তদীয় ভ্রাতার প্রাণ সংহারপূর্ব্বক ঐ রাণীকে মিসরের রাজসিংহাসন প্রদান করেন।

১২। যুদ্ধে জয়ী হইয়া সিজর রোমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ইম্পারেটর বা মহারাজ এই উপাধি পাইয়া চিরজীবনের জন্য রোমের শাসনকর্তৃপদে অধিরূঢ় হইলেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার হস্তগত হইল। বস্তুতঃ এই সময় হইতেই রোমের সাধারণ তন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। রোমে সেনেট বলিয়া যে মহাসভা ছিল,—যাহা রোমানদিগের যাবতীয় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ, তাহার সমুদায় ক্ষমতা লুপ্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে রোম অরাজকপ্রায় হইয়া উঠিল।

১৩। সিজর এক্ষণে রোমের একাধিপতি হইয়া দয়া ও হিতৈষিতাগুণ প্রদর্শন করতঃ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত রোমরাজ্যের

উপর আপনার নিয়ম প্রচলিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক অভ্যুদয় ও সমুন্নত ক্ষমতা তাঁহার মৃত্যুর পথ প্রস্তুত করিল। তাঁহার বিপক্ষেরা রোমের স্বাধীনতার জন্য ব্রুটস (ক) ও কেসিয়স কর্ত্তৃক আনীত হইয়া সেনেটগৃহে তাঁহাকে আক্রমণ ও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিল। ইহাতে তাঁহার সমুদায় ভাবি-আশাও বিনষ্ট হইয়া গেল।

৩য়—সাম্রাজ্য-তন্ত্র

১ম অধ্যায়।

জুলিয়স সিজর ও অগষ্টস।

১। জুলিয়স সিজরের মাতৃকুল রোমের অতি প্রাচীন ভদ্রবংশ এবং তাঁহার পিতৃকুল রাজবংশীয় ছিল। তাঁহার জীবন নানাবিধ অদ্ভুত ঘটনাতে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে পঞ্জিকা সংশোধন ও আলেক্জেন্দ্রিয়ার পুস্তকালয়ের ৪ লক্ষ পুস্তক ধ্বংস, এই দুইটী প্রধান বলিয়া বিখ্যাত।

২। সিজরের পূর্ব্বে নিউমা ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করিয়া যান। কিন্তু সিজর তৎপরিবর্ত্তে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বৎসর প্রচলিত করিলেন। তিনি আরও সুবিধার জন্য ঐ ৬ ঘণ্টা পৃথক্ ধরিয়া চারি বৎসরের পর ৩৬৬ দিনে বৎসর গণনা করিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই বৎসরের নাম জুলিয়ান বর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৩। সিজর অতি সুবিদ্বান্ ও তৎকালীন প্রধান সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত কতকগুলি বক্তৃতা ও ইতিহাস অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কথিত আছে, তাঁহার এরূপ গুণ ছিল যে, তিনি এককালে সমান মনোযোগের সহিত লিখিতে, পাঠ করিতে ও শ্রবণ করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রণীত ইতিহাসের কোন কোন স্থান অলঙ্কারের মতে দূষণীয় বটে, কিন্তু ইহা অতি সরল ও মনোহর প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য সকল জাতির লোকেই ইহার প্রশংসা ও আদর করিয়া থাকেন।

৪। সিজরের মৃত্যু হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত রোমে শান্তি স্থাপন হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছিল। অনন্তর মার্ক আণ্টনী এক গোলযোগ করিয়া আত্মপক্ষে অনেক লোক একত্রিত করিলেন।

৫। সিজরের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পৌত্র অক্টেভিয়স সেনেটরদিগের সহিত যোগ করিয়া প্রথমে আণ্টনীর বিপক্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদিগের মধ্যে সন্ধি হইল এবং লেপিডসের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা দ্বিতীয় ত্রিনায়ক তন্ত্র স্থাপন করিলেন।

৬। এই শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত

(ক) এই দ্বিতীয় ব্রুটস প্রথম ব্রুটসের বংশজাত। ইনি পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় এক মহাপুরুষ ছিলেন।

হইলেই চতুর্দ্দিক বিবাদ কলহে পূর্ণ হইল এবং রোম অবিশ্রান্ত শোণিতপ্রবাহে প্লাবিত হইতে লাগিল। এই তিন শাসন-কর্ত্তা আপনাদিগের বিপক্ষ ও সিজরের শত্রুগণের বিনাশার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহাদিগের ক্রোধখর্পরে প্রথমেই সু-বিখ্যাত সবক্তা শিশিরোর বলিদান হইল। সেনেটরেরা ব্রুটস ও কেসিয়সের হস্তে সমস্ত সৈন্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই নূতন শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত পেসালীতে তাঁহাদিগের এক ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহাতে পরাজিত হইয়া তাঁহারা আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত রোমের স্বাধীনতার আশাও বিনষ্ট হইল।

৭। ব্রুটস ও কেসিয়সের মৃত্যু হইলে অক্টেভয়স ও আণ্টনীর মধ্যে সংগ্রাম ঘটিল। ইহার অনতিপূর্ব্বে তাঁহারা লেপিডসকে হতপরাক্রম ও দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া আপনাদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা পরস্পরের শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইলেন। আক্টিয়মের রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া আণ্টনী ইজীপ্টে পলায়ন করিলেন এবং তথায় মিসররাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইলেন।

৮। এক্ষণে অক্টেভিয়সের সৌভাগ্যলক্ষ্মী চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি আলেক্জাণ্ড্রিয়াতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার হস্তে পতিত হইবার ভয়ে আণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা আত্মনাশ করিলেন। অতঃপর মিশর রোমের একটী প্রদেশ হইল।

৯। যুদ্ধে জয়ী হইয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলে সেনেটরেরা অক্টেভিয়সকে সম্রাট্ অগষ্টস বলিয়া সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অগষ্টসের রাজত্বে সমস্ত রোমজনপদ পুনর্ব্বার সুখশান্তিতে পূর্ণ হইল এবং জেনস দেবের মন্দিরের দ্বার পুনর্ব্বার রুদ্ধ হইল। এই সময় যিশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন এবং এই সময় হইতেই রোম সাম্রাজ্য-তন্ত্রের সম্পূর্ণ অধীন হয়।

১০। অগষ্টস ৪৪ বৎসর রোমের উপর একাধিপত্য করেন এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬ বৎসর রোম শাসন করেন। ১৪ খৃষ্টাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে কাম্পেনিয়ার অন্তঃপাতী নোলানামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সকলজাতীয় লোকের নিকটেই মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন হিন্দু রাজাদিগের সহিত তাঁহার কথোপকথন চলিত, ইহার দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি বিদ্যাবিষয়ে যথার্থ উৎসাহী থাকাতে এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে মর্য্যাদা ও আশ্রয় প্রদান করাতে রোমানেরা জ্ঞান-শিখরের অতি উচ্চ সীমায় উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই বর্জিল, হোরেস, ফিলড্রস, ওভিড, কাটুলস, টিবিউলস, প্রপার্টস এবং টাইটস ভিভিয়স প্রভৃতি মহাত্মাদিগের উদয় হওয়াতে আবার জ্ঞান ও বিদ্যাজ্যোতিতে রোম সমুজ্জ্বল হয় এবং এই সময় অগষ্টস্

পিরিয়ড্ অর্থাৎ সুবিখ্যাত অগষ্টসের সময় বলিয়া বিখ্যাত হয় (ক)

২য় অধ্যায়।

টাইবিরিয়স ও কালিগুলা।

১। টাইবিরিয়স নিরোর পুত্র। তাঁহার মাতার নাম টলিয়া। অগষ্টস তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

২। তিনি অতি অসচ্চরিত্র ছিলেন এবং তাঁহার নিষ্ঠুরতা, অর্থস্পৃহা, অত্যাচার এবং গর্ব্বিত স্বভাবের নিমিত্ত সকলের নিকটেই ঘৃণাস্পদ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ জার্ম্মনিকসের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া অবশেষে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার প্রাণবধ করিয়াছিলেন।

৩। টাইবিরিয়স ২২ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করিবার পর কালিগুলা তাঁহার উত্তরাধিকারী হন।

৪। কালিগুলা টাইবিরিয়সের ভ্রাতুষ্পুত্র। জার্ম্মনিকস তাঁহার পিতা এবং এগ্রিপিনা তাঁহার মাতা ছিলেন।

৫। তাঁহার রাজত্বের প্রথম লক্ষণ দেখিয়া প্রজারা সুখী হইবে প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি আপনার যথার্থ স্বভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহার রাজত্বে রোমের কোন ভদ্রকুলবালার সতীত্ব রক্ষা পায় নাই। তিনি স্বীয় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য এক বৎসরে ১৮ কোটী টাকা নাশ করেন, যাহাকে ধনী বলিয়া তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল তাঁহাকেই কালগ্রাসে প্রেরণ করেন এবং আপনাকে দেবতা বলিয়া সকলের নিকট পূজা পাইবার জন্য নিয়ম করেন। তিনি তাঁহার ঘোটককে রোমের কন্সল করিবেন মনঃস্থ করিয়াছিলেন এবং একটী বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সমুদায় রোমের যদি এক কণ্ঠ হইত, তিনি এক আঘাতেই তাহা ছেদন করিয়া ফেলিতেন।

৬। তাঁহার অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা এরূপ দুঃসহ হইল যে, অবশেষে ৪১খৃষ্টাব্দে তাঁহার আপনার লোকে এক ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত করিল। তিনি ৩ বৎসর, ১০ মাস ৮ দিন রাজত্ব করেন। ক্লডিয়স তাঁহার উত্তরাধিকারী হন।

ক্লডিয়স ও নিরো।

১। ক্লডিয়স জার্ম্মনিকসের ভ্রাতা, টাইবিরিয়সের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ড্রেসসের পুত্র ছিলেন।

২। তিনি অতি দুর্ব্বল, নির্ব্বোধ ও ভীরুস্বভাব ছিলেন। যৎকালে তিনি সম্রাটের পদ পাইলেন, তখন পাছে হত হন, এই ভয়ে অট্টালিকার এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

৩। তিনি ৫০ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পালাস, নার্সিয়স প্রভৃতি কয়েকজন প্রিয় ব্যক্তি ও মেসেলিনা এবং এগ্রিপিনা নামক তাঁহার দুই

(ক) অগষ্টসের সময় আমাদিগের মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সমকাল। এই সময়েই কালিদাস, বররুচি, ঘটকর্পর প্রভৃতি নবরত্নের জ্যোতিতে ভারতবর্ষও জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছিল।

অসচ্চরিত্র স্ত্রীর মতেই তিনি সকল কার্য্য করিতেন। ব্রিটেন জয় তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা। তাঁহার দুইটী মহিষীর মধ্যে প্রথমা মেসেলিনা তাঁহাকে অবমাননা করাতে তিনি তাঁহার প্রাণবধ করেন, দ্বিতীয়া জার্ম্মনিকসের কন্যা এগ্রিপিনা ১৩ বৎসর রাজত্বের পর বিষপান করাইয়া তাঁহাকে নিহত করেন। তাঁহার রাজত্বে ৩৫ জন সেনেটর ও ৩০০ নাইট হত হয়।

৪। এগ্রিপিনা স্বীয় পুত্র নিরোকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ইনি প্রথমে অতি নম্র ও শান্তস্বভাব ছিলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ বরহস ও তাঁহার শিক্ষক সেনেকার উপদেশে প্রশংসিতরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে পেপিয়া নামে এক দুষ্ট স্ত্রীলোক ও টিজিলিনস নামে এক দুরাত্মা সঙ্গীর পরামর্শে তিনি এরূপ নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, অসুরাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, এই দোষের দণ্ডের জন্য তিনি তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। পরম বিশ্বাসী বরহসকে বিষ প্রয়োগে হত করিয়া সততার পুরস্কার দিলেন এবং সেনেকার প্রাণবধ করিয়া শেষ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার পত্নী ক্লডিয়সের কন্যা অক্টেভিয়া, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ থ্রোসিয়ার এবং অন্যান্য অসংখ্য লোকেরও প্রাণ সংহার করেন।

৫। তিনি অবাধে ধনব্যয় করিয়া "স্বর্ণাট্টালিকা" বলিয়া এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং ট্রয়নগরদাহ প্রদর্শনার্থে রোমে অগ্নি প্রদান করিয়া তাঁহার ছাদে বসিয়া আনন্দে বীণাবাদন করিতে লাগিলেন। খৃষ্টানদিগের উপর তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল। তাঁহাদিগের উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। অনেককে বন্য পশুর গ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া এবং অবশিষ্টদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন। এই অত্যাচারের পর সেণ্টপলের শিরশ্ছেদন এবং সেণ্টপিটরকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিধন করেন।

৬। নিরো সর্ব্বলোকের ঘৃণাস্পদ হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিল এবং পরে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এক ক্রীতদাসের হস্তে হত হন। ইনি সিজর-বংশের শেষ সম্রাট্। ৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে ও ১৪ বৎসর রাজত্বের পর নিরোর মৃত্যু হয়।

আদি ব্রহ্মসমাজে প্রদত্ত

১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উপদেশ

দিনতো যাবেই—এমনি করেই তো দিনের পর দিন গিয়াছে। কিন্তু সব মানুষেরই ভিতরে এই একটি বেদনা রয়েছে যে, যেটা হবার সেটা হয়নি। দিন

তো যাবে, কিন্তু মানুষ কেবলি বলেছে—হবে, হবে, আমার যা হবার তা আমাকে হতেই হবে, এখনো তার কিছুই হয় নি। তাই যদি না হয়ে থাকে, তবে মানুষ আর কিসে মানুষ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? পশু তার প্রাত্যহিক জীবনে তার যে সমস্ত প্রবৃত্তি রয়েছে তাদের চরিতার্থতা সাধন করে যাচ্ছে, তার মধ্যে তো কোন বেদনা নেই। এখনো যা হয়ে ওঠবার তা হয় নি, এ কথা তো তার কথা নয়। কিন্তু মানুষের জীবনের সমস্ত কর্ম্মের ভিতরে ভিতরে এই বেদনাটী রয়েছে—হয় নি, হয় নি, যা হবার তা হয় নি, কি হয় নি? আমি যা হব ব'লে পৃথিবীতে এলুম তাই যে হলুম না, সেই হবার সংকল্প যে জোর করে নিতে পারলুম না। আমার পথ আমি নেব, আমার যা হবার আমি তাই হব—এই কথাটি জোর করে বল্‌তে পারলুম না বলেই এই বেদনা জেগে উঠছে যে হয় নি, হয় নি—'দন আমার বৃথায় ব'য়ে যাচ্ছে। গাছকে, পশুপক্ষীকে তো এ সংকল্প করতে হয় না—মানুষকেই এই কথা বল্‌তে হয়েছে যে আমি হব—এ সংকল্প যে মানুষকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ সংকল্পকে সে দৃঢ়ভাবে ধরতে পারছে না, এই কথা সে জোর করে বলতে পারছে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ পশুপক্ষী, তরুলতার সঙ্গে সমান। কিন্তু ভগবান্ তাকে তাদের সঙ্গে সমান হতে দেবেন না, তিনি চান যে তাঁর বিশ্বের মধ্যে কেবল মানুষই আপনাকে গড়ে তুলবে, আপনার ভিতরকার মনুষ্যত্ব-টিকে অবাধে প্রকাশ করবে। সেই জন্য তিনি মানুষের শিশুকে সকলের চেয়ে অসহায় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—তাকে উলঙ্গ করে দুর্ব্বল করে পাঠিয়েছেন। আর সকলোর জীবন রক্ষার জন্যে যে সকল উপকরণের দরকার তা তিনি দিয়েছেন, বাঘকে তীক্ষ্ণ নখ দন্ত দিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ কি তাঁর আশ্চর্য্য লীলা যে, মানুষের শিশুকে তিনি সকলের চেয়ে দুর্ব্বল, অক্ষম ও অসহায় করে দিয়েছেন—কারণ এরি ভিতর থেকে তিনি তাঁর পরমাশক্তিকে দেখাবেন। যেখানে তাঁর শক্তি সকলের চেয়ে বেশি থেকেও সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, সেই খানেই তো তাঁর আনন্দের লীলা। এই দুর্ব্বল মনুষ্যশরীরের ভিতর দিয়ে যে একটি পরমা শক্তি প্রকাশিত হবে এই তাঁর আহ্বান।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর সব তৈরি, চন্দ্র সূর্য্য তরুলতা সমস্তই তৈরি, কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে পাঠিয়েছেন। সকলের চেয়ে অসহায় করে মায়ের কোলে যাকে পাঠালেন, সেই যে সকলের চেয়ে শক্তি-শালী ও সম্পূর্ণ হবার অধিকারী, এই লীলাই তো তিনি দেখাবেন। কিন্তু আমরা কি তাঁর এই ইচ্ছাকে ব্যর্থ করব? তিনি বাইরে আমাদের যে দুর্ব্বলতার বেশ পরিয়ে পাঠিয়েছেন, তারি মধ্যে আমরা আবৃত থাকব—এ হলে আর কি হল? এ পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্ব্বলতা নেই—এই পৃথিবীর ভূমি কি নিশ্চল অটল,

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন কক্ষ-পথে কি স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত -এখানে একটি অণুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই, সমস্তই তাঁর অটল শাসনে, তাঁর স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি ময়ূরকে নানা বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে দেন নি—তার ভিতর রঙের একটা বাটী দিয়ে বলেছেন, তোমাকে তোমার নিজের রঙে সাজতে হবে। তিনি বলেছেন তোমার মধ্যে সবই দিলুম, কিন্তু তোমাকে সেই সব উপকরণ দিয়ে নিজেকে কঠিন করে, সুন্দর করে, আশ্চর্য্য করে, তৈরি করে তুলতে হবে, আমি তোমাকে তৈরি করে দেব না। আমরা তা না করে যদি যেমন জন্মাই তেমনিই মরি, তবে তাঁর এই লীলা কি ব্যর্থ হবে না ?

কি নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন যাচ্চে ? প্রতি দিনের আবর্ত্তনে কি জন্যে যে ঘুরে মরছি তার কোনো ঠিকানাই নেই। এ সংকল্প আর নেওয়া হইল না— আমি মানুষ হব, আমি মহত্ত্বের পথে যাব, আমি স্বার্থে বিজড়িত হব না, আমার ভিতরে যে শক্তি নিহিত রয়েছে, আমি তাকে প্রকাশিত করব—এ কথা আর জোর করে সমস্ত মনকে দিয়ে বলাতে পারলুম না। আজ যা হচ্চে কালও তাই হচ্চে, একদিনের পর কেবল আর এক দিনের পুনরাবৃত্তি চলচে—ঘানিতে জোতা হ'য়ে আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি—একই জায়গায়। এর মধ্যে এমন কোন নূতন আঘাত পাচ্ছি না যাতে মনে পড়ে আমি মানুষ। কয়েদীদের ঘানিতে জুড়ে দিয়ে তাদের কাছে থেকে তেল আদায় করে— আমাদের কি সেই কাজ ? সেই একই জীবনযাত্রার অন্তহীন পুনরাবৃত্তি ? এই সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক অভ্যস্ত কর্ম্মে আমরা কি পাচ্ছি, আমরা কি জড় করছি ? এই সব জীর্ণ বোঝার মধ্যে একদিন কি এম্‌নি ভাবেই জীবন পরিসমাপ্ত হবে ? এ সব কি তুচ্ছতার মধ্যে, রাশীকৃত জঞ্জালের মধ্যে, ঘুরে বেড়াচ্ছি —দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি—তাই তো মনে পড়েনা, মন ভুলে যায়—ভগবান্ আমাদের ভিতর কি দিয়ে পাঠিয়েছেন, কত বড় শক্তিকে আমরা বইছি। অভ্যাস, অভ্যাস—তারি জড় স্তূপের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি, তারি উপরে যে আমাদের এক দিন ঠেলে উঠতে হবে সেই কথাটিই ভুলে যাচ্ছি। মলিনতার উপর কেবলি মলিনতা জমা হচ্ছে—অভ্যাসকে কেবলি বেড়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে—এমনি করে নিজের কৃত্রিমতার বেড়ার মধ্যে সঙ্কীর্ণ জায়গায় আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি—বিশ্ব ভুবনের আশ্চর্য্য লীলাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। দেখ্‌বার বেলা দেখি—উপকরণ, আসবাব, বাঁধা নিয়মে জীবন যন্ত্রের চাকা চালানো। তাঁর আলো আর ভিতরে আস্‌তে পথ পায় না, চিত্তে এসে পৌঁছোয় না-ঐ সব জিনিষগুলো আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাদের কাছে আস্‌বেন

ব'লে দিয়েছেন—তুমি তোমার আসনখানি তৈরি ক'রে দাও, আমি সেই আসনে বসব, তোমার ঘরে গিয়া বস্‌ব। অথচ আমরা যা কিছু আয়োজন কর্‌ছি সে সবই নিজের জন্যে—তাঁকে বাদ্‌ দিয়ে বসেছি। জগৎ জুড়ে, শ্যামল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি আপনাকে বিকীর্ণ করে রয়েছেন, কেবল একটুখানি কালো জায়গা, আমাদের হৃদয়ের সেই কালো কলঙ্কে মলিন ধূলিতে আচ্ছন্ন সেই একটু মাত্র কালো জায়গাতে তাঁর স্থান হয় নি, সেইখানে তাঁকে আস্‌তে নিষেধ ক'রে দিয়েছি। সেই জায়গাটুকু আমার, সেখানে আমার টাকা রাখব, আস্‌বাব জমাব, ছেলের জন্য বাড়ীর ভিৎ কাটব—সেখানে তাঁকে বলি,—তোমাকে ওখানে যেতে দিতে পার্‌ব না। তোমাকে ওখান থেকে নির্ব্বাসিত করে দিলুম। তাই এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি যে, যে মানুষ সকলের চেয়ে বড়, যার মধ্যে ভূমার প্রকাশ, সেই মানুষের কি সকলের চেয়ে অকৃতার্থ হবার শক্তি হোল? আমাদের যে সেই শক্তি তিনিই দিয়াছেন। তিনি বলেছেন—আর সব জায়গায় আমি রয়েছি, কিন্তু তোমার ঘরে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না। তিনি বলেছেন—তোমরা কি আমাকেই ডাকবে না? তোমাদের সুখে দুঃখে আমাকে ডাকবে না? তোমরা যা ভোগ করচ, আমাকে তার একটু অংশ দেবে না? যারা কেড়ে নেবার লোক তারা কেড়ে নেয়—তারা অনাদর সইতে পারে না। আর যিনি দ্বারের বাইরে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—তাঁকেই বলেছি, তোমাকে দিতে পারব না। দিনের পর দিন কি এই কথা ব'লে আমরা সব ব্যর্থ করি নি? এক দিন আমাদের এ সংকল্প নিতেই হবে—বল্‌তে হবে, আমার ধন জন মান, আমার সমস্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি, জীবন যৌবন তোমারি জন্যে। প্রতিদিন যদি বা ভুলে থাকি, আজ একদিন অন্ততঃ বলি, তোমারি জন্য আমার এই জীবন। হে স্বামি! তোমাকে না দিয়ে কি আমি আমাকে ব্যর্থ কর্‌লাম? না, তোমাকেই ব্যর্থ কর্‌লাম। তুমি যে বলেছিলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা অমৃতের পুত্র। তুমি যে বলেছিলে তুমি বড়, তোমার জীবন সংসারের সুখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে থাকবে না। সেই পিতৃসত্য যে আমাদিকে পালন করতেই হবে, তাকে ব্যর্থ করলে যে তোমাকেই, তোমার সত্যকেই ব্যর্থ করা হবে।

সেই জন্যে, সেই সত্যকে স্বীকার করবে ব'লে এক একটা দিনকে মানুষ পৃথক্‌ ক'রে রাখে। সে বলে রোজতো ঘানি টেনেছি, আর পারিনে—একটা দিন অন্ততঃ বুঝি যে আনন্দ লোকে অমৃত লোকেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, কারাগারের মধ্যে নয়। সেই দিন উৎসবের দিন। সেই দিনকে প্রতিদিনকার দিন করতে হবে। প্রতিদিন নিজেকে কত অসত্য ক'রে দেখেছি, কত অসত্য ক'রে

জেনেছি—এক দিন আপনাকে অনন্তের মধ্যে দেখে নিতে হবে। বিশ্বের বিধাতা হয়েও তুমি আমার পিতা—পিতা নোঽসি —এত বড় কথা একদিন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাতেই হবে। আজ ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তির কাছে প্রণাম; প্রতিদিন সেইখানে মাথা লুটিয়েছি এবং সেই ধূলি জঞ্জালের নীচে কোন্ তলায় তলিয়ে গিয়েছি। আজ সমস্ত জঞ্জাল দূর করে দিয়ে যিনি আমার দরজায় যুগ যুগ ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁকে ডাক্‌ব—পিতা নোঽসি, তুমি আমার পিতা। যে দিন সব ধন মান সার্থক হবে, সে দিন কোন অভাবই আর অভাব থাক্‌বে না।

মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে, সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে কি কর্‌লে সে স্বর্গ লোকের অধিকারী হ'তে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরি কর্‌তে হবে। এই সংসারকেই তোমার স্বর্গ কর্‌তে হবে। সংসারে তাঁকে আন্‌লেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এত দিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে? সে সংসারকে ত্যাগ ক'রে কেবলি দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচার বিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে? তার ঘর ভরা শিশু, তার মা বাপ ভাই বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী—এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে? না তিনি বলেছেন, তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ কর্‌ব আর সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গ-সৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভাবি আত্ম-নিবেদনের অপেক্ষায় এত বড় একটা চরমসৃষ্টি হ'তে পারে নি। সর্ব্বশক্তিমান্ এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব্ব করেছেন, এক জায়গায় তিনি হার মেনেছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্ব্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে ক'রে নিয়ে আস্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্গরচনা অসম্পূর্ণ রইল। আর সব সৃষ্টি বড় হ'তে পারে, কিন্তু তাঁতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি, এমন সৃষ্টি আর কোথাও নেই। এই জন্যে যে তিনি যুগযুগান্ত ধ'রে অপেক্ষা কর্‌চেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কত কাল ধ'রে অপেক্ষা করেন নি? আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী, এমন শস্য-শ্যামলা হয়েছে, কত বাষ্প দহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ শীতল হয়ে, তরল হয়ে, তার পরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধ'রে তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনো বাকি। বাষ্প আকারে যখন পৃথিবী ছিল, তখন তো এমন সৌন্দর্য্য ফোটেনি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কি অপরূপ

সৌন্দর্য্য দেখা দিয়েছে। ঠিক তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েচে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠেনি। তাঁর সেই রচনা-কার্য্যে তিনি আমাদের সঙ্গে ব'সে গিয়েছেন, কিন্তু আমরা কেবল খাব পরব সঞ্চয় করব এই ব'লে ব'লে সমস্ত ভুলে ব'সে রইলুম। তবু এ ভুলতো ভাঙবে, মরবার আগে একদিন তো বল্‌তে হবে, এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলাম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলাম। অনেক অপরাধ স্তূপাকার হয়েছে, অনেক সময় ব্যর্থ করেচি, তবু ক্ষণে ক্ষণে একটু সৌন্দর্য্য ফুটেছিল। জগৎসংসারকে কি একেবারেই বঞ্চিত করে গেলাম? অভাবকে তো কিছু পূরণ করেচি, কিছু অজ্ঞান দূর করেচি—এই কথাটি তো ব'লে যেতে হবে। দিন যাবে, এ দিন যাবে। এই আলো চোখের উপর মিলিয়ে যাবে। সংসার তার দরজা বন্ধ করে দেবে, তার বাইরে প'ড়ে থাক্‌ব। তার আগে কেন ব'লে যেতে পার্‌ব না, কিছু দিতে পেরেচি। প্রতি দিন ভুল্‌লেও একদিন সংকল্পকে নিতেই হবে।

আমাদের সৃষ্টি করবার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। তিনি যে নিজে সুন্দর হ'য়ে জগৎকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, এ নিয়ে তো মানুষ খুসী হয়ে চুপ করে থাক্‌তে পার্‌ল না। সে বল্‌লে, আমি ঐ সৃষ্টিতে আরো কিছু সৃষ্টি করব। শিল্পী কি করে? সে কেন শিল্প রচনা করে? বিধাতা বলেছেন, আমি এই যে উৎসবের লণ্ঠন সব আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছি তুমি কি আল্‌পন আঁক্‌বে না? আমার রসুনচৌকিতো বাজ্‌ছেই—তোমার তম্বুরা কি একতারাই না হয় তুমি বাজাবে না? সে বল্লে হাঁ, বাজাব বৈকি! গায়কের গানে আর বিশ্বের প্রাণে যেমনি মিল্‌ল অম্‌নি ঠিক গানটি হ'ল। আমি গান সৃষ্টি কর্‌ব ব'লে সেই গান তিনি শোন্‌বার জন্যে আপনি এসেচেন। তিনি খুসী হয়েছেন—মানুষের মধ্যে তিনি যে আনন্দ দিয়েচেন, প্রেম দিয়েচেন, তা যে মিল্‌ল তাঁর সব আনন্দের সঙ্গে—এই দেখে তিনি খুসী। শিল্পী আমাদের মানুষের সভায় কি তার শিল্প দেখাতে এসেচে? সে যে তাঁরি সভায় তার শিল্প দেখাচ্চে তার গান শোনাচ্চে। তিনি বল্‌লেন—বাঃ এ যে দেখ্‌ছি আমার সুর শিখেচে, তাতে আবার আধ আধ বাণী জুড়ে দিয়েছে—সেই বাণীর আধখানা ফোটে আধখানা ফোটে না। তাঁর সুরে সেই আধফোটা সুর মিলিয়েছি শুনে তিনি বল্‌লেন—খুসি হয়েছি। এই যে তাঁর মুখের খুসি না দেখ্‌তে পেল সে শিল্পী নয়, সে কবি নয়, সে গায়ক নয়। যে মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে মানুষ কবে জয়মাল্য দেবে এই অপেক্ষায় ব'সে আছে, সে কিছুই নয়। কিন্তু শিল্পী কেবলমাত্র রেখার সৌন্দর্য্য নিল, কবি সুর নিল রস নিল। এরা কেউই সব নিতে পারল না। সব নিতে

পাওয়া যায় একমাত্র সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁরি জিনিস তাঁর সঙ্গে মিলে নিতে হবে।

জীবনকে তাঁর অমৃতরসে কাণায় কাণায় পূর্ণ করে যে দিন নিবেদন করতে পারব সে দিন জীবন ধন্য হ'বে। তার চেয়ে বড় নিবেদন আর কি আছে? আমরা তো তা পারি না। তাঁর নৈবিদ্য থেকে সমস্ত চুরি করি, কৃপণতা করে বলি নিজের জন্য সবই নেব, কিন্তু তাঁকে দেবার বেলা উচ্ছিষ্ট মাত্র দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তাঁকে সমস্ত নিবেদন করে দিতে পারলে সব দরকার ভ'রে যায়, সব অভাব পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বল্‌চি আজ সেই জীবনের পরিপূর্ণ নিবেদনের দিন। আজ বলবার দিন—তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে বসিয়েছিলে কিন্তু আমি ভুলেছিলুম, আমি সব জুড়ে নিজেই ব'সেছিলুম। তোমার সঙ্গে বস্‌ব এ গৌরব ভুলে গেলুম! তোমাতে আমাতে মিলে বস্‌বার যে অপরূপ সার্থকতা এ জীবনে কি তা হবে না? আজ এই কথা বলব—আমার আসন শূন্য রয়ে গেছে। তুমি এস, তুমি এস, তুমি এসে একে পূর্ণ কর! তুমি না এলে আমার এই গৌরবে কাজ কি, আমার ধূলার মধ্যে ভিক্ষুকের মত প'ড়ে থাকা যে ভালো। হায় হায়, ধুলো বালি নিয়ে বাস্তবিকই এই যে খেলা করছি এই কি আমার সৃষ্টি? এই সৃষ্টির কাজের জন্যই কি আমার জীবনের এত আয়োজন হয়েছিল? মাঝে মাঝে কি পরম দুঃখে পরম আঘাতে এগুলো ভেঙে যায় নি? খেলাঘর একটু নাড়া দিলেই প'ড়ে যায়। কিন্তু তোমাতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি তা কি একটু ফুঁয়ে এমনি করে প'ড়ে যেতে পারে? খেলাঘর কত যত্ন করেই গ'ড়ে তুলি, যে দিন আঘাত দিয়ে ভেঙে দেন সে দিন দেখিয়ে দেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে একলা সৃষ্টি করবার কোন সাধ্য আমাদের নেই। সে দিন কেঁদে উঠে, আবার ভুলি, আবার ছিদ্র ঢাকাবার চেষ্টা করি—এমনি করে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

সব কৃত্রিমতা দূর করে দিয়ে আজ এক দিনের জন্য দরজা খুলে ডাকি—হে আমার চির দিনের অধীশ্বর, তোমাকে এক দিনের জন্যেই ডাকলুম। এই জীবনে শেষ নয়, এই পৃথিবীতেও শেষ নয়, আমি যে তোমার দর্শনার্থে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি। ঘুরেই চলেচি, দেখা মেলেনি। আজ সব রুদ্ধতার মধ্যে একটু ফাঁক করে দিলাম, দেখা দিয়ো। অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা না কর, পরমানন্দের কণা একটীও যদি না দাও তবু এ কথা বলতে পারব না—ওগো আমি পারলুম না। আমি ক্লান্ত, অক্ষম, দুর্ব্বল, আমি জবাব দিলুম, আমার সব পড়ে রইল—এ কথা বল্‌ব না। তোমার জন্য দুঃখ পেলাম এই কথা জানাবার সুখ যে তুমিই দেবে। দুঃখ আমার নিজের জন্য পেলে খেদের অবসান থাকে না। হে বন্ধু, তোমার জন্য বড় দুঃখ পেয়েচি এ কথা বলবার অধিকার

দাও। সমস্ত সংসারের দীর্ঘ পথ দুঃখের বোঝা ব'য়ে এসেচি—আজ দিলুম তোমার পায়ে ফেলে। তুমি যে আনন্দ, তুমি যে অমৃত এই কথাটি আজ স্মরণ করব, সেই স্মরণ করবার দিনই এই মহোৎসবের দিন।

অসতো মা সদ্গময়। অসত্যে জড়িয়ে আছি, তোমার সঙ্গে মিল্‌লে তবে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে মিলন হবে, মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে অমৃত লোকে মিলন হবে। বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করচে, তেমনি আমার জীবনকে করবে। রুদ্র, তুমি আজ বড় রুদ্র হয়ে আছ, আজ সংসারের অন্ধকারের মধ্যে আছি। কিন্তু দাও তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি, তাহ'লে নিত্য রক্ষা পাব—দুঃখ থেকে রক্ষা পাব না, দুঃখকে বরণ করে নেব। দুঃখ যে তোমার সব চেয়ে বড় সম্পদ্—কিন্তু তোমার দক্ষিণ মুখ যদি না দেখতে পাই তাহলে দুঃখ যে অত্যন্ত দুঃখ হয়। পারব না রুদ্র পারব। পাব রক্ষা পাব। আমার দরজা আজ একটু-খানি উদ্‌ঘাটন কর, দয়া কর। একটু-খানি খুলে দেখিয়ে দাও, আমার দরজার ঠিক পাশেই তুমি দাঁড়িয়ে আছ। একবার তোমার সেই মুখের জ্যোতিটুকু হৃদয়ের মধ্যে দাও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত)

রসায়ন।

সায়নোজেন বা নীলজন।

CYANOGEN—CN or CY.

CN = 26.

ইতিহাস—১৮১৪ অব্দে গে লুসাক্ (Gay Lussac) সাহেব ইহা আবিষ্কার করেন। অঙ্গার যবক্ষার জনের সহিত সংযুক্ত হইয়া সায়নোজেন নামক পদার্থ উৎপন্ন করে। ইহা হইতে অনেক নীলবর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে নীলজন কহে।

শতাংশিকের —০ অংশ উষ্ণতায় ৭৬০ মিলিমিটর চাপে ১১'১৯ লিটর সায়নোজেনের ভার ২৬।

ধর্ম্ম=ইহা বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ। ইহার প্রকার বিশেষে গন্ধ আছে। জলে অধিক দ্রব হয়। ইহার গন্ধ পিচফলের আটির গন্ধের অনুরূপ। ইহার দহনে $C_2 O_3 N$ উৎপন্ন হয়। চাপ ও শৈত্য সহযোগে ইহাকে তরল ও কঠিন করা যাইতে পারে। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। সায়নোজেন যৌগিক পদার্থ হইলেও ভূত পদার্থের

ন্যায় ইহার পরমাণু অপরাপর দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। এজন্য ইহাকে যোগরূঢ় পদার্থ কহে ; এবং এই নিমিত্তই ইহার অপর চিহ্ন cy হইয়াছে।

প্রস্তুত-প্রণালী—

১। মার্কিউরিক্ সিয়ানাইডকে উত্তপ্ত করিলে cy বিমুক্ত হয়, পারদ (Hg) থাকিয়া যায়। যথা—

$$Hg\ cy_২ = Hg + cy_২$$
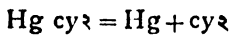
২। অঙ্গার ও যবক্ষার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া cy উৎপন্ন করে না। কয়লা ও পটাসিয়ম কার্ব্বনেট উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর দিয়া N বাষ্পের স্রোত চালাইলে পটাসিয়ম সাইনাইড প্রস্তুত হয়। সচরাচর উক্তরূপে পটাসিয়াম্ সাইনাইড্ প্রস্তুত করে না। শিং, চামড়া প্রভৃতি জন্তুর পদার্থে পটাসিয়ম সাইনাইড ও লৌহ চূর্ণ একত্র করিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে পটাসিয়ম সাইনাইড প্রস্তুত হয়। তাহা হইতেই সচরাচর পটাসিয়ম সাইনাইড প্রস্তুত হয়। ৬৫ ভাগ পটাসিয়ম্ সায়নাইড ও ১৭ ভাগ আর্জেন্টিক নাইট্রেট পৃথক পৃথক রূপে জলে গুলিয়া মিশাইয়া রাখিলে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পদার্থ জন্মে। ঐ পদার্থ শুষ্ক করিয়া পরীক্ষা-নলে উত্তপ্ত করিলে সাইনোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবল বিষধর্ম্মি বলিয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করা উচিত নয়।

হাইড্রাসায়েনিক এসিড

H.C.N.—২৭।

ইহার অপর নাম প্রুসিক এসিড।

এক ভাগ সায়নোজেন ও এক ভাগ হাইড্রজেন সংযুক্ত হইয়া ইহা উৎপন্ন করে।

শতাংশিকের ইত্যাদি (পূর্ব্ববৎ)।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন তরল পদার্থ। ২৬।৫ তাপে ফুটিয়া উঠে এবং ১৫০ শৈত্যে জমিয়া কঠিন হয়। গ্রীষ্মকাল অবস্থায় রক্ষা করা দুঃসাধ্য।

N. B.—ইহার ঘ্রাণ দ্বারা শিরঃপীড়া ও মূর্চ্ছা ঘটিতে পারে। ইহার একপ্রকার বিশেষ তীক্ষ্ণ গন্ধ আছে। ইহার আস্বাদ প্রথর কিন্তু অম্ল নহে। অধিক জলের সহিত না মিশাইয়া ইহা কোন প্রকারে ব্যবহার করা উচিত নহে। ১০০ ভাগ জলে ৩ ভাগ ইহা মিশাইয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু তেমন স্থলেও একেবারে এক ফোঁটার অধিক কিম্বা বার বার দেওয়া যাইতে পারে না।

N. B.—ফলতঃ এই ঔষধের ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অনভিজ্ঞ ভিষকের ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে এবং ঔষধালয় ভিন্ন বাসভবনে ইহা রাখা অনুচিত।

N. B.—এই বিষ জন্য অনিষ্ট উৎপত্তি হইলে শীতল জল ব্যবহার দ্বারা তাহার

প্রতীকার হইতে পারে। এই বিষ দ্বারা কুকুরাদি মৃতপ্রায় হইলে তাহাদের শরীরে শীতল জলধারা ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করা গিয়াছে। এমোনিয়া আঘ্রাণ করিলেও এই বিষের তেজ মন্দীভূত হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

পটাসিয়ম সায়নাইডকে গন্ধক দ্রাবকের সহিত সংযুক্ত করিয়া বকযন্ত্রে চোয়াইলে ইহা পাওয়া যায়। নামাইবার সময় যাহাতে এই গ্যাস উড়িয়া যাইতে না পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। ফলতঃ বিশেষ সাবধান হইয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করিতে হয় এবং প্রথম শিক্ষার্থী-দিগের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে।

— ডাক্তার শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

এক আশ্চর্য্য দ্বীপ

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ সীমায় ইষ্টার নামে এক দ্বীপ আছে। এই দ্বীপ দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল হইতে দুই সহস্র মাইল ও নিউজিলাণ্ড হইতে চারি সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত। দ্বীপটিও বেশী বড় নহে, ইহার আয়তন ৪৫ বর্গ-মাইল মাত্র। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে অনেক প্রস্তরের খোদিত মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি বিশাল এবং অতি বৃহৎ পাদভূমির উপর স্থাপিত। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এত অধিকসংখ্যক মূর্ত্তি আছে যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এতকাল ধরিয়া ইহার ইতিহাসের খোঁজ করা যাইতেছে, তবু তাহার কোন কিনারা হইল না। এই অজানিত ইতি-হাস বাহির করিবার মানসে ইংলণ্ডের একজন এম, এ পাশ ভদ্রলোক একটি মটর-চালিত ষ্টিমার তৈয়ারি করাইতে-ছেন। তাঁহার সহিত একজন বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ, ব্রিটিশ মিউজিয়মের একজন কর্ম্মচারী, একজন জাহাজ-চালক ও চৌদ্দ জন নাবিক গমন করিবেন। গত দুই শত বৎসর ধরিয়া যাহার সম্বন্ধে কেহ কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই, তাহা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যাইতেছে। এই দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম আশ্চর্য্য দেশ। এই দ্বীপটি আগ্নেয় গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি এই দ্বীপটি কোন মহাপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে ইহার রহস্য এত শক্ত হইত না, কারণ দ্বীপে প্রস্তরের যে কার্য্য রহিয়াছে তাহা যে মানুষের হস্তগঠিত তাহা সহজেই প্রমাণ করা যাইত। কিন্তু মহাপ্রদেশ হইতে এত দূরে সমুদ্রের মধ্যে এই দ্বীপে এরূপ বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? এই ক্ষুদ্র দ্বীপে পাঁচ শতেরও অধিক প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। এই গুলি দুই হাত হইতে ৪৭ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ এবং দ্বীপের নানা

স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন দানবগণ আসুরিক ব্যগ্রতার সহিত এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং মিসরের পিরামিড তৈয়ারী করিবার জন্য যত লোক লাগিয়াছিল, তত লোক অনেক দিনে এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে। যতগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মুখাবয়বের সাদৃশ্য আছে। মূর্ত্তিগুলির ঠোঁট সরু ও মুখের এরূপ ভাব যে, মনে হয় সেগুলি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে। মিসরের প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির মুখে মনের ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি তাহা অপেক্ষাও বেশী ভাবব্যঞ্জক। প্রত্যেক মূর্ত্তিই একই প্রস্তর খণ্ড হইতে খোদিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইহাতে জোড়া নাই। সমুদ্র-তীর হইতে আট মাইল দূরে এক নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত আগ্নেয় গিরি হইতে এই প্রস্তর বাহির করা হইয়াছে। কে এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল, কি যন্ত্র তাহারা ব্যবহার করিয়াছে, এবং কোন কালে এইগুলি নির্ম্মিত হইল, কে বলিবে?

যে দেওয়ালের উপর এই মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক। দেওয়ালগুলি নিরবচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু ভাগে-ভাগে নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে কতকগুলি ৪০০ ফিট লম্বা ও ১১ হাত হইতে ২০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ ও দেওয়ালের উপরিভাগ ২০ হাত চওড়া। এই দেওয়াল প্রস্তর কাটিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ১১ মণ হইতে ১৪০ মণ পর্য্যন্ত ভারী। খনি হইতে পাহাড় পর্ব্বতের উপর দিয়া এত দূরে আনিয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর অপর খণ্ড কে সাজাইয়া রাখিল? এই সকল প্রশ্নের কোন প্রকার সন্তোষজনক উত্তর পাইবার আশা এ পর্য্যন্ত করা যায় নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে টোপাজ নামক রণ-তরী একবার উক্ত দ্বীপে গিয়াছিল। তাহার কর্ম্মচারিগণ জেড নামক হরিৎ বর্ণের প্রস্তরবিশেষের বাটালি পাইয়া-ছিল। কিন্তু এই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে এত বৃহৎ মূর্ত্তি ও দেওয়াল প্রস্তুত করা অসম্ভব। বিশেষতঃ মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিতে যে প্রস্তর ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা এত শক্ত যে, উৎকৃষ্ট ইস্পাতের বাটালিও খারাপ হইয়া যায়। যে দেওয়ালের উপর মূর্ত্তিগুলি অবস্থিত আছে, তাহার সমান্ত-রাল আরও এক শ্রেণী দেওয়াল আছে এবং মধ্যে মধ্যে আড়াআড়ি দেওয়াল দ্বারা উক্ত দুই দেওয়াল সংযোগ করা আছে। কোন কোন জায়গায় ছাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার নীচে হয় মানুষ বলি দেওয়া হইয়াছে অথবা যাহারা এইগুলি প্রস্তুত করিতে মারা গিয়াছে তাহাদিগের মৃতদেহ তথায় রক্ষিত হইয়াছে। কোনটা ঠিক নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

কোন্ দেশীয় লোক, কোন্ জাতি বা কাহারা এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। ইতিহাস লেখার পূর্ব্বে এই স্থানে যে উচ্চ সভ্যতা ছিল

তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলা যায় না। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে কতকগুলি নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা হইতে ইহাদের সম্বন্ধে জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক মূর্ত্তির মস্তকের পশ্চাৎ ভাগ সমতল করা আছে ও তাহাতে নানারূপ রেখাপাত চিত্রাক্ষর আছে, তাহা পড়া যায় না, কারণ এই রেখাক্ষর ও চিত্রাক্ষর পড়িবার প্রণালী জানা নাই এবং জানিবার উপায়ও নাই। বৃহৎ গৃহগুলির ভিতরেও ঐ প্রকারে খোদিত চিত্রাক্ষরাদি আছে, ইহা ব্যতীত কাষ্ঠের তক্তার উপর নানা প্রকার খোদিত চিত্রাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্রাক্ষর ও রেখাক্ষর পাঠ করিতে পারিলে যে আশ্চর্য্যজনক ইতিহাস বাহির হইবে তাহা বোধ হয় নিনেভের ইতিহাসের মতই অদ্ভুত হইবে। এই দ্বীপের নিকটে যে সকল পলিনেসিয়ার দ্বীপ আছে, তাহাদের অধিবাসিগণ এই দ্বীপ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না; এমন কি তাঁহারা এই সম্বন্ধে কোন গল্প বা কোন প্রকার অনুমানও করিতে পারে না।

এই প্রকার বিশাল ও আশ্চর্য্যজনক মূর্ত্তি প্রভৃতি যখন তৈয়ারী হইতেছিল, তখন নিশ্চয়ই অনেক সুনিপুণ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে দ্বীপটি যেরূপ ক্ষুদ্র তাহার মধ্যে এত লোক নিশ্চয়ই ধরে না। ইহা ব্যতীত এক দিকে এ দ্বীপে জল নাই বলিলেও চলে এবং অপর দিকে এই দ্বীপে খাদ্য দ্রব্য জন্মাইবার স্থানও অধিক নহে। তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, এই ইষ্টার দ্বীপ এক সময় খুব বৃহৎ ছিল ও এক দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত ছিল অথবা ইহা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির ন্যায় এক মহাপ্রদেশের মত বৃহৎ দ্বীপ ছিল কিম্বা এসিয়া বা আমেরিকার সহিত সংলগ্ন ছিল।

এ দ্বীপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আগ্নেয়গিরিতে পূর্ণ।

নূতন সংবাদ।

১। পরলোকগত কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের উডল্যাণ্ডস্থ ভবনে কনিষ্ঠা রাজকুমারী সুধীরা সুন্দরীর সহিত লণ্ডননিবাসী মিঃ এলেন মাণ্ডে সাহেবের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

২। ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড মিণ্টো ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ সংবাদে আমরা যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছি।

৩। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত সেণ্টলুই নামক স্থানে স্ত্রীলোক ও বালকগণের বিচারের জন্য দুইজন স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৪। কুরুক্ষেত্রের পবিত্র পুষ্করিণীর সংস্কার জন্য রেবার মহারাজা এক লক্ষ টাকা পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

৫। শ্যাম দেশের বালিকারা যদি ৩৫ বৎসর বয়সেও বিবাহিতা না হয়, তাহা হইলে তাহারা সম্রাটের নিকট প্রেরিত হয়। সম্রাট্ অবিবাহিত বালিকার বিবাহ দিবার ভার গ্রহণ করেন এবং কারাগারের কোনও এক কয়েদীকে কারামুক্ত করিয়া তাহার সহিত উহার বিবাহ দেন।

বামারচনা।

পৌত্রমুখদর্শনে।

কি সুখ আবেশে অন্তর আমার
উঠিল আনন্দে ভরিয়া।
দুঃখ ব্যথা যত ছিল হৃদি মাঝে,
মুহূর্ত্তে গিয়েছে সরিয়া॥ ১

পুরাতন কথা, মনে নাই কিছু,
সকলি গিয়েছি ভুলিয়া।
যেন গো আমারে সুখ স্বর্গ-ধামে
চকিতে নিয়েছে তুলিয়া॥ ২

কোথা থেকে এক মায়া-শিশু এসে,
কি জানি কেমন করিয়া।
কচি মুখখানি দেখায়ে আমায়,
সর্ব্বস্ব লইল হরিয়া॥ ৩

তাই আজ এত আনন্দ হৃদয়ে,
নাহি মনে দুঃখ বেদনা।
ভূত, ভবিষ্যৎ, কিম্বা বর্ত্তমান,
ভুলেছি সকল ভাবনা॥ ৪

কি মোহিনী মায়া জানে এই শিশু,
বুঝিব সে আমি কেমনে।
মরমের মাঝে, কাটিল রে সিঁদ,
হৃদয় হরিল গোপনে॥ ৫

কোন দেবলোকে ছিলি ওরে শিশু,
উজলি স্বরগভুবনে।
দ্বিতীয়ার শশী, উদিলি আসিয়া
আমার হৃদয়-গগনে॥ ৬

পূর্ণ শশিরূপে, সংসার আকাশে,
উজল থাকিও সতত।
অমিয় কিরণ, বরষি জগতে,
সুশীতল রেখো নিয়ত॥ ৭

এসেছ যেমন, কুসুমের মত
পবিত্র হৃদয় লইয়া।
থেকো চিরদিন, সংসার-নন্দনে,
এমনি পবিত্র হইয়া॥ ৮

যাঁহার কৃপায়, এসেছ জগতে,
দেবশিশু রূপ ধরিয়া।
সে করুণাময়, রক্ষিবেন সদা,
আপদ্ বিপদ্ হরিয়া॥ ৯

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 608. April, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৮ সংখ্যা। { চৈত্র, ১৩২০। এপ্রেল, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

সহমৃতা।

(সত্যমূলক ঘটনা।)

(১)

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন কাল প্রচণ্ড তপন,
বরষিছে অগ্নিকণা ঝলকে ঝলকে,
দ্রুত বেগে বহিতেছে উষ্ণ সমীরণ,
শ্বাসরোধ হইতেছে পলকে পলকে।

(২)

এক গৃহস্থের ঘরে এমন সময়
সর্ব্বনাশ উপস্থিত, গৃহকর্ত্তা যিনি
সর্ব্ব তাজি' লইলেন মৃত্যুর আশ্রয়,
পুত্রকন্যাগণ কাঁদি' ভিজাল অবনী।

(৩)

অশ্রুশূন্য নেত্রে আসি ভার্য্যা গন্ধেশ্বরী
মুক্তকেশে বসিলেন পতিপদতলে,
সীমন্ত সিন্দূর দ্বারা সুরঞ্জিত করি
অধর করিয়া রাঙ্গা সুগন্ধি তাম্বুলে।

(৪)

স্বহস্তে অলক্তরাগ করিয়া চরণে
পরিধান করি অঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার
কজ্জলের রেখা টানি যুগল নয়নে
শরণ লইল আসি পতি দেবতার।

(৫)

ঘেরিয়া পিতার শব সন্তানমণ্ডলী
উত্থিত করিতেছিল করুণ ক্রন্দন।
জননীর নবভাব অত্যাশ্চর্য্য বলি'
হেরিতে লাগিল শোক হ'য়ে বিস্মরণ।

৬

জননী প্রশস্ত পুণ্য স্তূপের মতন
কহিলেন অতিশয় সুমধুর স্বরে—
"হ'ওনা সন্তানগণ বিস্ময়ে মগন,
জ্ঞানযোগে শোক দুঃখ দাও দূর করে।

৭

সহমৃতা হ'ব আমি স্বামীর সহিত
এই ধ্রুব সত্য আমি জানাই সবারে,
আয়োজন কর সবে হয়ে ত্বরান্বিত
পরিহরি শোক ভয় সরল অন্তরে।"

৮

সন্তানের আর্ত্তনাদে ছাইল গগন
শুনি এই শোকাবহ ভয়াবহ কথা।
স্বজন হইল দুঃখ-সাগরে মগন।
কন্যাগণ ভূমিতলে হইল পতিত।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বন্দি জননীর যুগপদ
কহিলেন জননীকে "এও কি সম্ভব" ?
কহিল জননী তুলি নেত্র-কোকনদ
মানসে ক্ষণেক করি ঈশ্বরের স্তব—

১০

"হে পুত্র বলিব আজি অতি গুপ্ত কথা,
শুনিয়া হ'ওনা কেহ বিস্ময়ে মগন,
অঘটন ঘটান যে বিশ্ব-রচয়িতা
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহা করিও স্মরণ।

১১

জাতিস্মরা* আমি, পূর্ব্ব জনমের কথা
এখন স্মরণ মম আছে হৃদিতলে ;
শত জন্ম এই ভাবে হয়ে সহমৃতা
বার বার জনম নিতেছি ভূমিতলে।

১২

যখনি সন্তানগণ হয় বয়োধিক,
গৃহপূর্ণ করে আসি পুত্রবধূগণ
সুখলাভ করি আমি স্বর্গের অধিক
পুত্র পৌত্রগণ বক্ষে করিয়া ধারণ।

১৩

তখনি জনক তব, স্বামী যিনি মোর,
ত্যজেন নশ্বর দেহ, অতএব আর,
রহিতে পারিনা হয়ে সে দুখেতে ভোর
স্বামী সনে সহমৃতা হইবার বার।"

১৪

শুনি সে বিস্ময়াবহ অদ্ভুত ভারতী
কহিল সকলে হয়ে বিস্ময়ে মগন,

* যে পূর্ব্বজন্মের কথা বলিতে পারে তাহাকে জাতিস্মরা কহে।

"দেখাও প্রমাণ কিছু সতি, গুণবতি
শ্রোতাদের কৌতুহল হোক নিবারণ।"

১৫

গন্ধেশ্বরী কহিলেন বাম হস্ত তুলি',
"নববস্ত্র দ্বারা ইহা কর আচ্ছাদন
তাহার উপরে আনি ঘৃত দেহ ঢালি
সেই ঘৃতবস্ত্রে কর অনল অর্পণ"।

১৬

কন্যাগণ বধূগণ হয়ে একত্রিতা
এই কর্ম্ম সমাধান করিল কাঁদিয়া
জ্বলিতে লাগিল হস্ত—হয়ে প্রফুল্লিতা
স্থিরচিত্তা গন্ধেশ্বরী রহেন বসিয়া।

১৭

এই অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া ঈক্ষণ
আনন্দ-আবেগ নীরে মানবমণ্ডলী
মগ্ন হ'ল—প্রতিজনে করিল পূজন
সতীপদ, মাথে দিল সতী-পদ ধূলি।

১৮

সম্মানে করিল সবে চিতা আয়োজন
সতী গিয়ে পতিপার্শ্বে লইলেন স্থান।
জ্যেষ্ঠ পুত্র করিলেন অনল অর্পণ,
জ্বলিয়া উঠিল বেগে অগ্নি লেলিহান।

১৯

পতির শবের সনে সতীর শরীর
পুড়িয়া হইল ছাই, সকলে দেখিল
নড়িল না একবার কেশাগ্র সতীর
যন্ত্রণার রেখাশূন্য ললাটমণ্ডল।

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত।

৺ উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক খুলনা প্রকাশ্য সভায় প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম।

THE AIM OF HUMAN LIFE.

১। জগৎ আকস্মিক নয়, এক বিধাতার অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের সৃষ্টি। জড়, উদ্ভিদ, চেতন কিছুই নিরুদ্দেশে নয়।

২। মানুষ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জীব, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য আছে। এ সম্বন্ধে ভ্রম মহানিষ্টের কারণ। স্থূলদর্শী সাধারণ মানবের মতে ইতর জীবের ন্যায় সুখ মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এই সুখের জন্য ধন, মান, ভোগবিলাস সব। মানবজীবনের উদ্দেশ্য তদপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর, পবিত্রতর—ভোগে নয়, ত্যাগে। অর্থাদি পদরজোপম কুক্কুরের উচ্ছিষ্টসম—ত্যাগেতেই দেবজীবন।

৩। প্রাচীনকালের চতুরাশ্রম—ধর্ম্ম উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত।

৪। মানবজীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে মানবপ্রকৃতি ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিতে হইবে। শরীর ও আত্মা। শরীরের প্রয়োজন আত্মার জন্য। এই আত্মার Intellectual, Affectional, Moral and Spiritual প্রকৃতি আছে। তাহাদের উন্নতির ক্রম—সমঞ্জস উন্নতি না হইলে প্রকৃত উন্নতি হয় না। মস্তক বৃহৎ হৃদয় ক্ষুদ্র, পদ বৃহৎ মস্তক ক্ষুদ্র—এ কিম্ভুত কিমাকার। The wisest, the greatest. Character is power in a higher sense than knowledge.

৫। প্রাচীন আত্মতত্ত্ববিদ্‌দিগের পঞ্চকোষ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। ক্রমে উচ্চতর শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও ব্রহ্মানন্দ।

৬। আত্মোন্নতির সকল কার্য্যক্ষেত্রে আপনার কর্ত্তব্যসাধন—গৃহধর্ম্ম, দেশহিতৈষণা, সামাজিক উন্নতি ও বিশ্বহিতৈষণা—জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে।

৭। মানবজীবনের উদ্দেশ্য—এক কথায় মহর্ষি ঈশা যাহা বলিয়াছেন "Be perfect as your Father in Heaven is perfect." মানুষ God-like হইবে। প্রাচীন ঋষি—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরং।" ইহা অনন্তকাল সাধ্য। মৃত্যু মনুষ্যজীবনের শেষ সীমা নহে—ইহকালের অপূর্ণতার পূর্ণতা পরকালে। চারাবৃক্ষ টবে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয় পরে টব ভাঙ্গিয়া উদ্যানের বৃহৎ বৃক্ষে তাহার ক্রমোন্নতি। আত্মা শরীররূপ টব ভাঙ্গিয়া অমর লোকের উদ্যানে উন্নতির পর উন্নতি লাভ করিবে। ঐহিক সব হারাইয়া আত্মা তাহার নিত্যসম্বল—জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও আত্মানন্দ লইয়া পরলোকে

যাইবে—তথায় সেই সকল ঈশ্বরজ্যোতিতে তাঁহার অভিমুখে বর্দ্ধিত হইবে।

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং
নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।

৮। মানবজীবন নিরুদ্দেশে নয়—ইতর উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঐশ্বরিকভাবে অনন্তকাল বর্দ্ধিত হইয়া অনন্ত দেবত্ব লাভের জন্য।

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

নীতিজ্ঞানের পুষ্টিসাধন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ক্রমে মানব জাতির প্রতি ভালবাসা হইতে শিশুকে জীবজন্তু পশু ও প্রাণীর প্রতি ভালবাসা শিখাইতে হইবে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ যত প্রাণী আছে, এমন কি তৃণ ও তরু পর্য্যন্তকেও শিশু যেন শ্রদ্ধা করিয়া চলিতে শিখে। ঐ সকল চেতনাচেতন পদার্থের প্রতি মাতার শ্রদ্ধা ও যত্ন দেখিয়াই শিশু তাহাদের প্রতি স্নেহান্বিত ও শ্রদ্ধাবান হইবে। আপনারা কোন জীবজন্তুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন না, এবং শিশু অজ্ঞাতভাবে কোন প্রাণীকে কষ্ট দিলে, আহা! ওর বড় লাগিবে, বলিয়া শিশুকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিবেন। তাহা হইলে তাহার কোমল হৃদয় গলিয়া যাইবে, এবং সে ভবিষ্যতে ওরূপ করিয়া কাহাকেও আর কষ্ট দিবে না। শিশুর সম্মুখে পাখী ও পশুদিগকে খাইতে দিবেন, আর তাহাকে দেখাইবেন যে তাহারা কত আনন্দের সহিত ও কেমন শীঘ্র তাহাদের খাদ্য খাইয়া ফেলে। শিশু উহা দেখিয়া নিজেও আনন্দিত হইবে ও তাহাদিগকে পুনরায় খাইতে দিবে। তাহাদিগকে আরও বলিবেন, পাখীর মা বাপেরা কেমন নিজে না খাইয়া শাবকদের জন্য খাদ্য মুখে করিয়া বাসায় চলিয়া যায়। কত স্নেহে তাহারা শাবকদিগকে খাওয়ায় এবং তাহাদিগকে উড়িতে ও গান গাহিতে শিখায়। এইরূপে শিক্ষা দিলে পশু ও পাখীদের সঙ্গে শিশুর বন্ধুতা জন্মাইবে, এবং তাহা হইলে সে আর কখন পশুপক্ষীকে কষ্ট দিবে না।

পশুপক্ষীর ন্যায় অন্যান্য ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের কষ্ট ও ব্যথার সহানুভূতি শিশুকে শিখাইবেন। বালক যদি অজ্ঞানতা বা অতিরিক্ত স্নেহ বশতঃ কোন জন্তুকে নিজের ঘরে বা খাঁচায় পুরিয়া পরাধীন করিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "কেহ যদি তোমাকে ঐরূপে আদর করিয়া সমস্ত দিন, রাত্রি এক স্থানে পুরিয়া রাখে, ও কোথাও খেলিতে যাইতে না দেয়, তাহা হইলে তোমার কি প্রকার অবস্থা হইবে?"

ইহাতে তাহার মন শুধু ভাবপ্রিয় না হইয়া নিজের ন্যায় অন্যান্য জীবজন্তুর স্বাধীনতা ও জীবন রক্ষার জন্য উৎসুক হইবে।

শিশুর নিকট ফুলও জীবন্ত পদার্থ। সে যদি দুষ্টুমি করিয়া কোন ফুল বা গাছ ছিঁড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে বলিবেন পৃথিবী, ফুল ও গাছেদের মা, তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিলে ভূমি কাঁদিয়া থাকে। ঐ গাছটী লইয়া সতর্ক ভাবে আবার তাহার সম্মুখে রোপণ করুন ও শিশুর যত্নে অল্পকালের মধ্যে উহা কেমন বাড়িতে থাকে তাহা তাহাকে দেখান। ইহা ব্যতীত, শিশুর সম্মুখে শিশুর হাত দিয়াই কোন বীজ রোপণ করান, ও প্রতিদিন কেমন উহার অঙ্কুর গজাইয়া বৃদ্ধি পায় ও ক্রমে চারাগাছ হয়, সূর্য্যকিরণ ও জলে উহার কেমন পুষ্টি হয়, তাহা তাহাকে দেখান। এইরূপে আপনি শিশু-হৃদয়কে কত মার্জ্জিত করিতে পারিবেন, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে কত বুদ্ধি ও জ্ঞান জন্মাইবে। কারণ ক্রীড়া ও আনন্দের সঙ্গে শিশু নিজের চক্ষে ঐ সকল দেখাতে উহা দ্বারা তাহার আত্মা উন্নত ও তাহার হৃদয় প্রশস্ত হয়। এইরূপে শিশুর মনে আপনার প্রতি ও তাহার চারিদিকস্থ জীবজন্তুর প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিলে তাহাকে ন্যায্য ও কর্ত্তব্য বিষয়ে সহজে বুঝান যাইবে। স্নেহ বশতঃ সে আপনা হইতেই সমস্ত দ্রব্য সকলের সহিত ভাগ করিয়া লইয়া সকলকেই সুখী করিতে ইচ্ছুক হইবে। প্রথম হইতেই তাহাকে তাহার নিজ দ্রব্যাদি বিতরণ করিতে শিখাইবেন, সে যদি পাখীদিগকে খাওয়াইতে চায়, তাহা হইলে তাহার নিজের ভাত থেকে খাইতে দিবেন, এইরূপ করিলে সে বিনা গর্ব্বে ভাল কাজ করিতে শিখিবে। অন্য দিকে তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তার কোন খেলনা বা দ্রব্য লইবেন না, তাহার সকল দ্রব্যে তাহার স্বত্বাধিকার আছে ও অন্যের তাহাতে কোন অধিকার নাই, ইহা যেন সে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে না বলিয়া কখন পরের দ্রব্যে হাত দিবে না।

ছেলেদের ক্রীড়ার ঘর তাহাদিগকে অনেক সদ্‌গুণ শিক্ষা দিবার বিদ্যালয়ের ন্যায় উপযুক্ত স্থান। বড় ভাই বোনদিগকে সদাশয়তা ও নমনীয়তা শিখান উচিত। তাহারা ছোট ভাই বোনদের সান্ত্বনার জন্য খেলানাদি যেন অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে পারে, আর ছেলেদের মার খাইয়াও যেন তাহারা উল্টে না মারে। কেন না ছোট ভাই বোন অত্যন্ত শিশু, ভাল মন্দ কোন বোধ নাই, ও সে বুঝিতে পারে না যে তার মারে দিদি বা দাদার লাগে। আর এককালে তুমিও ঐরূপ অজ্ঞান ছিলে, মা সেই সময়ে কেমন যত্ন ও স্নেহ দেখাইতেন। এই বলিলেই বড়ভ্রাতা ভগিনীরা তৎক্ষণাৎ আনন্দে ছোট শিশু-দিগকে নিজের খেলনা সমস্ত ছাড়িয়া দিবে। সময়ে সময়ে অবশ্য তাহাদের

মধ্যে ঝগড়া হইবে, তার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু শীঘ্রই আবার তাহাদের মিলন হইবে ও এইরূপে তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝিবে।

আমরা শিশুদের খেলাঘরে অনেক সময় ক্রীড়ার সহচর প্রতি অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তা দেখিতে পাই, তাহারা তাহাদিগের নিমন্ত্রিত শিশুদিগকে ভাল ভাল দ্রব্য সকল দিয়া শিষ্টাচারপূর্ব্বক অবশিষ্ট নিজেদের জন্য রাখে। এই স্বাভাবিক জ্ঞান অতি চমৎকার। পিতা মাতারা বাল্যকাল হইতে উহাতে উৎসাহ দিয়া উহার অভ্যাস করাইলে সময়ে ঐ বালক বালিকারা নিঃস্বার্থ, পরোপকারী ও অতিথী সৎকারপরায়ণ যুবক যুবতীতে পরিণত হইবে। স্বত্ব ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের বোধের সঙ্গে অন্তরাত্মার পুষ্টিসাধন হয়। তখন যে কোন মন্দকাজের পর লজ্জা ও অনুতাপ অনুভব করে, কিন্তু ঐ আত্মগ্লানি, বা অনুতাপ শিশুর মনের অন্যান্য বিষয়ের মত শীঘ্রই চলিয়া যায়। ঐ সময়ে জননীর একটী মিষ্ট উপদেশ বা কথা তাহার মনে গভীর রূপে বসিয়া যায় ও নৈতিক জ্ঞানের পুষ্টিসাধন করে এবং তাহাকে কর্ত্তব্য কাজ শিক্ষা দেয়। কোন অন্যায় কাজের অনেকক্ষণ পরে শিশুকে তিরস্কার করিলে কোন ফল দর্শে না, বরং তাহাতে অপকার হইবারই সম্ভাবনা। শিশু শীঘ্রই ভুলিয়া যায় যে, সে কোন অকর্ম্ম করিয়াছে, সুতরাং মাতার তিরস্কারে মনে ভাবে তিনি বুঝি মিথ্যা বকিতেছেন সেজন্য সময়ে দু একটী কথা দ্বারা শিশুকে সতর্ক করাই ভাল।

শিশুদিগকে অতিরিক্ত ভালবাসা বা দুঃখ দেখাইয়া মন্দ কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা পাইবেন না। কেন না, অনেক সময় তাহারা উহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আদেশ মত কার্য্য করিতে পারে না। কখন কখন বা তাহাদের অতি সরল ও কোমল স্বভাব উহা দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া একেবারে বিবশ হইয়া পড়ে ও তাহাদের মনোবৃত্তি-সমূহ নিস্তেজ হইয়া যায়। সে কারণে অতি অল্প বয়সে ছেলেদের মনের বৃত্তি সকল যাহাতে হঠাৎ বিবশ বা তীক্ষ্ন না হইয়া ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও সবল হয় ও চরিত্র সম্যকরূপে পুষ্টি পাইয়া দৃঢ় ও কঠিন হইয়া দাঁড়ায় তাহা জননীর করা উচিত। মনের ভাব সকল ফুলের ন্যায় যত বিলম্বে পুষ্ট হয়, ততই অধিক দিন থাকে। কিন্তু শিশুর শারীরিক ও মানসিক যে কোন বৃত্তি শিশুর চরিত্রে মিশিয়া যাওয়ায় আবশ্যক, তাহার পুষ্টি ও চর্চ্চা যত শীঘ্র আরম্ভ হয় ততই ভাল।

এইকালে অন্তরাত্মার বৃদ্ধির সঙ্গে সন্তানের সত্যবাদিতার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। মা শিশুর নিকট সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবেন, ও প্রাণান্তে কখন নিজের কথা বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না; ঐরূপে ছেলে ও সত্যের মর্ম্ম বুঝিবে। ঐ সত্যানুরাগ শিক্ষায় দিকে একবার শিশুকে পথ দেখাইলে সে কখন ভ্রমেও

মিথ্যার দিকে যাইবে না। ছেলেকে মন্দ কাজ হইতে দূরে রাখুন ভাল কাজে আপনা হইতেই তাহার অনুরাগ হইবে। আপনার সত্যানুরাগ ও প্রতিজ্ঞাপালনের প্রতি শিশুর দৃঢ় বিশ্বাস হইলে সত্যবাদিতার মাহাত্ম্য তাহার মন হইতে এক দণ্ডের জন্যও অপসৃত হইবে না। পবিত্রতা ও নির্দ্দোষিতার বাতাসে শিশুর কোমল আত্মাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া রাখিলে, তাহা উদাহরণের অপেক্ষাও অধিক উপকার করে। ধর্ম্মের বিশুদ্ধ বায়ু তাহাকে মিথ্যা কথা ও অলসতার নিঃশ্বাস হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

উষা দেবতা।

ঋগ্বেদে যে সকল স্ত্রী-দেবতার উল্লেখ আছে তাঁহাদের বর্ণনা অতি সংক্ষেপে করা হইয়াছে। এই সকল স্ত্রী-দেবতার মধ্যে উষার স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে সরস্বতী, তৎপরে পৃথিবী ও রাত্রির বর্ণনা অতি সংক্ষেপে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু উষার বর্ণনা ঋগ্বেদের অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে উষার এইরূপ বর্ণনা আছে।

ঋগ্বেদ (৪৮ সূক্ত ১ম অষ্টক) উষা দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

১। হে দেবদুহিতা উষা! আমাদিগকে ধন দান করিয়া প্রভাত কর। হে বিভাবরি! প্রভূত অন্ন দান করিয়া প্রভাত কর। হে দেবি! দানশীল হইয়া (পশুরূপ) ধন দান করিয়া প্রভাত কর।

২। (উষা) অশ্বযুক্তা, গোসম্পন্না এবং সকল ধনপ্রদাত্রী। (প্রজাদিগের) নিবাসের জন্য তাঁহার অনেক (সম্পত্তি) আছে। হে উষা আমাকে সুনৃত বাক্য বল, এবং ধনবান্দিগের ধন দাও।

৩। উষা (পুরাকালে) বাস করিতেন (অর্থাৎ প্রভাত করিতেন), অদ্যও প্রভাত করিতেছেন। ধনলুব্ধ লোক যেরূপ সমুদ্রে (নৌকা) প্রেরণ করে, উষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জীকৃত হয়, উষা তাহা সেইরূপে প্রেরণ করেন।

৪। হে উষা! তোমার আগমন হইলে বিদ্বান্ লোকে দানে মনোনিবেশ করে, এবং অতিশয় মেধাবী কণ্ব ঋষি দানশীল মনুষ্যদিগের প্রসিদ্ধ নাম উষাকালেই উচ্চারণ করেন।

৫। উষা গৃহকার্য্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া আগমন করেন। তিনি জঙ্গম প্রাণীদিগের পরমায়ু হ্রাস করেন, পদযুক্ত প্রাণীদিগকে গমন করান এবং পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দেন।

৬। তুমি সমীচীন চেষ্টাবান্ পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ কর, তুমি ভিক্ষুকদিগকেও

প্রেরণ কর, তুমি নীহারবর্ষী এবং অধিকক্ষণ অবস্থান কর। হে অন্নযুক্ত যজ্ঞসম্পন্না উষা! তুমি প্রভাত হইলে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ আর কুলায়ে অবস্থান করে না।

৭। তিনি (রথ) যোজিত করিয়াছেন। এই সৌভাগ্যবতী উষা দূর হইতে সূর্য্যের উদয়স্থানের উপরিস্থ (দিবালোক) হইতে, শত রথ দ্বারা মনুষ্যগণের নিকট আসিতেছেন। (১)

৮। তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে, কেননা, সেই নেত্রী জ্যোতি প্রকাশ করেন, এবং সেই ধনবতী স্বর্গদুহিতা বিদ্বেষীদিগকে এবং শোষণকারীদিগকে দূর করেন।

৯। হে স্বর্গ দুহিতা! আহ্লাদ কর, জ্যোতির সহিত প্রকাশিত হও, দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও, এবং অন্ধকার দূর কর।

১০। হে নেত্রী উষা! সমস্ত প্রাণীর চেষ্টিত ও জীবন তোমাতেই আছে, কেননা তুমি অন্ধকার দূর কর। হে বিভাবরি! তুমি বৃহৎ রথে আইস। হে বিচিত্র ধনযুক্তে! আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

১১। হে উষা! মনুষ্যের যে বিচিত্র অন্ন আছে তাহা তুমি গ্রহণ কর; এবং যে যজ্ঞনির্ব্বাহকেরা তোমাকে স্তুতি করে সেই শুভকর্ম্মাদিগকে হিংসারহিত যজ্ঞে আনয়ন কর।

(১) অর্থাৎ অসংখ্য রশ্মিসমূহের সহিত উষা আসিতেছেন।

১২। হে উষা! তুমি অন্তরীক্ষ হইতে সকল দেবগণকে সোমপানার্থ আনয়ন কর। হে উষা! তুমি আমাদিগকে অশ্বগোযুক্ত এবং প্রশংসনীয় ও বীর্য্যসম্পন্ন অন্ন প্রদান কর।

১৩। যে উষার জ্যোতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া কল্যাণরূপে দৃষ্ট হয়, তিনি আমাদিগকে সকলের বরণীয়, সুরূপ এবং সুখগম্য ধন প্রদান করুন।

১৪। হে পূজনীয় উষা! তোমাকে পূর্ব্ব ঋষিগণ রক্ষণ এবং অন্নের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তুমি ধন ও দীপ্তিযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া আমাদিগের স্তুতিতে তুষ্ট হও।

১৫। হে উষা! তুমি অদ্য জ্যোতি দ্বারা আকাশের দ্বারদ্বয় খুলিয়া দিয়াছ, অতএব আমাদিগকে হিংসকরহিত ও গোযুক্ত কর এবং বিস্তীর্ণ গৃহ ও অন্নদান কর।

১৬। হে উষা! আমাদিগকে প্রভূত ও বহুবিধ রূপযুক্ত ধন এবং গাভী দান কর। হে পূজনীয় উষা! আমাদিগকে সর্ব্বশত্রুনাশক যশ দান কর। হে অন্নযুক্ত ক্রিয়া-সম্পন্ন উষা! আমাদিগকে অন্নদান কর। (৪৮ সূক্ত)

(৪৯ সূক্ত) ১। হে উষা! দীপ্যমান আকাশের উপর হইতে শোভনীয় (মার্গ) দ্বারা আগমন কর। অরুণবর্ণ গাভী। সমূহ (১) তোমাকে সোমযুক্ত যজমানের গৃহে লইয়া আসুক।

২। হে উষা! তুমি যে সুরূপ সুখকর রথে অধিষ্ঠান কর, হে স্বর্গ-দুহিতে! তদ্দ্বারা অদ্য হব্যদাতা যজমানের নিকট আইস।

৩। হে অর্জ্জুনি (১) উষা! তোমার আগমনের সময় দ্বিপদ ও চতুষ্পদ ও পক্ষযুক্ত পক্ষিগণ আকাশ-প্রান্তের উপরিভাগে গমন করে।

৪। হে উষা! তুমি অন্ধকার বিনাশ করিয়া রশ্মিদ্বারা জগৎকে প্রকাশ কর। কণ্বপুত্রগণ ধনপ্রার্থী হইয়া তোমাকে স্তুতিবচন দ্বারা স্তব করিয়াছে। (৪৯ সূক্ত)

৯২ সূক্ত।

উষা (শেষ তিনটী ঋকে অশ্বিদ্বয়) দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। উষাদেবতাগণ (২) আলোককে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং অন্তরীক্ষের পূর্ব্বদিকে জ্যোতিঃ প্রকাশিত করেন। যোদ্ধৃগণ যেরূপ আয়ুধ-সকলের সংস্কার করে, সেইরূপ (স্বীয় দীপ্তি দ্বারা) জগতের সংস্কার করিয়া গমনশীল, দীপ্তিমান্ এবং মাতৃগণ (৩) প্রতিদিবস গমন করেন।

২। অরুণ ভানুকিরণ অনায়াসে উদিত হইল, পরে রথযোজনযোগ্য শুভ্রবর্ণ গাভী-সকলকে উষাদেবতাগণ রথে যোজিত করিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করিলেন, তৎপরে দীপ্তিযুক্ত উষাদেবতা-সকল শুভ্রবর্ণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিলেন।

৩। নেত্রী উষাদেবতাগণ (উজ্জ্বল অস্ত্রধারী) যোদ্ধাদিগের ন্যায়, এবং উদ্যোগ দ্বারাই দূরদেশ, পর্য্যন্ত স্বীয় তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন। তাঁহারা শোভন কর্ম্মকারী, সোমদায়ী, (দক্ষিণা) দাতা যজমানকে সকল অন্ন প্রদান করেন।

৪। উষা নর্ত্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন (১) এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় দুগ্ধ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে সেইরূপ উষাও পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিশ্বভুবন প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করিতেছেন।

৫। উষার উজ্জ্বল তেজ (প্রথমে) পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হয় পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। (পুরোহিত) যেরূপ যজ্ঞে আজ্য দ্বারা যূপকাষ্ঠ সিক্ত করে, সেইরূপ উষা স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন; স্বর্গ-দুহিতা উষা সূর্য্যের সেবা করিতেছেন।

৬। আমরা (নৈশ) অন্ধকারের পারে আসিয়াছি; উষা সমস্ত প্রাণীকে চৈতন্যযুক্ত করিয়াছেন। দীপ্তিমতী উষা

(১) "অর্জ্জুনি শুভ্রবর্ণে।"

(২) মূলে 'উষসঃ' এই পদ আছে। প্রভাতকালাভিমানিন্যো দেবতাঃ —সায়ণ। কিন্তু যাস্ক বলেন উষাদেবীর সম্মানার্থে একবচনের স্থানে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৩) মূলে 'মাতরঃ' আছে।

(১) নাপিত যেরূপ কেশ ছেদন করে, উষা সেইরূপ অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন।

তোষামোদকারীর ন্যায় প্রীতি পাইবার জন্য (স্বীয় দীপ্তি দ্বারাই) যেন হাসিতেছেন; আলোকবিকশিতাঙ্গী উষা আমাদিগের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করিয়াছেন।

। গোতমবংশীয়গণ দীপ্তিমতী এবং সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী আকাশ-দুহিতার স্তুতি করে। হে উষা! তুমি আমাদিগকে পুত্র-পৌত্রাদিযুক্ত, দাস-পরিজনযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং গাভীযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

৮। হে উষা! আমি যেন যশোযুক্ত, বীরযুক্ত দাসবিশিষ্ট এবং অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই। হে সুভগে! তুমি সুন্দর যজ্ঞে স্তোত্র দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে অন্নদান করিয়া সেই প্রভূত ধন প্রকাশিত কর।

৯। উজ্জ্বলা উষা সমস্ত ভুবন প্রকাশিত করিয়া আলোক দ্বারা পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন; এবং সমস্ত জীবকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য জাগরিত করেন; তিনি ধীশক্তি-সম্পন্ন প্রাণীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন।

১০। ব্যাধপত্নী যেরূপ চলনশীল (পক্ষীর) পক্ষ ছেদন করিয়া হিংসা করে, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত, নিত্য, এবং একরূপ-ধারিণী উষাদেবী (দিনে দিনে) সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন।

১১। উষা আকাশপ্রান্তকে (অন্ধকার হইতে) বিযুক্ত করিয়া সকলের নিকট বিদিত হয়েন, এবং ভগিনী নিশাকে অন্তর্হিত করেন। প্রণয়ী (সূর্য্যের) স্ত্রী উষা মনুষ্যগণের আয়ু (দিনে দিনে) হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েন।

১২। (পশুপালক) যেরূপ পশু বিচরণ করায়, সুভগা এবং পূজনীয়া উষা সেইরূপ (তেজ) বিস্তার করিতেছেন এবং নদীর ন্যায় মহতী উষা (সমস্ত জগৎ) ব্যাপ্ত করিতেছেন। তিনি দেবগণের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া সূর্য্যকিরণের সহিত দৃষ্ট হয়েন।

১৩। হে অন্নযুক্ত উষা! আমাদিগকে বিচিত্র ধন প্রদান কর, যে ধনের দ্বারা আমরা পুত্র ও পৌত্রকে পালন করিতে পারি।

১৪। হে গাভীযুক্ত, অশ্বযুক্ত, দ্যুতিমান্ এবং সুনৃত বাক্যযুক্ত উষা! অদ্য এই স্থানে ধনযুক্ত (যজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থে) আমাদিগের জন্য উদয় হও।

১৫। হে অন্নযুক্ত উষা! অদ্য অরুণ-বর্ণ অশ্ব সংযোজনা কর এবং আমাদের সমস্ত সৌভাগ্য আনয়ন কর।

১৬। হে দস্র অশ্বিদ্বয়! আমাদের গৃহ গাভীপূর্ণ ও রমণীয় ধনপূর্ণ করিবার জন্য সমান মনোযোগী হইয়া তোমাদের রথ আমাদের গৃহাভিমুখে প্রবর্ত্তিত কর।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আকাশ হইতে প্রশংসনীয় জ্যোতি প্রেরণ করিয়াছ, তোমরা আমাদের জন্য বলপ্রদ অন্ন আনয়ন কর।

১৮। উষাকালে অশ্বগণ জাগরিত হইয়া দ্যুতিমান্, আরোগ্যপ্রদ, সুবর্ণরথযুক্ত এবং দস্র অশ্বিদ্বয়কে সোমপান করিবার জন্য এ স্থলে আনয়ন করুক। (৯২ সূক্ত)।

১১৩ সূক্ত।

ঊষা দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতিঃ (ঊষা) আসিয়াছেন; তাঁহার বিচিত্র ও (জগৎ) প্রকাশক (রশ্মিও) ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। যেরূপ রাত্রি সবিতার প্রসূত, সেইরূপ রাত্রিও ঊষার উৎপত্তির জন্য জন্মস্থান কল্পনা করিয়াছেন। (১)

২। দীপ্তিমতী শুভ্রবর্ণা সূর্য্যের মাতা (২) (ঊষা) আসিয়াছেন; কৃষ্ণবর্ণা (রাত্রি) স্বীয় স্থানে গিয়াছেন; রাত্রি ও ঊষা উভয়েই (সূর্য্যের) বন্ধু এবং উভয়েই অমর। এক অন্যের পর আগমন করেন, এবং এক অন্যের বর্ণ বিনাশ করেন। এইরূপে তাঁহারা দীপ্তিমান হইয়া বিচরণ করেন।

৩। এই ভগ্নীদ্বয়ের (রাত্রি এবং ঊষার) একই অনন্ত সঞ্চরণমার্গ দীপ্তিমান্ (সূর্য্য কর্ত্তৃক) আদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা একের পর অন্যে সেই পথ বিচরণ করেন। সকল বস্তুর উৎপাদনকারী রাত্রি ও ঊষা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিলেও সমান মনঃসম্পন্না; তাঁহারা পরস্পরকে বাধা দেন না, এবং কখনও স্থির হইয়া অবস্থিতি করেন না।

৪। আমরা প্রভাসম্পন্না সুনৃত-বাক্যের নেত্রী (১) বিচিত্রা ঊষাকে জানি; তিনি আমাদিগের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তিনি সর্ব্ব জগৎ আলোকপূর্ণ করিয়া আমাদিগের ধন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সমস্ত ভুবন-সমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৫। যে সকল লোক বক্র হইয়া শুইয়াছিল, ঊষা তাহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের জন্য, কাহাকেও যজ্ঞের জন্য এবং কাহাকেও ধনের জন্য, সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য, জাগরিত করিয়াছেন। যাহারা অল্প দেখিতে পায়, ঊষা তাহাদিগের বিশেষরূপ দৃষ্টির জন্য (অন্ধকার দূর করেন)। বিস্তীর্ণ ঊষা সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৬। ঊষা কাহাকেও ধনের জন্য, কাহাকেও অন্নের জন্য, কাহাকেও মহা-যজ্ঞের জন্য, কাহাকেও অভীষ্ট লাভের জন্য (জাগরিত করেন); তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবনোপায় প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

(১) সূর্য্যের অস্তগমনের পর রাত্রি আইসে, এই জন্য রাত্রি সূর্য্যের সন্তান, আবার রাত্রির পর ঊষা আইসে এই জন্য ঊষা রাত্রির সন্তান।

(২) ঊষার পর সূর্য্য আসে এই জন্য সূর্য্য ঊষার সন্তান।

(১) ঊষার প্রাদুর্ভাব হইলে পশু পক্ষী মৃগাদি শব্দ করে এই জন্য তিনি সুনৃত বাক্যের নেত্রী।

ভুত না মানুষ ?

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নন্দকের কৃতিত্ব।

বসন্ত-সন্ধ্যা। এ সন্ধ্যার বৃক্ষবল্লী কি সুন্দর! কেমন কোমল-ভাবে তাহারা মধুর সমীরে অঙ্গ ঢালিয়া নৃত্য করিতেছে। তৃণশষ্প-গুল্মাবৃত জঙ্গল-রাশির মধ্যেও এ সময়ে কেমন একটা সৌন্দর্য্য! কি সুন্দর চন্দ্র! কি মিষ্ট তাহার জ্যোতিঃ! এ সময়ের মলয়প্রবাহ কি সঞ্জীবনী-শক্তিময়!

আজ সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতে পারে নাই, কারণ একাদশীর চন্দ্র আকাশে সমুদিত হইয়া হাস্য করিতেছিল! পথের ধারে প্রকাণ্ড একটি বটবৃক্ষ। কস্তুচূর্ণের ন্যায় সুবিমল চন্দ্ররশ্মি সেই বিশাল বৃক্ষের উপর নিপতিত হইয়া একটি স্বপ্নরাজ্যের মনোমোহন দৃশ্য বিকাশ করিতেছিল। তাহার নীচে একদল বৈষ্ণব দলপতিকে মধ্যে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এই সময় নন্দক, ভবভূতি, দেবদত্ত, চন্দনী ও চন্দনীর মাতা এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মধুর কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষতলস্থিত একটি সুন্দর স্থানে তাহারা উপবেশন করিলেন। সুললিতবীণাধ্বনিবৎ কীর্ত্তনধ্বনি তাহাদের চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তাহাদের পথশ্রম-কাতর অবসন্ন দেহ ও প্রাণ যেন সেই সুমধুর গীতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইল।

স্থানটি যেমন মধুর তেমনি নির্জ্জন। নন্দক বহুক্ষণব্যাপী কীর্ত্তন শ্রবণের পর উঠিয়া দলপতির নিকটে গমন করিলেন ও তাহাকে প্রণাম করিলেন। দলপতি নন্দককে চিনিতে পারিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

নন্দক কহিলেন, 'মহাশয় কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?' বৈষ্ণবদলপতির ম্লান চক্ষে ধারা বহিল, তিনি কহিলেন, 'চিনিতে পারিব না কেন?'

নন্দক—তবে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন না কেন?

দলপতি—তুমি কোন্ স্থান হইতে আসিতেছ? কোথায় যাইবে?

নন্দক—আমি প্রতিধ্বনির অনুসন্ধান ও উদ্ধাররূপ মহৎ কার্য্যে ব্যস্ত আছি, আমাকে সদা সর্ব্বদাই এ স্থানে সে স্থানে যাতায়াত করিতে হইতেছে। কোথায় যাই, কোথায় থাকি, তাহার কোন স্থিরতা নাই।

দলপতি একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'ওনাম আর আমার নিকট উচ্চারণ করিও না নন্দক! যে মধুর, যে পবিত্র, যে সুন্দর, যে নির্ম্মল জিনিষ আমি নষ্ট করিয়াছি, তাহার নাম শ্রবণেও আমার আর কোনও অধিকার নাই।'

এই সময় চন্দনী বৈষ্ণবদলপতিকে চিনিতে পারিলেন ও তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দলপতি তাহাকেও চিনিতে পারিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'মা জননি! তুমিও আমাকে চিনিতে পারিয়াছ?'

চন্দনী মস্তক আন্দোলনপূর্ব্বক সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

দলপতি—'তুমি যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলে, আমি তাহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। আমার মত চিরহতভাগ্য ও দরিদ্র পিতা জীবিত না থাকিলেও প্রতিধ্বনির কোনও ক্ষতি হইত না।' বলিতে বলিতে দলপতি শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

চন্দনীও শোক সহ্য করিতে না পারিয়া সমধিক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

নন্দক চন্দনীকে প্রবোধ দিয়া বৈষ্ণব-দলপতিকে কহিলেন, "এই অগ্রজার অনুমতিক্রমেই আমি দ্বিপ্রহর রজনীতে প্রতিধ্বনির বিপদবার্ত্তা লইয়া মহাশয়ের নিকট গমন করিয়াছিলাম এবং শত্রুদের বিবিধ প্ররোচনা সত্বেও আমি যথাকালেই মহাশয়কে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় উভয়ের পরিশ্রমই পণ্ড হইয়া গেল।"

দলপতি কহিলেন, 'নন্দক, তুমি আর আমাকে প্রতিধ্বনির জীবিত পিতা ইন্দ্রমৌনী বলিয়া বিশ্বাস করিও না, কারণ দুঃখ, দৈন্য, ঘৃণা, অপমান ও দরিদ্রতায় আমি মরিয়াই রহিয়াছি। এখন হইতে তোমরা আমাকে মৃত ব্যক্তি বলিয়াই জানিও।'

নন্দক—মহাশয় স্থির হউন। আমি আপনাকে এ লজ্জা ও ঘৃণা হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিব, করিবই করিব।

এইখানে বৈষ্ণবদলপতি ইন্দ্রমৌনীর বিষণ্ণ দৃষ্টি দেবদত্তের উপরে নিপাতিত হইল। দেবদত্ত একটু দূরে বসিয়াছিলেন। ইন্দ্রমৌনীর চক্ষে চক্ষু সংলগ্ন হওয়ায় তিনিও তাহাকে চিনিতে পারিলেন।

ইন্দ্রমৌনী দেবদত্তকে দেখিয়া আর সাম্লাইতে পারিলেন না, দেবদত্তের কোলের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন ও স্ত্রীলোকের ন্যায় করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, "আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক তুমি কি জীবিত আছ? আমি যে তোমাকে মৃত্যুমুখে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। দরিদ্রতা যে আমাকে তোমার নিকটে রহিতে দেয় নাই।"

দেবদত্তের হৃদয়ও পিতৃতুল্য স্নেহবান্ ব্যক্তির ক্রন্দনে দ্রব হইয়া গেল ও নেত্র-পথে অবিরল শোকবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের মানসপটে পূর্ব্বস্মৃতি-সকল জাগ্রত হইল।

নন্দক তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

ইন্দ্রমৌনী কহিলেন, 'দেবদত্ত, তোমার অসুখ হওয়ার পর হইতেই আমি

তোমার নিকটেই ছিলাম। যে সময়ে তুমি স্বপ্নে ঔষধ পাইলে এবং তোমার ব্যাধির একটু উপশম বোধ হইতে লাগিল, ঠিক সেই সময় তোমার অন্নকষ্ট দেখিয়া আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। তাহার পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমার নিকট বর্ণনা কর।

দেবদত্ত মুখও তুলিলেন না ও কোন বাক্যব্যয়ও করিলেন না।

নন্দক কহিলেন 'ইনি স্বপ্নদত্ত ঔষধেই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই বলশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহারা আপনার কন্যা প্রতিধ্বনিকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহারাই ইহাকে বাঁধিয়া চণ্ডদেবের একটি পরিত্যক্ত ঘরে রাখিয়া গিয়াছিল। আমি দেখিতে পাইয়া ইহাকে তথা হইতে মুক্ত করি এবং ইহাকে বলশালী ও রোগমুক্ত দেখিয়া প্রতিধ্বনির অনুসন্ধান কার্য্যে ইহাকেও সঙ্গে করিয়া লই। আমার ভগ্নী চন্দনীকেও তাহারাই হত্যা করিবার মানসে প্রকাণ্ড এক বনের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দৈবানুগ্রহে সেই মুহূর্ত্তে আমি গিয়া সেইখানে উপস্থিত হই ও চন্দনীকে রক্ষা করি এবং আপনার জামাতাকে সঙ্গে করিয়া আপনার কন্যার অনুসন্ধান করিবার জন্য আমি পুনরায় সেই প্রকাণ্ড বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। বনের মধ্যে আপনার কন্যার কণ্ঠের স্বর্ণপদক নিপতিত ছিল; তাহা দর্শন করিয়া আপনার জামাতা শোকাবেশে অস্থির হইয়া জ্ঞানহীন অবস্থায় ভূমিতে পতিত হন এবং ঠিক সেই সময়ে একটি শত্রুর পদানুসরণপূর্ব্বক আমিও দূরে সরিয়া পড়ি। শত্রুরা তাহাকে একাকী ও জ্ঞানহীন অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া গোপনে বধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু আমি ও আপনার জামাতা সেই ভয়াবহ ভূতের বনে যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছি দেখিয়া আমার জননী দেবী অলক্ষ্যে আমাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। আমাকে দূরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি স্বয়ং আপনার জামাতার রক্ষার উপায় করিলেন। শত্রুদের বেশ পরিধানপূর্ব্বক শত্রুদের সঙ্গে সম্মিলিতা হইলেন এবং দেবদত্তকে এখনি হত্যা না করিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। ভাগ্যক্রমে তাহার পরামর্শমতই কার্য্য হইল। দেবদত্ত অজ্ঞান অবস্থাতেই নদীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আমার জননী দেবী আর শত্রুদের অনুসরণ না করিয়া শত্রুদের অলক্ষ্যে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নদীর জলে নিপতিতা হইয়া দেবদত্তকে জল হইতে তুলিলেন ও নানাবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার জ্ঞান সম্পাদন করিলেন।

ইন্দ্রমৌনী—নন্দক, তোমার মাতার ও তোমার ভগিনীর ঋণ কি আমি এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব?

নন্দক, সেটা আমার পক্ষে অসম্ভব, সাধ্যাতীত।

নন্দক—'আমরা আপনার কি করিতেছি ? কিছুই করিতেছি না, প্রকারান্তরে নিজ নিজ আত্মারই অক্ষয় কল্যাণ সাধন করিতেছি। পৃথিবীতে পরোপকার করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং পরের অনিষ্ট-চিন্তাই মহাপাপ। মহামতি বিদুর একমাত্র পরোপকার-ধর্ম্মের সাধনাতেই দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং এই একমাত্র পরোপকার-ধর্ম্মই তাঁহার ভারতবিখ্যাত যশ ও কীর্ত্তিকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে।' সহসা ইন্দ্রমৌনীর বিষণ্ণ দৃষ্টি ভবভূতির প্রতি নিপতিত হইল। তিনি কহিলেন,'ইনি কে ?'

নন্দক—ইহার নাম ভবভূতি। ইনিও আপনার মতই ব্যথিত।

ইন্দ্রমৌনী—আমার নিকট ইহার পরিচয় প্রদান কর নাই কি ? তখন সুবক্তা, সুপুরুষ নন্দক ভাবময়ীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর হইতে যত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সমুদয় ইন্দ্রমৌনীর নিকট বর্ণনা করিলেন এবং অতি অল্প বিষয়ই বাদ দিলেন।

ভবভূতি একটি কুন্দবৃক্ষের সন্নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাহার ম্লান দৃষ্টি সেই ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরেই নিপতিত ছিল। কিন্তু বহুক্ষণ তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না, সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অধোমুখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নন্দক তাঁহাকেও সান্ত্বনা করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি নন্দকের প্রবোধবাক্য শ্রবণ না করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন—

"আমার ভাবময়ী এই কুন্দফুলকে বড় ভাল বাসিত। গোলাপ বকুলকে তুচ্ছ করিয়া অগ্রে এই ফুল দ্বারাই তাহার ফুল-সাজির অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিত। সে এই কুন্দ-তুল্য পুষ্পগুলি দ্বারা কেমন সুন্দর বলয় নির্ম্মাণ করিয়া হস্তে পরিধান করিত। অনেক সময় এই ফুল দ্বারা চন্দ্রহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মাতার কটিদেশে পরাইয়া দিতে যাইত এবং মাতা কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া নিজেই তাহা পরিধান করিত। হায়! আমার এই ক্ষুদ্রকায়া ফুলের ন্যায়ই ক্ষুদ্রদেহা ও সরলমনা ছিল। সৌন্দর্য্যও ইহা হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না।

নন্দক বিশেষ নির্ব্বন্ধসহকারে প্রবোধ-প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে স্থির করিলেন। কিন্তু সে সময় তাঁহার নিজের চক্ষুও অশ্রুশূন্য ছিল কি না সন্দেহ।

অনেকক্ষণ পরে দেবদত্ত প্রকৃতস্থ হইয়া শ্বশুরের পদধূলী গ্রহণ করিলেন। মেঘ-মুক্ত শশিকলার ন্যায় দেবদত্তের রোগমুক্ত সুন্দর কান্তি অবলোকনপূর্ব্বক কন্যাকে স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত ইন্দ্রমৌনীর হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি জ্ঞানের দ্বারা মনকে সংযত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চন্দনীর মাতা ইন্দ্রমৌনীকে কহিলেন, 'আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন্।'

ইন্দ্রমৌনী—না না, আমাকে আর ডাকিবেন না, আমি সংসার বিষবৎ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রতিধ্বনি·

জনিত বিপদ আমাকে আঁধার হইতে আলোকে লইয়া আসিয়াছে। এখন কীর্ত্তনই আমার জীবন ও জীবনের মূল। কীর্ত্তন করিতে করিতে দিনের পর দিন চলিয়া যায়, বিরাম বিশ্রামের কথা আমার মনে উদিত হয় না। এমন কি কীর্ত্তন পাইলে আহারের স্পৃহাও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আমাকে আর সংসারে ডাকিবেন না, তবে কন্যার শুভ সংবাদ দিতে পারিলে আমাকে দিবেন, ইহা আমি চাই। সে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসুক, পতির গৃহে পতির পদে তাহার স্থান লাভ হউক, ইহাই আমার ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ।

তাহার দরিদ্রতা, এমন কি মৃত্যুও আমাকে আর প্রপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। পরপুরুষ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই—শুধু এই সংবাদ জানিবার জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রহিল। বুঝিলে চন্দনীর মাতা, পৃথিবীর সমুদায় বাসনা কামনার হস্ত হইতে যে কেবল উদ্ধার হইতে চেষ্টা করিতেছি তাহা নহে, এই আকাঙ্ক্ষাটি আমাকে লোকালয়ে রাখিয়াছে। এই শুভ সংবাদটি কর্ণগোচর হওয়ার পর আমাকে কেহই আর লোকালয়ে দেখিতে পাইবে না।

চন্দনী—তবে কি আপনি প্রতিধ্বনির মায়া কাটাইলেন?

ইন্দ্রমৌনী—ধীরভাবে কহিলেন "কৈ, প্রতিধ্বনিই বা কৈ? তাহার মায়াই বা কিসের?" এই কথা কহিতেই ইন্দ্রমৌনীর পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর একটা অসহ্য বেদনার ছায়া পতিত হইল।

চন্দনী—তবে কি আপনি প্রতিধ্বনির মৃত্যুই নির্দ্ধারণ করিলেন।

ইন্দ্রমৌনী ললাটের বিষাদচিহ্ন সাধ্যমত অপসারিত করিয়া কহিলেন, তাহার প্রাণবিয়োগ না হইতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মহিলার মৃত্যু বহু রকমে সংসাধিত হয়। এই কথা বলিয়াই তিনি দলসহ মধুর স্বরে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন। দেবদত্ত, চন্দনী, চন্দনীর মাতা ও নন্দক সেই মধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে গন্ধবাপথাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যৎকালে তাহারা চণ্ডদেবের গৃহাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রজনী প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তাহারা সকলেই এক একটি বলশালী ঘোটকারোহণে আসিতেছিলেন। চন্দনীর মাতা ঘোটকারোহণে চির-অভ্যস্তা। ইদানীং তিনি কন্যাকেও ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। তাহারা সকলেই চণ্ডদেবের আদেশ অনুসারে কেহ লক্ষ্যে, কেহ অলক্ষ্যে রহিয়া, চণ্ডদেবের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। চন্দনীর ও চন্দনীর মাতার ক্রমে ক্রমে এই জ্ঞান হইতে লাগিল যে, চণ্ডদেব আর সে চণ্ডদেব নাই। সে আপনার চরিত্র আশ্চর্য্যভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে। সে এখন সদা সর্ব্বদা রাজরাজেশ্বরের বিগ্রহের সম্মুখে উপবিষ্ট

থাকে এবং "আমার হৃদয়রাজ্যের রাজা একমাত্র এই রাজরাজেশ্বর" ইত্যাদি গোটাকত শব্দ ব্যতীত অন্য কথা অল্পই উচ্চারণ করে। সে আহত হইবার পর হইতেই বিদেশে যাওয়া একরূপ বন্ধ করিয়াছে। চন্দনী ও তাহার মাতা চণ্ডদেবের সম্মুখে বহির্গত হইলেন না, কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন। দেবদত্ত ও ভবভূতির দৃষ্টি চণ্ডদেবের উপরেই নিপতিত রহিয়াছে।

পূর্ব্বে চণ্ডদেব একদিন বলিয়াছিল যে, একজন কালবেশধারী ভূত তাহার পিছনে লাগিয়াছে ; কিন্তু তাঁহারা সূক্ষ্মভাবে পরিদর্শন করিয়াও সে কালবেশধারী ভূতের কোন সন্ধান লাভ করিতে না পারিয়া চণ্ডদেবকে ঘোর মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থির করিলেন এবং কবে এই মিথ্যাবাদীর সমুচিত শাস্তিলাভ হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

একদিন রজনীযোগে তাঁহারা নন্দক, ভবভূতি ও দেবদত্তকে আহ্বান করিয়া একটি গুপ্ত ঘরের মধ্যে সকলে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। নন্দকের মাতা নন্দককে কহিলেন, চণ্ডদেব যতই সাধু হউক না কেন, তাহার প্রতিবাসিগণ তাহাকে দাতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া যতই মান্য করুক না কেন, সে প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীর অপহরণ এবং চন্দনীর ও চন্দনীর মাতার হত্যাপরাধে দণ্ডিত হইবে না কেন?

দেবদত্ত—আপনি এখন কি করিতে বলেন?

চন্দনীর মাতা—প্রকাশ্যেই হোক্ আর অপ্রকাশ্যেই হোক্, চণ্ডদেবের মত চতুর ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম হওয়া, নন্দকের মত লোকের কাজ নয়।

দেবদত্ত—তবে আপনি তাহার সম্বন্ধে কি করিতে বলেন?

চন্দনীর মাতা—চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু করিতে বলি। পুলিসের আশ্রয় ব্যতীত এ কাণ্ডের কোনও কূলকিনারা করিবার শক্তি নন্দকের নাই।

ভবভূতি মাথা নাড়িলেন।

চন্দনীর মাতা কহিলেন, 'আপনি মাথা নাড়িলেন কেন? বালিকাদের কলঙ্ক রটনা হইবে এই ভয়ে?'

ভবভূতি 'হাঁ হাঁ' বলিতে বলিতেই তাহার চক্ষুপল্লব জলভারাক্রান্ত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল।

চন্দনীর মাতা—কলঙ্ক হইবে এই ভয়ে? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা যাহাতে কলঙ্কিত না হয়, তাহার উপায়ও করিতে হইবে। কলঙ্ক হইবে এই ভয়ে তাহাদিগকে কলঙ্কিত করা কি কর্ত্তব্য? শালবৃক্ষ প্রভঞ্জনের সহিত বিরোধ করিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তাহার শক্তি যখন শেষ হয়, তখন সে সমূলে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য সমুদায়ই বিনষ্ট হয়। ভাবিয়া দেখুন অবলা স্ত্রীলোকের শক্তিই বা কতটুকু? আপনারা

নন্দকের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবেন না, কখনও থাকিবেন না।

দেবদত্ত—নন্দক, তুমি চণ্ডদেবের গতিবিধির উপরত দৃষ্টি রাখিয়াছ, কিন্তু কিছু কি বাহির করিতে পারিলে?

নন্দক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কোনও কথা কহিলেন না।

চন্দনীর মাতা—বল নন্দক! তোমার যাহা বলিবার আছে, বল।

নন্দক—আমি চণ্ডদেবের উপর দৃষ্টি রাখিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে তিনি নির্দ্দোষ বলিয়াই আমার মনে হয়।

চন্দনী ও চন্দনীর মাতা হাস্য করিয়া উঠিলেন। দেবদত্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

নন্দক—আপনারা আরও কিছুদিন আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকুন্।

চন্দনী ও তাহার মাতা—আর কত দিন?

নন্দক—বেশী দিন নয়।

চন্দনীর মাতা—আচ্ছা তাহাই হোক। তুমি আরও কয়েক দিন নষ্ট কর, আমরা নীরবে বসিয়া বসিয়া ভাগ্য-সাগরের নীল লহরী গণনা করি।

এই কথা বলিয়া চন্দনীর মাতা সে ঘর হইতে বহির্গমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

নন্দকের বিশ্বাস যে, চণ্ডদেবের পুরাতন নথী পত্র অনুসন্ধান করিলেই তিনি বাঞ্ছিত কিছু প্রাপ্ত হইবেন, অতএব তিনি আহার নিদ্রা বিস্মরণপূর্ব্বক কেবল চণ্ডদেবের পুরাতন নথীপত্রই খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি একটি পুরাতন আল্‌মারা খুলিয়া কতকগুলি জীর্ণ নথী পত্র বাহির করিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতরে অতি জীর্ণ বস্ত্রের ছোট একটি গাঁটরী ছিল। তিনি তাহা হস্তগত করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভালরূপে দেখিলেন। তাঁহার সন্দেহ দৃঢ় হইল, তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া জীর্ণ গাঁটরীটি খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতর একটি থলিয়া ছিল, থলিয়াটিও অত্যন্ত জীর্ণ, অতএব অনায়াসে তিনি তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতর হইতে একরূপ অদ্ভুত অক্ষরে লিখিত একখানি জীর্ণ লিপি বাহির হইল। আরও একখানি কাগজ বাহির হইল, তাহার মধ্যে কতকগুলি কালির রেখা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি অদ্ভুত-রেখাসংযুক্ত লিপিখানি পাঠ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইলেন না, রেখাগুলির ভাবার্থও কিছু বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। অনেক চিন্তার পর তিনি ইহাই স্থির করিলেন যে, ইহা অন্য একপ্রকার অক্ষর, তাহা শিক্ষা না করিলে উহা পাঠ করা যাইবে কেন? এই লিপিখানিতে নিশ্চয়ই কোন সাঙ্কেতিক কথা আছে, এ রেখাগুলিও কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ইহা যখন চণ্ডদেবের গৃহে আছে, তখন ইহা চণ্ডদেবেরই।

হয়ত চণ্ডদেবের পিতামহ চণ্ডদেবের পিতার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, যিনিই যাঁহার জন্য এই সাঙ্কেতিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনিই ইহা পাঠ করিবারও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উপস্থিত এই সংসারে চণ্ডদেব ব্যতীত আর কেহই নাই, অতএব চণ্ডদেবই ইহার অধিকারী। হয়ত তিনি এ লিপির এ বিষয় ঘুণাক্ষরেও অবগত নহেন। কালে কোনও দিন জ্ঞাত হইতেও পারেন এই জন্যই ইহা রক্ষিত হইয়াছে। ইহা চণ্ডদেব প্রাপ্ত হউক অথবা এ গৃহের অন্য কেহ প্রাপ্ত হউক, এই ইচ্ছা যিনি করিয়াছেন, তিনি ইহা পাঠ করিবার ও বুঝিবার উপায়ও করিয়াছেন—এ কথা নিশ্চয়।

ইহার পর নন্দক কালবিলম্ব না করিয়া চণ্ডদেবের নিকট গমন করিলেন। চণ্ডদেব একখানি কৃষ্ণ শিলার উপরে উপবিষ্ট হইয়া অতি নিবিষ্ট মনেই যেন কালিদাসকৃত কুমার-সম্ভব পাঠ করিতেছিলেন, এইরূপ অনুভব হইতেছিল। নন্দক অদ্ভুত অক্ষরগুলির অবিকল নকল করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই চণ্ডদেবকে দেখাইয়া কহিলেন, 'এ অক্ষরগুলি কে কবে লিখিয়াছে? ইহা পাঠ করিবার প্রণালী আপনার জানা আছে কি?

চণ্ডদেব গ্রন্থ হইতে নেত্র উত্তোলনপূর্ব্বক নন্দকের মুখাবলোকন করিতে করিতে ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন 'হাঁ, ইহা আমার পিতা কর্ত্তৃক লিখিত। তিনি ইহা আবিষ্কার করিয়া আমাকে শিখাইয়াছিলেন। ইহার শিক্ষার একটি প্রণালীও আছে। কিন্তু কোথায় আছে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পার। নন্দকের চেষ্টা বৃথা হইল না। তিনি জীর্ণ কাগজের মধ্যে "অদ্ভুত অক্ষর শিক্ষা' নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। এই পুস্তিকার মধ্যে এই অদ্ভুত অক্ষর শিক্ষার প্রণালীগুলি অতি সহজ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নন্দক চব্বিশ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়া সেই অক্ষরগুলি পড়িবার নিয়ম শিক্ষা করিলেন এবং সেই অদ্ভুত অক্ষরে লিখিত লিপিখানি আমূল পাঠ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট রেখাগুলির মর্ম্মও অবিদিত রহিল না। তিনি অবিলম্বে তাঁহার মাতা ও ভগিনী, ভবভূতি ও দেবদত্তকে ডাকিয়া একটি সভা করিলেন এবং তাহাদের নিকটে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি এই দণ্ডেই পুরমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া সম্ভবতঃ অল্প দিনের জন্যই রাজপুতানায় যাইবেন।

নন্দক হঠাৎ একাকী রাজপুতানায় যাইবেন শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

তাঁহার মাতা কহিলেন, রাজপুতানায় যাইবে? কেন চোরের সন্ধানে, না প্রভুর কার্য্যে?

নন্দক—চোরের সন্ধানে।

মাতা—চোরের সন্ধানে!

নন্দক—হাঁ।

মাতা—চোর রাজপুতানায় গিয়াছে না কি? প্রকৃত যে চোর সেত চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সাধু সাজিয়াছে এবং এইখানেই এই বাড়ীতেই ত আছে। রাজপুতানায় যাইবে কেন?

দেবদত্ত কহিলেন—'নন্দকের কার্য্যে বাধা প্রদান করিবেন না। বিশাল চক্ষু, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রশস্ত ললাট সম্পন্ন পুরুষের উপর নির্ভর করিলে স্বকার্য্য সাধনে বিলম্ব হয় না।'

চন্দনী ও চন্দনীর মাতা মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হোক। একাকীই যাইবে নাকি?'

দেবদত্ত নন্দকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

নন্দক কহিলেন, 'হাঁ, একাকীই যাইব।'

মাতা—যদি কোন বিপদ হয়?

নন্দক—যিনি জননীরূপে দুইবার রক্ষা করিয়াছেন এবারেও তিনি রক্ষা করিবেন।

ঈশ্বরের নামে নন্দকের মাতার মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তিনি যোড়হাতে ভগবানকে প্রণাম করিয়া নন্দককে বিদায় দিলেন।

সভাভঙ্গ হইল।

নন্দক চণ্ডদেবের নিকটেও বিদায় চাহিলেন। চণ্ডদেব কহিল—'তুমি রাজপুতানায় যাইবে? আমি যে তোমাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে ভয় করি।'

'যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিব' এই কথা বলিয়া নন্দক রাজপুতানাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

বর্ষশেষে।

হবে নাকি মূঢ় মন এখনও চেতনা তোমার,
দিবা অবসানপ্রায় ক্রমে ঘেরিছে আঁধার।
দিন গত দিনান্তর, সপ্তাহ মাস বৎসর,
জাগি জাগি করি কত ঘুমাইলে বার বার,
বৃথা দিন কাটাইলে গোলে হরিবোল দিলে,
শুনা বুলি শুনাইলে, প্রকাশিতে অহঙ্কার,
ঠকাইতে অন্য জন নিজেই ঠকিলে মন,
শূন্য ঘরে এ রোদন, তাই হইয়াছে সার।
শুন প্রবীণ অজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান,
এ বড় কঠিন রোগ, বিষম চিত্তবিকার।
লজ্জা অভিমান ভুলি, সব আবরণ খুলি,
দেখ দেখ নিজ চক্ষে দশা এবে আপনার,
যিনি পূর্ণ সত্যময়, হয়ে সরলহৃদয়
সত্যভাবে ডাক তাঁরে, দুস্তরে পাবে নিস্তার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ঋণদানবিষয়ক প্রস্তাব—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ভারতগবর্ণমেণ্ট ঋণদান ও গ্রহণ বিষয়ক এক আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে বিচার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি এই আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে বিচার করিয়া সুদের হার কমাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী—কাউণ্ট ওকুমা জাপানের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়স এখন ৭৬ বৎসর। ইনি ১৬ বৎসর সমাজসংস্কার, জমীদারদিগের প্রভুত্বধ্বংস প্রভৃতি নানা সৎকার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। কাউণ্ট ওকুমা যেমন রাজনীতি-বিশারদ, তেমনি স্বাধীনচেতা পুরুষ। ইহাঁর মন্ত্রিত্বে জাপানে বিশেষ উন্নতির আশা আছে।

আমেরিকায় রমণীর পরাজয়—আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্র রমণীদিগকে নির্ব্বাচনাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার সিকাগো নগরে "অল্ডারম্যানের" পদ খালি হইয়াছিল। বহু পুরুষ ও নয় জন রমণী ঐ পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ঐ পদে লোকনিয়োগার্থ ভোট সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে পুরুষদিগের ভোট অধিক হয়। এমন কি, রমণীদিগের মধ্যেও অধিকাংশই পুরুষদিগকে ভোট দিয়াছেন।

হাইকোর্টের জুরীর তালিকা—হাইকোর্টের স্পেশাল জুরীর তালিকায় ৩৯৬ জনের নাম ভুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০ ইউরোপবাসী ও ১৯৬ জন ভারতবাসী।

আমেরিকায় কয়েদীর শাসন—আমেরিকার ফিলাডেল্‌ফিয়ার এক উদ্যানের সমস্ত কাজ কয়েদী দ্বারা করান হইয়া থাকে! এই কয়দীদিগের মধ্যে সকলেই ৮ হইতে ১৮ বৎসরের বালিকা। ষ্টেট হইতে শাস্তি প্রদান করা হইলে তাহাদিগকে সংশোধন-কারাগারে না পাঠাইয়া এই উদ্যানে পাঠান হয়। এই স্থানে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অধীনে তাহাদিগকে বাগানের কাজ করিতে দেওয়া হয়। এই উদ্যানে আপাততঃ ৪০০ শত বালিকা আছে।

ছাপাখানার বিদ্যালয়—কলিকাতা সহরে ছাপাখানা সম্বন্ধীয় একটি বিদ্যালয় খুলিবার আয়োজন হইতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশে যে ছাপাখানার কার্য্য এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তথায় ছাপাখানার বিদ্যালয় আছে।

কল চালানের উপায়—আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় মন্ত্রণা-সভা হইবে। এই সভায় রেলগাড়ীতে শীতল ঘর নির্ম্মাণ করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ফল চালানের ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ হইবে।

রেলগাড়ীতে শীতল ঘর থাকিলে দূরবর্ত্তী স্থানের ফল সকল অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে।

প্রস্তর-বৃষ্টি—সম্প্রতি মান্দ্রাজের কালিকট নগর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং বজ্রপাতশব্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুতি-গোচর হয়, এবং ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক মণ দশ সের ওজনের কতকগুলি উল্কা-প্রস্তর দক্ষিণ মালাবার ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে পতিত হইয়াছিল।

অতি লোভ।

ছয় রিপুর মধ্যে লোভও একটি রিপু। কিন্তু লোভের অনেক প্রকার মাত্রা আছে। পৃথিবীতে লোভশূন্য লোক নাই। তবে যাহার লোভ অতি অল্প তাহাকেই আমরা সাধু বলিয়া থাকি, এবং যাহার লোভ অধিক, তাহাকেই আমরা অসাধু বলিয়া থাকি। অসাধু ব্যক্তিদিগের লোভ এত প্রবল যে, তাহারা মনোমত দ্রব্য পাইলেই আরও অধিক পাইতে ইচ্ছা করে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের লোভ অসীম হইয়া পড়ে, এবং কিরূপে তাহাদিগের পতন হয়, তৎসম্বন্ধে নিম্নে একটি গল্প প্রদত্ত হইল।

কোন দেশে একজন জেলে তাহার স্ত্রীকে লইয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। জেলে মাছ ধরিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই তাহাদিগের কোনও প্রকারে দিন কাটিত। একদিন জেলে নদীতে মাছ ধরিতে ধরিতে একটি খুব বড় রোহিত মৎস্য পাইল। কিন্তু, ঐ রোহিত মৎস্য বাস্তবিক মৎস্য নহে। উহা একটী রাজপুত্র, মায়াবলে মাছের আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই রাজপুত্র মিনতি করিয়া বলিল, 'ভাই হে! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, এবং আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।' জেলে অত্যন্ত ভাল মানুষ, সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং কিছুই প্রার্থনা করিল না। মাছধরা শেষ হইলে জেলে বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড় মন্দপ্রকৃতির নারী ছিল। সে ইহা শুনিয়াই একেবারে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া জেলেকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, 'তুমি এখনই তথায় যাইয়া ঐ মাছটির নিকট একটি পাকা বাড়ীর জন্য প্রার্থনা কর। জেলে বেচারা বড় ভাল মানুষ ছিল। সে স্ত্রীর তাড়নায় ক্ষুণ্ণমনে নদীর অভিমুখে গমন করিল। ক্রমে যখন সে নদীর নিকট আসিল, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—

ওগো জলচর রাজপুত্রবর

কোথা আছ ভাই তুমি?
স্ত্রীর অনুরোধে আসিয়াছি মনে
বর যে মাগিতে আমি।

এই কথা বলিবামাত্র মাছটি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন জেলে তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। ইহা শুনিয়া মাছটি বলিল, 'আচ্ছা, তুমি বাড়ী গিয়া দেখিবে যে, তোমাদের একখানি পাকা বাড়ী হইয়াছে।' এই কথা বলিয়াই মাছটি অদৃশ্য হইয়া গেল তখন জেলে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং গৃহে আসিয়া দেখিল যে, তাহাই হইয়াছে তাহার স্ত্রী সেই নূতন গৃহে বসিয়া আছে। কিছু দিন যায়, আবার একদিন তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল, 'তুমি আবার সেই মাছটীর নিকট যাও এবং একটি খুব সুন্দর এবং বড় বাগান-বাড়ীর জন্য প্রার্থনা কর।' সেও আবার নদীতে গমন করিল এবং পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পুনরায় বলিবামাত্র মাছটি আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন জেলে তাহাকে সমস্ত কথা বলিলে, মাছটি তাহাকে প্রার্থিত বরদান করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। যতই অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল, ততই তাহার স্ত্রীর লোভ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সে রাজরাজেশ্বরী হইল, কিন্তু তথাপি তাহার লোভের হ্রাস পাইল না। একদিন সে তাহার স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি আর একবার মাছের নিকট যাও, এবং গিয়া তাহাকে বল যে, 'আমাদিকে স্বর্গের রাজা করিয়া দিতে হইবে।' সে পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও চলিল এবং নদীতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি উচ্চারণ করিল। তৎক্ষণাৎ মাছটি আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এবার আর মাছটি বর দান করিল না, সে বলিল, 'আমি তোমাদিগকে শাপ দিতেছি যে, তোমরা পূর্ব্বে যে কুটীরে বাস করিতে সেই কুটীরেই বাস করিবে।' এই বলিয়া মাছটি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন সে অতি বিষণ্ণ মনে বাড়ী আসিয়া দেখিল বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে।

এই গল্পটি হইতে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, কখনও অতি লোভ ভাল নয়। যে ব্যক্তি অতিলোভ করে, সেই ব্যক্তিই ঐ জেলের স্ত্রীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবস্থার অতিরিক্ত কোনও দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা করাকেই অতিলোভ বলে। দেখ ঐ জেলের স্ত্রী সামান্য কুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত পাইয়াছিল, কিন্তু যখন সে সামান্য মানবী হইয়া স্বর্গের প্রভুত্বলাভে ব্যগ্র হইল, তখনই তাহার এই দুরবস্থা ঘটিল। অতিলোভের পরিণামই এইরূপ।*

*Grimm's Popular Stories এর একটী গল্পের ভাবাবলম্বনে লিখিত।

ভুলভাঙা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৪)

"আপনি যাই বলুন, আমার কিন্তু কিছুতেই মত হয় না যে, আপনি সেখানে যান।"

"বাবা! মেয়ে তা'দের বটে, কিন্তু বৌ আমাদের, আমাদের ঘরের বৌ সেখানে ফেলে রাখব, লোকে কি ভাল বল্‌বে? শুধু লোকনিন্দা নয় ধর্ম্মের কাছেও দায়ী হ'তে হ'বে। আর বেয়াই যতই বড় লোক হন, আমাকে কিছু আর অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিতে পার্‌বেন না।"

পিতা পুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। অমর বলিল, "তা বাবা! আপনি যখন সঙ্কল্প স্থির ক'রেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, এবং এতদূর পর্য্যন্ত এসেছেন, তখন আর আপনাকে কি বলিব? আপনার কর্ম্মভোগ এখনও শেষ হয় নাই, আরও কিছু বাকী আছে।"

কাশীনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না অমর! সে ভাবনা ক'রোনা। বেয়াই তো লোক মন্দ নন্! আমাদের সঙ্গেত কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই; তবে আদুরে মেয়ে, জন্মাবধি অট্টালিকায় বাস, পল্লীগ্রাম কখনও চক্ষেও দেখেন নাই। তাই সহসা পাঠা'তে ইতস্তত কচ্ছেন। তা' আমি নিজে গেলে কি আর অমত কর্‌তে পার্‌বেন?"

অমর সে কথার কোন উত্তর দিল না। তখন কাশীনাথ বলিলেন, "তুমি কলেজ থেকে ফিরে এলে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। একটু সকাল সকাল এস।"

অমর বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি বাবা! আমি আবার কোথায় যাব?"

বাধা দিয়া কাশীনাথ বলিলেন, না না, তোমাকে যেতেই হবে। আমি সেই তোমার বিবাহের সময় ছাড়া আর সেখানে যাইনি, সেত এক কথা বটে, আর তুমি সঙ্গে থাকিলে আমার একটু সুবিধা হবে।"

অমর কোন কথা বলিল না। একটু নীরব থাকিয়া কাশীনাথ বলিলেন, "কেবল এই কারণেই কলিকাতা আসি নাই, আরও এক বিশেষ কারণ আছে। উষার বয়স হ'য়েছে, তার কি করা যায়? ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তুমি এখন উপযুক্ত হ'য়েছ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি কিছুই স্থির করিতে পাচ্ছি না।"

অমর বলিল, "এখনি তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই তো সেদিন তা'কে দেখে এসেছি, কি এমন বড়

হ'য়েছে ! এখনো দুই তিন বৎসর সচ্ছন্দে রাখা যাবে। ”

কাশীনাথ বলিলেন, "বাবা! এখনকার সময়ে কন্যা বয়ঃস্থা ক'রে বিবাহ দিবার নিয়ম হয়েছে। পূর্ব্বে এমন ছিল না। কিন্তু তা'হ'লেও আর বেশী দিন অপেক্ষা করা যায় না। উষার বয়স এই একাদশ উত্তীর্ণ হয়। ”

অমর একটু উপেক্ষার সহিত বলিল, "এই এগার বৎসর মাত্র! এ'র জন্যে এত ভাব্‌ছেন? বৎসর দুই তো চুপ্ ক'রে থাকুন, তা'র পর যা' হয় হ'বে। কিন্তু বাবা! একটা কথা, প্রতিজ্ঞা করুন, সমান ঘরে যদি না হয়, বরং দরিদ্রের ঘরে উষার বিয়ে দিবেন, তবু বড় লোকের দিকে চাহিবেন না। বেলা হ'লো আমি এখন আসি। ”

অমর প্রস্থান করিল। পার্শ্বের কক্ষ হইতে আর একটি লোক নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে অজিতকুমার।

যথাসময়ে অমরনাথ কলেজ হইতে প্রত্যাগমন করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পিতা ও পুত্রে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর শকটারোহণে বৈবাহিক-ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় বিডন ষ্ট্রীটের বাবু দেবেন্দ্র বিজয় বসু বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী। বড়-লোক বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত হইবার জন্য যে যে উপকরণের প্রয়োজন, দেবেন্দ্রবাবুর সমস্তই আছে। প্রকাণ্ড তিন মহল বাড়ী। ফটকে ডবল হাতে সোনা-বাঁধান, হস্তিদন্তনির্ম্মিত ছড়ি, পকেটে 'আলবার্ট-চেন্ সম্বলিত সোণার ঘড়ী। ইহা ছাড়া নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, এবং মুখে ফ্রেঞ্চছাট্ চাপদাড়ী আছে। সর্ব্বোপরি বাবু-লোকের প্রধান লক্ষণ ;—দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা সর্ব্বদাই মধুকররূপী চাটুকর দ্বারা পূর্ণ থাকিত। সেই সমস্ত মধুকরের নিরবচ্ছিন্ন গুণ-গুণ শব্দ দেবেন্দ্র বাবুর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিত। আর চাই কি? দেবেন্দ্র বাবু এই সমস্ত মধুকরের মনস্তুষ্টির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। সভা, সমিতি, পার্টি ইত্যাদির জন্যও তাঁহার যথেষ্ট ব্যয় ছিল। কিন্তু গরিব দুঃখীকে দান করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিল না। তিনি বলিতেন, "দয়া দুর্ব্বলতার লক্ষণ"। যাহোক্ দেবেন্দ্রবাবু একটি দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের ঘরে একমাত্র কন্যা বিভাময়ীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

অমর যে বার এফ্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পড়িতেছিল, সেই সময় ঘটনাচক্রে সে একদিন দেবেন্দ্র বাবুর দৃষ্টিপথে পড়ে। দেবেন্দ্র বাবু দেখিলেন, ছেলেটি দিব্য শিষ্ট শান্ত, পরম রূপবান্, লেখাপড়া শিখিতেছে। পরিচয়ে জানিলেন, তাঁহাদের করণীয় ঘর। সব দিকে ভাল, কেবল বাড়ী পল্লীগ্রামে। সে দিন আর বিশেষ কিছু কথা হইল না।

যথাকালে দেবেন্দ্র বাবু গৃহিণীর কাছে সমস্ত কথা বলিয়া বিভাময়ীর সহিত অমরনাথের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কর্ত্তার উপযুক্ত গৃহিণী। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "ঐ রকম পাত্রই তো চাই। বিভাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। ঐ রকম পাত্রের সহিত বিবাহ হ'লে বিভাকে আমার, শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না। বিয়ে দিয়ে এইখানেই রাখ্‌ব। ছেলেটি যখন লেখা পড়া শিখ্‌ছে, তখন আর ভাবনা কি? যতদিন সে চাকরী বাকরী না করে, বিভা আমার কাছে থাক্‌বে। শেষে তা'র চাকরী হ'লে দশ দিন না হয় সেখানে রইল, দশ দিন বা আমার কাছে রইল। তুমি এই সম্বন্ধই স্থির কর।"

পত্নীর যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রবাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। এবং উপযুক্ত লোক দ্বারা শ্রীনগরে কাশীনাথ মিত্রের নিকটে অমরনাথের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দেবেন্দ্রবাবু আভিজাত্যে হীন ছিলেন না, বরং কাশীনাথ অপেক্ষা কৌলীন্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এমন ঘরে পুত্রের সম্বন্ধ হওয়ায় মিত্রমহাশয় আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, না ভাবিয়া, না বুঝিয়া একেবারে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। অমর দুই এক বার আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে আপত্তি, প্রবাহমুখে উপলখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গেল। শুভ দিনে শুভ ক্ষণে অমরনাথের সহিত বিভাময়ীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

৬

সন্ধ্যা অতীতপ্রায়। মনোহর অট্টালিকার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পিতাপুত্রে উপবিষ্ট। কক্ষস্থিত দ্রব্য-সামগ্রী, সমস্তই বহুমূল্য। টেবিল, চেয়ার, গ্লাসকেশ, বুকসেল্‌ফ, ছবি, আয়না, সমস্ত ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সমগ্র বাড়ীখানি উদ্ভাসিত। কাশীনাথ বিস্ময়চকিত-নয়নে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। ভৃত্যগণ যথারীতি আগন্তুকদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিতেছে। অমরনাথ অনেক দিন পরে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। শ্বশুরবাড়ী হইতে বিশেষ "নিমন্ত্রণ-পত্র" পাইয়াও, এখনকার ছেলেদের মত তিনি কলেজ হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিতেন না। পিতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ না হইলে তিনি অদ্যও আসিতেন না।

দেবেন্দ্রবাবু বাড়ীতে ছিলেন না, সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিলেন। বাবুর জুড়ী ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র শশব্যস্তে ভৃত্যগণ ছুটিয়া গেল। চারি দিকে একটা সাড়া পড়িল। পারিষদ্‌বেষ্টিত দেবেন্দ্রবাবু বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। উভয় বৈবাহিকের পরস্পর শিষ্টাচার, কুশল-জিজ্ঞাসা ইত্যাদি ব্যাপার যথানিয়মে সম্পন্ন হইল। অমরনাথ শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন। দেবেন্দ্রবাবু

আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবাজীর অনেক দিন দেখা নাই, ভাল আছ তো? আজ যে মনে করে এসেছ, বড় ভাগ্য!!"

অমর অবনতবদনে রহিল, কোন উত্তর করিল না। একজন পারিষদ হাস্য-মুখে বলিলেন, "সাধ করে কি এসেছেন, বাবায় এনেছেন। বেয়াই মশায়ের দর্শন পাওয়া আরো ভাগ্যের কথা। তবে বেয়াই মশায়! পথ ভুলে নাকি? ছেলেটীকেও সঙ্গে এনেছেন দেখ্‌ছি। বড় সুখী হওয়া গেল।" দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ভাল বেয়াই মশায়! কি মনে ক'রে এদিকে আসা হ'লো?"

কাশীনাথ পল্লীনিবাসী নিরীহ ভদ্রলোক, কলিকাতার আচার ব্যবহার কিছুই জানেন না। কি বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঢোক্ গিলিয়া বলিলেন, "অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাই একবার দেখ্‌তে শুন্‌তে এলাম।"

একজন পারিষদ হাসিয়া বলিলেন, "শুধুই দেখ্‌তে আসা, আর কিছু নয়।"

কাশীনাথ এইবার সুবিধা বুঝিয়া বলিলেন, "বৌমাকে বাড়ীর সকলে দেখবার জন্য বিশেষ উৎসুক হয়েছে, এই সঙ্গে তাঁকেও নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি।"

আর একজন পারিষদ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! তাই বুঝি পিতা-পুত্রে এক জোট্ হ'য়ে এসেছেন? তা' দিন স্থির করা হ'য়েছে কি?"

কাশীনাথ বলিলেন, "বেয়াই মশায়ের মত হ'লে দিন স্থির করার বাধা কি? আগামী কল্য বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভাল দিন আছে, ঐ সময়ে যাত্রা করিয়ে, যে কোন সময়ে নিয়ে যেতে পারি।" (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। দ্বারভাঙ্গার স্বর্গীয় মহারাজ স্যার লছমীশ্বর সিংহ বাহাদুরের প্রথমা পত্নী সীতামাড়ী হাইস্কুলের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণার্থে সাত হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২। দিল্লীর ভূতপূর্ব্বনবাব-বংশীয় যুবক-দিগের শিক্ষাবিধানকল্পে লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া দিল্লীর চিফ কমিশনারের হস্তে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৩। ডাক্তারি-শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে অনেকেই শবব্যবচ্ছেদ করিতে অনিচ্ছুক। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর একজন বৈজ্ঞানিক, শিক্ষার্থীদিগের এই অভাব মোচনের নিমিত্ত এক প্রকার এসিড তৈয়ার করিয়াছেন। এই এসিড শবদেহে প্রয়োগ করিলে শরীরের মাংসপেশী সকল স্বচ্ছ জলের ন্যায় হইয়া যাইবে এবং

অনায়াসেই শরীরস্থ যাবতীয় শিরা, হাড় ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

৪। আমেরিকার অন্তর্গত ক্যালি-ফোর্নিয়া-রাজ্যের ইনরম্যান নামক এক-জন বৈজ্ঞানিক একপ্রকার অভিনব কাচ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কাচের সাহায্যে ২১৩ মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড় পর্ব্বত সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। জলমগ্ন পাহাড় প্রভৃতিও এই কাচের সাহায্যে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াসা, কিছুতেই এই কাচের শক্তিক্ষয় হইবে না।

৫। মেস্‌মেরিজিম সর্পাঘাতের ঔষধ বলিয়া নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সফলতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

৬। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে তারে পত্র পাঠাইবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট মত দিয়াছেন। স্থির হইয়াছে শনিবারের পূর্ব্বে এই পত্রগুলি টেলিগ্রাফযোগে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে এবং মঙ্গলবার বিলি হইবে। প্রত্যেক পত্রে ২০টীর কম কথা যাইবে না। সাধারণ টেলিগ্রাফের সিকি চার্জ্জ করা হইবে।

সমালোচনা।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পরিচয়পত্র—মূল্য দুই আনা। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রাষ্টিদিগের আদেশ অনুসারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তি-স্থান—২৮নং চৌরঙ্গী রোড, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে পাওয়া যায়।

এই পুস্তকখানিতে মিউজিয়মের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি অতি সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও মিউজিয়মে (যাদুঘরে) যাইয়া কোথায় কি আছে, কোন্ বস্তুর কিরূপ প্রকৃতি ও কোন্ জীবের কিরূপ গঠন প্রভৃতি সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। এই পুস্তকের সাহায্যে দর্শনার্থীদিগের যে অনেক সুবিধা ও জ্ঞানলাভ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা মিউজিয়ম-দর্শনার্থীদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যখন মিউজিয়ম দেখিতে যাইবেন, তখন যেন এই পুস্তক একখানি ক্রয় করিয়া লইয়া যান। ইহা একাধারে পথ-প্রদর্শক ও সকল বিষয়ের পরিচায়ক হইবে।

পণগ্রহণে বিবাহ—বিবাহের আদর্শ, পণ গ্রহণের অবৈধতা ও অপকারিতা এবং তাহা দূরীকরণের উপায়। মূল্য এক আনা মাত্র। শ্রীআনন্দ চন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত।

ইহাতে প্রথমে বিবাহের আদর্শ, পরে পণগ্রহণের অবৈধতা, বর্ত্তমান সমাজ-চিত্র, সমাজপতিগণের মত, পণগ্রহণের দোষ, পণপ্রথা দুরীকরণের উপায় প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজের চিত্র অতি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে আমাদের সমাজের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা আশা করি এই পুস্তক দ্বারা আমাদের সমাজের বরপণপ্রথারূপ ভীষণ ব্যাধির উপশম হইবে।

বামারচনা।

যদি নাহি আসা যেত ফিরে।

নীলাকাশে ঐ তরুণ তপন
উদিল আপনি ধীরে,
বিশ্ব মেলিল মুদিত নয়ন,
চেতনা আসিল ফিরে।
পাখীর কাকলী মেদিনী-বক্ষে
ধরিল মধুর তান,
মৌন-প্রকৃতি গাহিল মোহন
বিশ্বরাজের গান।
বিশ্ব সাজিল অপরূপ রূপ
আঁকিল অপূর্ব্ব ছবি,
সে সৌন্দর্য্য সাথে রয়েছে বিলীন
সমাধিমগ্ন কবি।
অপলক-আঁখি সেথায় কখন
আমিও বুঝিবা ধীরে
যেতাম মিশিয়া হেরিতে হেরিতে
যদি নাহি আসা যেত ফিরে।

দাও।

হে সখা!
হে চির-বাঞ্ছিত!
দাও তুমি মোরে নিত,
যত দুঃখ-জ্বালা-বিপদ-বেদনা।
তবে নাথ! তোমা ধনে,
সদা মোর মনে—
পড়িবে।
হে প্রিয়!
হে অন্তর-স্বামী!
চাহিনাকো কভু আমি,
বিষয়-বিভব, বিচিত্র বিলাস।
তুমি যে গো! পর হবে,
মজিলে বিভবে,
বঁধু হে!
হে গুরু!
হে সুন্দর প্রভু!
সুখ নাহি দিও কভু;
তাহে তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হইয়া-
অতি বহু দূরে আমি,
তোমা ভুলি, স্বামী!
পড়িব।
হে নাথ!
হে শাশ্বত সুখ!
দাও মোরে দাও দুখ,

তবে ও চরণে পারিব মিশিতে। কান্ত হে! প্রিয় হে
দাও হে! দুঃখ দাও হে! বঁধু হে!

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র, শোভাবাজার রাজবাটী।

১৩২০ সালের বামাবোধিনীর বর্ণমালানুসারে সূচী।

৩৭ নং মথুরাসেনের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান্ লেন হইতে প্রকাশিত।